আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান বর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

বারোজন পদার্থবিজ্ঞানী

প্রশান্ত প্রামাণিক

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
11 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা-799001

Bārojan Padārthabijnāni
by
Prasanta Pramanik

প্রথম প্রকাশ
15 আগস্ট, 2005

প্রকাশক
দেবানন্দ দাম
জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
11 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা 799001

প্রচ্ছদ ঃ
প্রশান্ত প্রামাণিক

মুদ্রণ ঃ
এস ডি প্রিন্টার্স
32A পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা - 700 009

কলকাতা অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র
জ্ঞান বিচিত্রা
16 ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট, কলকাতা 700009
ফোন (033) 2360 4981

সার্বিক যোগাযোগ
জ্ঞান বিচিত্রা কার্যালয়
11 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা- 799001, ত্রিপুরা
ফোন (0381) 232 3781 / 232 6342

ISBN : 81-8266-048-3

মূল্য ঃ 120 টাকা

উৎসর্গ

কনিষ্ঠা কন্যা রোশনি-কে

• নিবেদন •

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করতে থাকেন যে, পদার্থবিজ্ঞানের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং বিজ্ঞানের এই শাখায় পড়াশুনা কবা কিংবা গবেষণা করা অর্থহীন। এই রকম একটা সময়ে 1900 খ্রিস্টাব্দে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক প্রকাশ করলেন 'কণাবাদ' বা 'কোয়ান্টাম তত্ত্ব'। 1905 সালে পদার্থবিজ্ঞানের আসরে এলেন মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন। পদার্থবিজ্ঞানকে তিনি দিলেন নতুন গতি, দিগন্ত প্রসারী এক বিশাল প্রেক্ষাপট। গত একশ' বছর ধরে পদার্থবিজ্ঞানের যে অনন্য অবদান মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ কবেছে তার মূল হোতা হলেন আইনস্টাইন।

এরপর একে একে এসেছেন নীল্স্ বোর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দ্য ব্রগলি, ম্যাক্স বর্ন, এনরিকো ফের্মি, পল ডিরাক, কার্ল হাইজেনবার্গ, আবউইন শ্রোয়েডিঙ্গার, আবদুস সালাম, স্টিফেন হকিং প্রমুখ বিজ্ঞানীবা। এঁদের অবদানে পদার্থবিজ্ঞান এখন দাঁড়িয়ে আছে দুটি বিপরীতমুখী তত্ত্বের উপর। তার একটি আপেক্ষিকতাবাদ, অন্যটি কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান, যার ভিত্তি তৈরি করেছিল প্ল্যাঙ্কের কণাবাদ বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব। আর আপেক্ষিকতাবাদ পুরোপুরি আইনস্টাইনের অবদান। এই আপেক্ষিকতাবাদ কার্য-কারণ সম্পর্কে বিশ্বাসী, কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতায় বিশ্বাসী। শক্তি ও পদার্থের তুল্যতা, আলোর দ্বৈতসত্তা ইত্যাদি তত্ত্ব আইনস্টাইনেরই আবিষ্কাব। তার সঙ্গে সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা যোগ করে এসেছে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। কণাজগতে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান সত্য হলেও, বহির্জগতে আপেক্ষিকতাবাদই সত্য। এই দুই বিপরীত সত্যেব মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টায় যে সব বিজ্ঞানী কাজ করেছেন বা করছেন তাঁদের মধ্যে অবশ্যই রয়েছেন আবদুস সালাম এবং স্টিফেন হকিং।

আলো আজও তরঙ্গ, আজও কণার সমষ্টি। আলোর এই দুই ধর্ম যতদিন থাকবে, ততদিন আপেক্ষিকতাবাদ এবং কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান তথা কোয়ান্টামবাদ থাকবে বহাল তবিয়তে। সত্য দু'রকম নয়, একটাই হবে। পদার্থবিজ্ঞানীরা তাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই দুই বিপ্রতীপ সত্যের একীকরণ করতে। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব 1979 সালে এক ধাপ এগোলেও উভয় সত্যের মেলবন্ধন আজও অধরা। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন সারা জীবন কার্য-কারণ সম্পর্কেই বিশ্বাস রেখেছিলেন, অনিশ্চয়তা কিংবা সম্ভাব্যতায় নয়। আপেক্ষিকতাবাদ এনেছেন আইনস্টাইন। আর কণাবাদ প্ল্যাঙ্কের অবদান হলেও তার প্রথম ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আইনস্টাইন। এই কণাবাদের উপর ভিত্তি করেই এসেছে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। অনিশ্চয়তা নীতির জনক হাইজেনবার্গ হলেও তাকে পরিপুষ্ট করেছেন ম্যাক্স বর্ণ, শ্রোয়েডিঙ্গার, নীল্স্ বোর, ডিরাক প্রমুখেরা।

বর্তমান বইটিতে সেই বারোজন পদার্থ বিজ্ঞানীর কথা বলা হয়েছে, যাঁরা বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের যুগান্তকারী অগ্রগমনের চালক। এঁদের হাত ধরেই এসেছে আপেক্ষিকতাবাদ,

কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান এবং দুই বিপরীত সত্যের একীকরণেব প্রচেষ্টা। এই দুই আপাত সত্যের মিলনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন একালের বিজ্ঞানীবা। এই বারোজন ছাড়া আরো অনেক পদার্থবিজ্ঞানী আছেন বিংশ শতাব্দী জুড়ে। তাঁদের কথা ভবিষ্যতে বলার ইচ্ছা রইল।

2005 খ্রিস্টাব্দকে আন্তর্জাতিকভাবে 'পদার্থবিজ্ঞান বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই ঘোষণাকে সম্মান জানাই প্রায় অকিঞ্চিৎকর আমার এই বইটি প্রকাশের মাধ্যমে।

বইটিতে যে শুধু বারোজন পদার্থবিজ্ঞানীর জীবনকথা আছে তা নয়, এঁদের প্রত্যেকের আবিষ্কারগুলির কথাও কিছুটা বিশদভাবে বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের বিবর্তন ও অগ্রগতির একটা সুস্পষ্ট চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছি। তাতে কতটা সফল হলাম তা বিচারের ভার রইল পাঠক-পাঠিকার উপর।

'জ্ঞান বিচিত্রা'-র কর্ণধার শ্রীদেবানন্দ দাম এই বইটি প্রকাশ করে আমাকে আবাবো কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর সমস্ত প্রকাশনা সহযোগীদেব জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। বইটি আদৃত হোক, এই কামনা করেই নিবেদন শেষ করি।

কলকাতা

14 ই মার্চ, 2005

প্রশান্ত প্রামাণিক

সূচি

"..... জীবন সম্বন্ধে একটি মহাসত্য এই যে, যেদিন হইতে আমাদের বাড়িবার ইচ্ছা স্থগিত হয় সেই দিন হইতেই জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে একই কথা। যেদিন হইতে আমাদের বড় হইবার ইচ্ছা থামিয়াছে, সেদিন হইতেই আমাদের পতনের সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, সঞ্চয় করিতে হইবে এবং বাড়িতে হইবে। তাহার জন্য কি কবিয়া প্রকৃত ঐশ্বর্য্য লাভ হইতে পারে একাগ্র চিত্তে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

দ্রোণাচার্য শিষ্যগণের পরীক্ষার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'গাছের উপর যে পাখীটি বসিয়া আছে, তাহার চক্ষুই লক্ষ্য, পাখীটি কি দেখিতে পাইতেছ? অর্জুন উত্তর করিলেন, 'না, পাখী দেখিতে পাইতেছি না, কেবল তাহার চক্ষুমাত্র দেখিতেছি।' এই রূপ একাগ্রচিত্ত হইলেই বাহিরের বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও অবিচলিত থাকিয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবে।......"

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক

[1858–1947]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হল যে, পদার্থবিজ্ঞানের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এই শাখায় পড়াশুনা কিংবা গবেষণা করা অর্থহীন। আসলে এই সময় পদার্থবিজ্ঞানে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষ করে আলোকে নিয়ে! আলো বিকীর্ণ শক্তি। এই বিকীর্ণ শক্তিটি কণা কিংবা তরঙ্গের আকারে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়, তা নিয়ে বিতর্কের অন্ত ছিল না। বহুকাল আগে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নিউটন বলেছিলেন সূক্ষ্মতর আণুবীক্ষণিক বস্তু কণিকার [Corpuscles] সমষ্টি হল আলো। আলোর উৎস থেকে বহুসংখ্যক আলোর কণা আমাদের চোখে এসে পড়লে আমরা দেখতে পাই। এইসব কণা শূন্যস্থান [Empty Space] দিয়ে সরলরেখায় চলে। নিউটন তাঁর এই কণা তত্ত্ব [Corpuscular Theory] দিয়ে আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ঘটনা দুটির ব্যাখ্যা দেন। তিনি আরও বললেন, সাদা আলোর ভিতরে সব রঙ আছে। বিভিন্ন রঙের কণিকার সমষ্টিগত ফল হল সাদা আলো।

নিউটনের সমকালীন বিজ্ঞানী হুইগেন্স [Huygens] 1678 সালে বললেন, আলো এক শক্তি, যা উৎসের থেকে বেরিয়ে তরঙ্গের আকারে একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। হুইগেন্সের এই তরঙ্গ-তত্ত্ব দিয়ে প্রমাণিত হল আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং বিভিন্ন রঙের কারণ। প্রশ্ন উঠল, আলোক তরঙ্গের যাতায়াতের মাধ্যম কি? বিশ্বের সর্বত্রই আলোর যাতায়াত। কোন্ মাধ্যমে আলোক তরঙ্গ যাতায়াত করে? হুইগেন্স বললেন, সারা বিশ্ব জুড়ে এবং সকল বস্তুর ভিতরে রয়েছে এক মাধ্যম, যে মাধ্যম দিয়ে আলোর তরঙ্গ যাতায়াত করে। তিনি এই কাল্পনিক মাধ্যমের নাম দিলেন 'ইথার' [Ether]।

সুতরাং আলো তখন থেকেই কণা এবং তরঙ্গ এই দুই রূপ নিয়ে বিজ্ঞানীদের কাছে প্রতিভাত হল। এর প্রায় 150 বছর পরে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফ্রেনেল [Fresnel] এবং ইয়ং [Young] আবিষ্কার করলেন 'আলোর ব্যতিচার' [Interference of Light]। এই ঘটনা আলোর তরঙ্গধর্মের পক্ষেই রায় দিল। তেমনি 'আলোর অপবর্তন' [Diffraction of Light] আলোর তরঙ্গ-ধর্মিতার জোরালো প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত হল। ফলে, বিজ্ঞানীরা মেনে নিলেন আলো হল তরঙ্গ। এই তরঙ্গের গতিবেগ বের হল 1,86,000 মাইল বা 3,00,000 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে। ম্যাক্সওয়েল [James Clark Maxwell] তাঁর সূত্রের সাহায্যে বের করলেন তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের [Electromagnetic Waves] গতিবেগও 3,00,000 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে। তিনি বললেন, আলো হল চলন্ত তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। 1888 সালে হার্ৎজ [Hertz] বানিয়ে ফেললেন তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। বিজ্ঞানীরা

মেনে নিলেন শুধু আলো নয় সব শক্তিই তরঙ্গের আকারে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। কিন্তু এই তরঙ্গতত্ত্ব দিয়েও কিছু সমস্যার সমাধান করা গেল না।

আলোর তরঙ্গ-তত্ত্বে দুটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিল। একটি হল ইথারের অস্তিত্বহীনতা। অপরটি হল আলোকবৈদ্যুৎ ক্রিয়া [Photoelectric Effect]। 1881 সালে মাইকেলসন-মরলে প্রমাণ করলেন ইথার বলে কিছু নেই। সুতরাং তরঙ্গ-রূপী আলো কোন্ মাধ্যম দিয়ে যাতায়াত করে তার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হল। অন্য সমস্যাটি হল, আলো লিথিয়াম [Lithium], সোডিয়াম [Sodium], পটাসিয়াম [Potassium], রুবিডিয়াম [Rubidium], সীজিয়াম [Caesium] ইত্যাদি ধাতুর উপর পড়লে সেগুলি থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। তরঙ্গ-তত্ত্ব দিয়ে আলোর এই আলোকবৈদ্যুৎ ক্রিয়ার কারণ বের করা সম্ভব হল না।

এই রকম একটা সময়ে 1900 খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরের শেষের দিকে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক [Max Plank] তাঁর বিখ্যাত কণাবাদ বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব [Quantum Theory] প্রচার করেন। প্ল্যাঙ্ক বললেন যে, শক্তির দেওয়া-নেওয়া ও বিকিরণ অবিরত ও অবিচ্ছিন্নভাবে হয় না, হয় ঝাঁকে ঝাঁকে [By Jerks], অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড ভাবে [Discontinuously] অর্থাৎ কণাভাবে। তিনি আরও বললেন, কোন তরঙ্গের শক্তি কখনও ন্যূনতম একটি সংখ্যার চেয়ে কম হতে পারে না। এই ন্যূনতম সংখ্যাটিকে বলা হল বিকীর্ণ শক্তির কণা বা কোয়ান্টাম [Quantum]। এই কণার শক্তি 'E' হলে $E = h\upsilon$ হবে, যেখানে h হল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক [Planck's Constant] এবং υ হল ওই শক্তি তরঙ্গের কম্পাঙ্ক। এই প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের মান বের হল 6.24×10^{-27} গ্রাম-সেন্টিমিটার^2/সেকেন্ড বা আর্গ-সেকেন্ড।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক জন্মেছিলেন 1858 খ্রিস্টাব্দের 23 শে এপ্রিল। জার্মানীর কিয়েল শহরে এক উচ্চ শিক্ষিত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পুরো নাম ম্যাক্স কার্ল আর্নস্ট লুডউইগ প্ল্যাঙ্ক [Max Karl Ernst Ludwig Planck]। তাঁর জন্মের সময় তাঁর পিতা জুলিয়াস ভিলহেলম ফন প্ল্যাঙ্ক [Julius Wilhelm von Planck] ছিলেন কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবিধানিক আইনের অধ্যাপক। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের পিতামহ এবং প্রপিতামহ উভয়েই গটিংগেনের [Gottingen] ব্রহ্মবিদ্যা [Theology] বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম এম্‌মা প্যাৎজিগ [Emma Patzig]। এম্‌মা ছিলেন জুলিয়াস প্ল্যাঙ্কের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। ম্যাক্স যখন জন্মান তখন তাঁর বাবার বয়স 41 বছর এবং মায়ের বয়স 37 বছর। ম্যাক্স জন্মেছিলেন এক বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে। জুলিয়াসের প্রথম পত্নী ছিলেন ম্যাথিলডে ভোইগৎ [Mathilde Voigt]। তাঁর দুই সন্তানই থাকতো জুলিয়াসের সঙ্গে। ম্যাক্সের মোট ছয়জন ভাইবোন একসঙ্গে থাকতেন। এই বিশাল পরিবারে ছিল পাণ্ডিত্য, সততা, সুবিচার এবং সহৃদয়তার ঐতিহ্য। ম্যাক্স বড় হয়েছিলেন এমনি এক ঐতিহ্যময় পরিবেশে। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ঐতিহ্যের ওই সব গুণাবলী লাভ করেছিলেন। পারিবারিক ঐতিহ্যের ওই দিকগুলি তাঁর মধ্যে দৃঢ়মূল হয়েছিল। সারাজীবনই তিনি সততা, সুবিচার, সহৃদয়তার অনুরাগী ছিলেন। সরকারী সংস্থাগুলিকে তিনি যেমন খুবই মান্য করতেন, তেমনি সারাজীবনই তিনি ভক্তি-শ্রদ্ধা কবতেন গির্জাগুলিকে।

ম্যাক্সের ছাত্রজীবনের শুরু হয় কিয়েলের স্কুলে। 1867 সালে তাঁর পরিবারের সবাই মিউনিখ চলে যান। ওখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বাবা অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। মিউনিখের পরিবেশ প্ল্যাঙ্ক-পরিবারের খুবই ভালো লাগলো। এখানের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, সাংগীতিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ম্যাক্সদের খুবই পছন্দসই হয়। সংগীত, ভ্রমণ, পর্বতারোহণ নিয়ে মেতে উঠলেন কিশোর ম্যাক্স এবং তাঁর তরুণ ভাইয়েরা। মাঝে মাঝে ম্যাক্স পরিবার ছুটি কাটাতে যেতেন 'আপার ব্যাভেরিয়া'য়। 1867 সালের মে মাসে ম্যাক্স ভর্তি হন বিখ্যাত ম্যাক্সিমিলিয়ান জিমনাসিয়ামে। এই জিমনাসিয়ামটি ছিল তাঁর প্রিয় মাধ্যমিক স্কুল। এই স্কুলে তাঁর পরীক্ষার ফল ভালো হলেও আহামরি কিছু ছিল না। স্কুলে তৃতীয় থেকে অষ্টম স্থানের মধ্যে থাকতো তাঁর অবস্থান। স্কুলে সংগীতে তিনি খুব ভালো ফল করতেন। প্রত্যেক বছরই বার্ষিক পরীক্ষায় প্রশ্নোত্তরে এবং ভালো ব্যবহারের জন্য প্রথম পুরস্কার পেতেন ম্যাক্স। অনেকেই মনে করতে পারেন, ম্যাক্স বোধ হয় তাঁর স্কুল জীবনে বিজ্ঞান এবং অঙ্কে খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বাস্তবে কিন্তু তিনি তা ছিলেন না। অঙ্কে এবং বিজ্ঞানে তিনি এই সময় খুব ভালো ফল করলেও, খুব অসাধারণ কিছু ফলাফল দেখাতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর স্কুল জীবনের শেষের দিকে অঙ্কে এবং বিজ্ঞানে তাঁর আগ্রহ অনেকটাই বাড়িয়ে দেন তাঁর শিক্ষক হেরমান মুলার [Hermann Müller]। এই সময় তিনি শক্তির নিত্যতা সূত্রের উপর গভীরভাবে পড়াশুনা করেন। এই সময়ই তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয় ঃ "Justifiably favoured by both teachers and classmates....and despite having childish ways, he has a very clear, logical mind. Shows great promise."

1874 সালের জুলাই মাসে তিনি স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ করেন ডিস্টিংশন নিয়ে। নানা বিষয়ে তিনি কিছুটা কৃতিত্ব দেখালেও সবচেয়ে বেশি পারদর্শিতা দেখান সংগীতে। তিনি এই সময়েই খুব ভালো পিয়ানো এবং অর্গান বাজাতে পারতেন। মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়ার আগে কী বিষয় নিয়ে তিনি পড়াশুনা করবেন তা স্থির করা ছিল না। তিনি ভেবেছিলেন, সংগীত নিয়ে পড়াশুনা করবেন। তাই তিনি মিউনিখের এক বিখ্যাত সংগীতজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি যদি সংগীত নিয়ে পড়াশুনা করেন তবে তাঁর ভবিষ্যতে কী হবে? ওই সংগীত বিশারদ তাঁকে সংগীত নিয়ে না পড়বারই উপদেশ দেন। সরাসরি বলে দেন অন্য কোনও বিষয় নিয়ে পড়তে। 1874 সালের 21 শে অক্টোবর তিনি মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হন। এই সময় তাঁকে পদার্থবিজ্ঞান পড়াতেন ফিলিপ ফন জোলি [Philipp Von Jolly] এবং ভিলহেলম্ বিজ [Wilhelm Beetz]। আর অঙ্ক পড়াতেন লুডউইগ সিডেল [Ludwig Seidel] এবং গুস্তাভ বাউয়ার [Gustav Bauer]।

কলেজ জীবনের শুরুতে তিনি অঙ্কের ক্লাসগুলিতে খুব আগ্রহ নিয়ে হাজির থাকতেন এবং মন দিয়ে পড়াশুনা করতেন। পদার্থবিজ্ঞানের সম্বন্ধে মিউনিখের অধ্যাপক ফিলিপ ফন জোলি তাঁকে বলেছিলেন যে পদার্থবিদ্যা একটা পূর্ণবিজ্ঞান এবং এর আর খুব একটা অগ্রগতির সম্ভাবনা নেই। সে সময় ফিলিপ অবশ্য ভুল কিছু বলেন নি। আগেই বলেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, পদার্থবিজ্ঞানের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এই বিষয়ে নতুন কিছু আবিষ্কারের সম্ভাবনা নেই

বললেই চলে। সুতরাং এই বিষয় নিয়ে পড়াশুনা কিংবা গবেষণা করা অর্থহীন। সৌভাগ্যক্রমে, অধ্যাপক ফিলিপের ওই বক্তব্য শুনেও প্ল্যাঙ্ক পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করতে আগ্রহী হন, যদিও তাঁকে বলা হয়েছিল যে এই বিষয়ে গবেষণা করার সুযোগ খুবই কম। প্ল্যাঙ্ক কেন সে সময় পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করতে পছন্দ করেছিলেন, যদিও ওই বিষয়ে পড়াশুনায় ভবিষ্যৎ কিছুই ছিল না, তা নিয়ে পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন, "The outside world is something independent from man, something absolute, and the quest for the laws which apply to this absolute appeared to me as the most sublime scientific pursuit in life". তিনি আরও লিখেছিলেন, "I did not have the good fortune of a prominent scientist or teacher directing the specific course of my education".

1857 সালে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর পড়াশুনা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। জার্মানীর তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী 1877 সালের অক্টোবর মাসে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিনের জন্য পড়তে যান। এখানে তিনি অধ্যাপক হিসাবে পান ভিয়েরস্ট্রাস [Weierstrass], হেলমহোলৎজ [Helmholtz] এবং কিরকফ [Kirchoff] প্রমুখ বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীদের। মিউনিখে সে সময় পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা করার ব্যাপারে যে নিরুৎসাহ তিনি দেখেছিলেন, বার্লিনে কিন্তু তা ছিল না। এখানে তিনি দেখলেন, অধ্যাপকরা পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দিচ্ছেন। তাঁরা নিজেরাও ওই বিষয়ে নানা গবেষণা করছেন। এই সব দেখে প্ল্যাঙ্কের পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়। বার্লিনের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকদের তুলনায় মিউনিখের অধ্যাপকরা অত্যন্ত নিরুৎসাহী ছিলেন এবং তাঁদের গুণগত মানও বার্লিনের অধ্যাপকদের সমকক্ষ ছিল না। সেইজন্যই বহু পরে প্ল্যাঙ্ক তাঁর মিউনিখের অধ্যাপকদের সম্পর্কে উপরের ওই বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। বার্লিনে থাকাকালীন তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ে ফেললেন রুডলফ ক্লসিয়াসের [Rudolf Clausius] তাপগতিবিদ্যার [Thermodynamics] উপর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি এবং তার পরম প্রকৃতি তাঁকে খুবই মুগ্ধ করে।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক মিউনিখে ফিরে এলেন। 1879 সালের জুলাই মাসে মাত্র 21 বছর বয়সে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর ডক্টরেটের গবেষণাপত্রটি ছিল তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের উপর এবং এই গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিল 'On the Second Law of Mechanical Theory of Heat'. 1879 সালের 28 শে জুলাই তিনি ওই ডক্টরেট ডিগ্রী পান। এরপর তাঁকে যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ার জন্য আরও গবেষণা চালিয়ে যেতে হয়। তাঁকে অধ্যাপক হওয়ার যোগ্য বলে ঘোষণা করা হয় 1880 সালের 14 ই জুন, এনট্রপি [Entropy] এবং তাপের যান্ত্রিক তত্ত্বের উপর লিখিত তাঁর গবেষণাপত্র গৃহীত হওয়ার পর। এরপর তিনি ওই মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়েই 'Privatdozent' হিসাবে কাজে যোগ দেন। এই পদে কোনও বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না সে সময়। ফলে, কাজে যোগ দিয়েও প্ল্যাঙ্কের কোন আয় ছিল না এই সময়। পাঁচ বছর তিনি এই পদে কাজ করেন। আয় না থাকায় এই সময়টা তিনি বাবাব সঙ্গেই থাকতেন। তাঁর খরচ-খরচা যোগান দিতেন তাঁর বাবাই। এই সময় তাঁর বন্ধুত্ব হয় কার্ল রাঙ্গে-র [Carl Runge] সঙ্গে। এই বন্ধুত্ব

দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই বন্ধুত্ব তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে পরবর্তী জীবনে খুবই উপরযোগী এবং ফলপ্রসূ হয়েছিল।

1885 সালের 2রা মে প্ল্যাঙ্ক কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁকে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক করা হয়। চার বছরের জন্য তাঁকে ওই পদে মনোনীত করা হয়। এর ফলে তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। এই সময় তিনি মেরী মার্ককে [Marie Merck] বিয়ে করার কথা ভাবতে শুরু করেন। মেরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় অনেকদিনের। কিন্তু তাঁকে বিয়ে করতে পারছিলেন না নিজের কোনও আয় না থাকায়। মেরী ছিলেন মিউনিখের এক ব্যাঙ্ককর্তার কন্যা। 1887 সালের 31শে মার্চ তাঁরা বিয়ে করেন। বিয়ের পর তিনি তাপগতিবিদ্যার উপর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এতে তিনি ভৌত রসায়ন এবং তাপবৈদ্যুৎ ক্রিয়ার উপর তাপগতিবিদ্যার প্রয়োগ করে দেখান।

1887 সালের অক্টোবর মাসে কিরকফ মারা যান। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় একজন খ্যাতনামা পদার্থ বিজ্ঞানী খুঁজছিলেন কিরকফের জায়গায় যিনি হেলমহোলৎজের মত বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সহকর্মী হিসাবে কাজ করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লুডউইগ বোলৎজমানকে [Ludwig Boltzmann] ওই পদে যোগ দেবার প্রস্তাব দিলেন। বোলৎজমান রাজী হলেন না। এরপর তাঁরা প্রস্তাব দিলেন হেইনরিখ হার্ৎজকে [Heinrich Hertz]। হার্ৎজও রাজী হলেন না। এরপর 1888 সালে হেলমহোলৎজ দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করলেন প্ল্যাঙ্কের নাম। তিনি লিখেছিলেন ঃ

"Planck's papers are very favourably distinguished from those of the majority of his colleagues in that he tries to carry through the strict consequences of thermomechanics constructively, without adding additional hypotheses and carefully separates the secure from the doubtful....... His papers......clearly show him to be a man of original ideas who is making his own paths [and] that he has a comprehensive overview of the various areas of science".

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় প্ল্যাঙ্ককে মনোনীত করলেন। প্রস্তাব পাঠানো হল প্ল্যাঙ্কের কাছে। তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগ দিলেন 29 শে সেপ্টেম্বর, 1888 খ্রিস্টাব্দ। একই সঙ্গে তিনি 'ইনস্টিটিউট অফ থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স'-এর [Institute of Theoretical Physics] ডিরেক্টারও নিযুক্ত হন। প্রথমে তিনি অতিরিক্ত সাধারণ অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। 1892 সালের 23 শে মে তিনি সাধারণ অধ্যাপক হন। এই পদে তিনি আসীন ছিলেন 1 লা অক্টোবর, 1927 খ্রিস্টাব্দ অবধি। প্রায় 35 বছরের দীর্ঘ এই অধ্যাপক জীবনে তিনি বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন বহু পদার্থবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, শরীরবিজ্ঞানী, ধর্মতত্ত্ববিদ, ভাষাবিজ্ঞানীদের। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত ব্যক্তিরা হলেন—এমিল দ্যু বোইস-রেমণ্ড [Emil du Bois Reymond], হেলমহোলৎজ, প্রিংশেইম [Pringsheim], ভিন [Wien] প্রমুখ। পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েও তিনি তাঁর সংগীত চর্চা চালিয়ে যাচ্ছিলেন নিয়মিতভাবেই। এই সময় তিনি একটা হারমোনিয়াম তৈরি করেন যার প্রতি অষ্টকে [Octave] 104 টি করে স্বন [Tone] রাখা হয়। তাঁর বাড়ীতে এই সময় সংগীতের কনসার্ট [Concert] বসত নিয়মিতভাবে।

বার্লিনে থাকাকালীন তিনি পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর সেরা গবেষণাপত্রগুলি প্রকাশ করেন। তিনি শিক্ষক হিসাবেও খুব সুনাম অর্জন করেন। তাঁর বক্তৃতাগুলি শুনতে ক্লাসে ভিড় জমেই থাকতো। প্রথমের দিকে তিনি তাপগতিবিদ্যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুযায়ী শক্তির বন্টন নিয়ে গভীরভাবে পড়াশুনা করেন। ভিন [Wien] এবং র‍্যালের [Rayleigh] বন্টন সূত্রগুলির সমন্বয় ঘটিয়ে 1900 সালের অক্টোবর মাসে তিনি এক নতুন সূত্র বের করেন যার নাম হয় প্ল্যাঙ্কের বিকিরণ সমীকরণ [Planck's Radiation Formula]। দু' মাসের মধ্যেই তিনি এই সমীকরণের নতুন রূপ দিলেন সনাতন রীতি বাতিল করে। তিনি বিকিরণ শক্তির গঠনে নিয়ে এলেন তাঁর বিখ্যাত কণা বা কোয়ান্টাম [Quantum] ধারণাকে। 1900 সালে 14 ই ডিসেম্বর তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা কণাবাদ [Quantum Theory]। বার্লিনের 'Physikalische Gesellschaft'-এর সভায় তিনি ওই দিন বক্তৃতা দিলেন তাঁর কোয়ান্টাম তত্ত্ব নিয়ে। এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটিকে প্রকৃতির পরম নিয়ম হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। বরং এই সময় বোলৎজমান ওই সূত্রটিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে ওটিকে পরিসাংখ্যিক সূত্র বলেছিলেন, প্ল্যাঙ্কও তাই বললেন। প্ল্যাঙ্কই বিকীর্ণ শক্তির কণাধর্মের গাণিতিক ব্যাখ্যা দিলেন। শক্তির তথা আলোর কণাধর্মের প্রমাণ তিনিই প্রথম উপস্থাপিত করেন। এটি আরও দৃঢ় ভিত্তি পায় 1905 সালে আইনস্টাইনের আলোকবৈদ্যুৎ ক্রিয়ার গাণিতিক ব্যাখ্যায়। আলোর তথা বিকীর্ণ শক্তির কণাধর্ম দ্বিধাহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

1918 সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পান ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক। নোবেল পুরস্কার নিতে গিয়ে প্ল্যাঙ্ক তাঁর কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কারের ইতিহাস বিশদভাবে বলেন। তিনি বলেছিলেন,

"For many years, [my aim] was to solve the problem of energy distribution in the normal spectrum of radiating heat. After Gustav Kirchhoff has shown that the state of the heat radiation which takes place in a cavity bounded by any emitting and absorbing material at uniform tremperature is totally independent of the nature of the material, a universal function was demonstrated which was dependent only on temperature and wavelength, but not in any way on the properties of the material. The discovery of this remarkable function promised deeper insinght into the connection between energy and temperature which is, in fact, the major problem in thermodynamics and so in all of molecular physics.......

At that time I held what would be considered today naively charming and agreeable expecations, that the laws of classical electrodynamics would, if approached in a sufficiently general manner avoiding special hypotheses, allow us to understand the most significant part of the process we would expect, and so to achieve the desired aim. ...

[A number of different approaches] showed more and more clearly that an important connecting element or term, essential to completely grasp the basis of the problem, had to be missing. .

I was busy...from the day I [established a new radiation formula], with the task of finding a real physical interpretation of the formula, and this problem led me automatically to consider the connection between entropy and probability, that is, Boltzmann's train of ideas : eventally after some weeks of the hardest work of my life, light entered the darkness, and a new inconceivable perspective opened up before me. ...

Because [a contant in the radiation law] represents the product of energy and time ... I described it as the elementary quantum of action. ... As long as it was looked on as infinitely small ... everything was fine; but in the general case, however, a gap opened wide somewhere or other, which became more striking the weaker and faster the vibrations considered. That all efforts to bridge the chasm foundered soon left little doubt. Either the quantum of acton was a fictional quantity. then the whole deduction of the radiation law was essentially an illusion representing only an empty play on formulas of no significance, or the derivation of the radiation law was based on a sound physical conception. In this case the quantum of action must play a fundamental role in physics, and here was something completely new, never heard of before, which seemed to require us to basically revise all our physical thinking, built as this was, from the time of the establishment of the infinitesimal calculus by Leibniz and Newton, on accepting the continuity of all causative connections. Experiment decided it was the second alternative".

প্ল্যাঙ্কের তত্ত্ব প্রথম দিকটা স্বীকৃতি না পেলেও 1913 সালে বোরের তত্ত্ব [Bohr's Theoy] তাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়। অবশ্য এর অনেকটা আগেই 1905 সালে আইনস্টাইন আলোকবৈদ্যুৎ ক্রিয়া তত্ত্বীয়ভাবে প্রমাণ করেন প্ল্যাঙ্কের তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে। সে তত্ত্বে তিনি আলোর কণাধর্মকেই প্রতিষ্ঠিত করেন। প্ল্যাঙ্ক তাঁর তত্ত্বে আলোর তথা বিকীর্ণ শক্তির কণাধর্মের প্রচার করেন। বোরের বর্ণালি-রেখা তত্ত্ব প্ল্যাঙ্কের তত্ত্বকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

প্ল্যাঙ্ক তাঁর 42 বছর বয়সে কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার করলেও পরবর্তীকালে এই তত্ত্বের পরিমার্জনে এবং পরিবর্ধনে প্ল্যাঙ্ক তেমন কোন গবেষণা করেন নি। কিন্তু এই কণাবাদ বা কোয়ান্টাম তত্ত্বকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আজকের কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান [Quantum Mechanics]। পদার্থবিজ্ঞান এখন দুটি তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার একটি হল কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান এবং অন্যটি আপেক্ষিকতাবাদ। কণাবাদকে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সব পদার্থবিজ্ঞানীদের অনবদ্য অবদান আছে তাঁদের মধ্যে আছেন—আইনস্টাইন, নীল্‌স্ বোর, সত্যেন্দ্রনাথ, পল ডিরাক, হাইজেনবার্গ প্রমুখেরা।

1909 সালের 17 ই অক্টোবর প্ল্যাঙ্কের স্ত্রী মেরী এম্‌মা মারা যান। তাঁদের চার সন্তানের দু'জন পুত্র এবং দু'জন কন্যা। পুত্র দু'জন হলেন, আরউইন [Erwin] এবং কার্ল [Karl] এবং তাঁদের দুই যমজ কন্যা মার্গারেট এবং এম্‌মা [Emma]। স্ত্রী মৃত্যুর দু'বছর পরে প্ল্যাঙ্ক আবার বিয়ে করেন মার্গা ফন হোসলিনকে [Marga von Hösslin] 1911 সালের 14 ই মার্চ। মার্গা ছিলেন প্ল্যাঙ্কের প্রথমা স্ত্রীর ভাইঝি। প্ল্যাঙ্কের এই স্ত্রীর থেকে এক পুত্র সন্তান

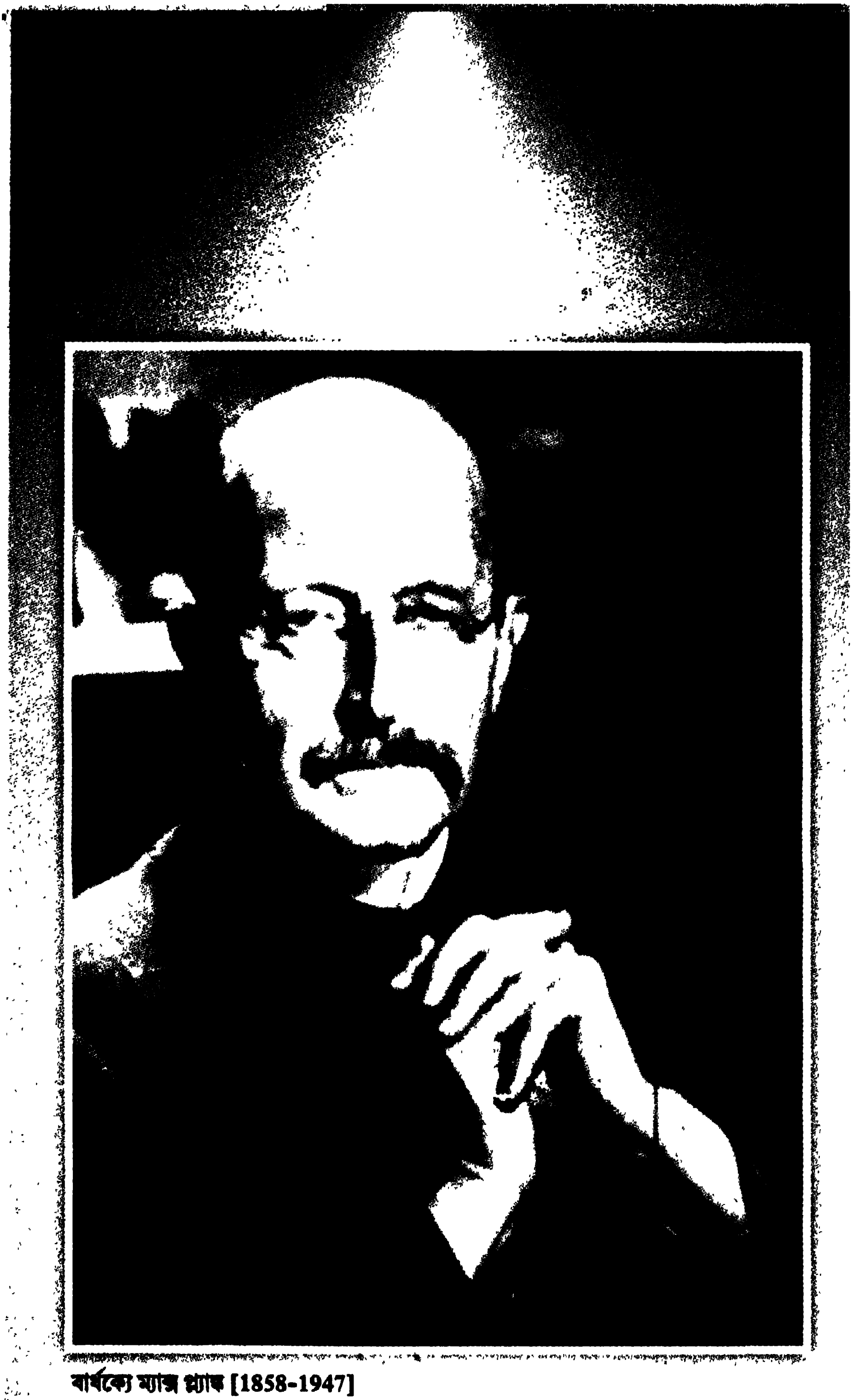
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হেরমান [Hermann]। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 1916 সালে মারা যান তাঁর প্রথম বিবাহের কনিষ্ঠ সন্তান কার্ল। তাঁর দুই মেয়েই সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। 1917 সালে মারা যান মার্গারেট এবং 1919 সালে মারা গেলেন এম্‌মা। আরউইনই প্ল্যাঙ্কের বৃদ্ধ বয়সের সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিলেন। আরউইন কিন্তু মারা যান এক ভয়ংকর ঘটনায়। সে ঘটনার কথা একটু পরেই বলছি।

প্ল্যাঙ্ক সবসময় প্রশাসনিক দায়িত্ব নিতে ভালবাসতেন। এই সব দায়িত্ব তিনি নিতেন তাঁর গবেষণা কাজের সঙ্গেই। 1912 সাল থেকে 1943 সাল অবধি প্রায় 32 বছর ধরে তিনি প্রুশিয়ার' বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির [Prussian Academy of Sciences] অঙ্ক এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান বিভাগের সচিব ছিলেন। 1894 সালেই তিনি ওই অ্যাকাডেমির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি Genrman Physical Society-র সদস্য এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। 1905 সাল থেকে 1908 সাল এবং 1915 সাল থেকে 1916 সাল অবধি তিনি ওই সোসাইটির চেয়ারম্যান ছিলেন। 1927 সালে তিনি আবার ওই সোসাইটির সম্মানীয় সদস্য নির্বাচিত হন। এর দু'বছর পরে ওই সোসাইটি প্ল্যাঙ্কের নামে 'ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক পদক' [Max Planck Medal] দেওয়া শুরু করে। প্রথম বার পদক দেওয়া হয় প্ল্যাঙ্ককেই। তিনি আবারো ওই সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন 1930 সালে এবং 1937 সাল অবধি তিনি ওই পদে আসীন ছিলেন। এই সোসাইটির নতুন নামকরণ করা হয় 'ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক সোসাইটি' [Max Planck Society]। 1937 সালে ওই প্রেসিডেন্ট পদ তিনি ছেড়ে দেন ন্যাৎসীদের [Nazis] উৎপাতে। এই সময় অ্যাকাডেমি ও সোসাইটিগুলিতে রাজনীতি ঢুকে পড়তে থাকে। প্ল্যাঙ্ক এগুলিতে রাজনীতির অনুপ্রবেশের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা করেও এই ধরনের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে পারেন নি। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক সোসাইটিরও রদবদল করা হয় রাজনীতির লোকদের পরিচালন ব্যবস্থায় প্রবেশ করানোর জন্য। এরই প্রতিবাদে প্ল্যাঙ্ক 1937 সালে ওই সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে দেন।

বার্লিনকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন প্ল্যাঙ্ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অতি দুর্দিনেও তিনি বার্লিন ছেড়ে অন্যত্র যাননি। কিন্তু এই বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে তিনি বার্লিন ছাড়তে বাধ্য হন। 1943 সালে তিনি বার্লিন ছেড়ে ম্যাগডেবার্গ-এর [Magdeburg] কাছাকাছি রোগাৎজ-তে [Rogätz] চলে যান। 1944 সালের ফেব্রুয়ারীতে তাঁর বার্লিনের বাড়িটি বোমার আগুনে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। সব হারিয়ে প্ল্যাঙ্ক খুব দুরবস্থায় পড়েন। আর্থিক ক্ষতির থেকে সবচেয়ে অপূরণীয় যে ক্ষতি হয়, তা শুধু তাঁর নিজস্ব ক্ষতি নয়, বিজ্ঞান জগতের ক্ষতি। তাঁর বাড়ি পুড়ে যাওয়ার সময় তাঁর গবেষণা সংক্রান্ত সব কাগজপত্রই ছাই হয়ে যায়। এই ক্ষতি ছিল তাঁর কাছে মর্মান্তিক। বিজ্ঞান জগতের কাছে ভয়ংকর। এর চেয়েও ভয়ংকর ক্ষতির সম্মুখীন তিনি হন ওই বিশ্বযুদ্ধের জেরে। 1944 সালের 20 শে জুলাই হিটলারকে গুপ্ত হত্যা করার একটা চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়। হিটলারের গেস্টাপো [Gestapo] বাহিনী প্ল্যাঙ্কের পুত্র আরউইন এর সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করে। 1945 সালের প্রথমের দিকে গেস্টাপোরা আরউইনকে হত্যা করে।



যৌবনে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক [1858-1947]



বার্ধক্যে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক [1858-1947]

এতো দুঃখ-কষ্ট পেয়েও তিনি সারা জীবন বিজ্ঞান সাধনার কথা ভোলেন নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় প্ল্যাঙ্কের বয়স ছিল 87 বছর। তাঁর আত্মীয়রা তাঁকে গটিংগেন [Göttingen] শহরে নিয়ে যান। এতো বয়স সত্ত্বেও তিনি জার্মানীর বিজ্ঞান-চর্চাকে নতুন করে গড়ে তোলায় সচেষ্ট হন। কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিটিউটকে [Kaiser Wilhelm Gesellschaft] তিনি নতুন করে গড়ে তোলেন এবং 1945-1946 সালে তিনি পুনরায় এর প্রেসিডেন্ট হন। প্রবল দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও প্ল্যাঙ্ক জার্মানীর বিজ্ঞান সাধনাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

প্ল্যাঙ্ক 1942 সালে তাঁর বার্লিন না ছেড়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে বলেছিলেন ঃ

"I've been here in Berlin at the University since 1889 . so I'm quite an old-timer. But there really aren't any genuine old Berliners, people who were born here ; in the academic word everybody moves around frequently. People go from one university to the next one, but in that sense I'm actually very sedentary But once I arrived in Berlin, it wasn't easy to move away; for ultimately, this is the centre of all intellectual activity in the whole of Germany".

বার্লিন তিনি ছেড়ে যেতে বাধ্য হন 1943 সালে। এতে তিনি প্রাণে বেঁচেছিলেন ঠিকই, কিন্তু 1944 সালে তাঁর বার্লিনের বাড়ি-ঘর সবই ধ্বংস হয়ে যায়। দুটো বিশ্বযুদ্ধ নানাভাবে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের উপর তার কু-প্রভাবগুলি ফেলেছিল। যুদ্ধজনিত তাঁর কষ্টভোগগুলির কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর এই কষ্টভোগের কথা হেইলব্রোন [Heilbron] বলেছেন ঃ

"He would remember, even in his old age, the sight of Prussian and Austrian troops marching into his native town when he was six years old. Throughout his life, war would cause him deep personal sorrow. He lost his eldest son during World War I. In World War II, his house in Berlin was burned down in an air raid. In 1945 his other son was executed when declared guilty of complicity in a plot to kill Hitler".

প্ল্যাঙ্ক রয়েল সোসাইটির সদস্য [FRS] নির্বাচিত হন 1926 সালে। রয়েল সোসাইটি তাঁকে কপ্‌লে পদকে [Copley Medal] ভূষিত করেন 1929 সালে। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক মারা যান 4 ঠা অক্টোবর, 1947 খ্রিস্টাব্দ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 89 বছরেরও বেশি। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন গটিংগেন শহরেই। কণাবাদের জনক এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী জীবনের শেষের দিকটা প্রবল দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কাটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কণাবাদ তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানের জগতে দিয়েছে অমরত্ব।

এখন প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বে আসা যাক। 1859 খ্রিস্টাব্দে কিরকফ আবিষ্কার করলেন যে, (1) কোনও কৃষ্ণ বস্তু [Black Body] কেবলমাত্র তার উপর পতিত সব রকম বিকিরণ শোষণই করে না, উপরন্তু এটি উত্তপ্ত হলে একটি আদর্শ বিকিরকের মত ব্যবহার করে। এবং (2) এই রকম একটা বস্তুর থেকে বের হওয়া বিকিরণ বস্তুটির উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তা কোনভাবেই বস্তুটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। অন্যভাবে বললে,

কৃষ্ণবস্তু এবং তার চারপাশের স্থানের মধ্যে শক্তির আদান-প্রদানের সাম্যাবস্থা ওই বস্তুটির উষ্ণতার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। সাম্যাবস্থায় আবদ্ধ স্থানটি বিকিরণে পরিপূর্ণ থাকবে, যার বর্ণালি বন্টন এবং মোট তীব্রতা একমাত্র উষ্ণতারই অপেক্ষক [Functions] হবে।

কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণের গবেষণায় বিশেষ মনোযোগের বিষয় হল, নিঃসৃত বিকিরণে শক্তির বর্ণালি-বন্টন। বর্ণালির বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে শক্তির বন্টন কেমন এবং কোন্ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তি নির্গত হয়—এগুলিই কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের মুখ্য বিষয়। স্বাভাবিকভাবেই ওই সময় প্রচলিত তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্ব এই ঘটনায় প্রয়োগ করে যে সব ফল পাওয়া যেতে থাকলো সেগুলি পরীক্ষা-লব্ধ ফলের সঙ্গে একেবারেই মিলল না। তত্ত্বীয় ব্যাখ্যার ফলের সঙ্গে পরীক্ষাগারে লব্ধ ফলের বিশাল পার্থক্যই কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের ব্যাখ্যায় সমস্যা নিয়ে আসে। বিজ্ঞানীদের কাছে সে সময় কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। গবেষণা চলতে থাকে।

1888 সালে স্টিফেন এবং বোল্‌ৎজমান দু'জনে মিলে তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্বানুসারে বিকিরণের চাপ এবং তাপগতিবিদ্যার নীতি অনুসরণ করে দেখালেন যে, মোট শক্তি-ঘনত্ব, অর্থাৎ বর্ণালির বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য চারপাশের স্থানের একক আয়তনে বিকিরণের শক্তি কৃষ্ণবস্তুর পরম উষ্ণতার চতুর্থঘাতের [Fourth Power] সঙ্গে সমানুপাতিক। এই সূত্রটি কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের 'স্টিফেন-বোল্‌ৎজমানের চতুর্থ-ঘাত সূত্র' হিসাবে খ্যাত। কিন্তু এই সূত্রও বলতে পারে না বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে শক্তির বন্টন কেমন হবে। তাপীয় বর্ণালিতে শক্তির বন্টনের রীতি-নীতি অব্যাখ্যাতই থেকে গেল।

1893 সালে ভিন [Wien] তাপীয় বর্ণালিতে শক্তির প্রকৃত বন্টন নির্ণয় করতে একটি কোটরের [Enclosure] কল্পনা করলেন, যেটি কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণে পরিপূর্ণ এবং যেটি রুদ্ধতাপ [Adıabatic] প্রসারণ সম্পন্ন ও এটির প্রসারণ বেগ আলোর বেগের তুলনায় খুবই সামান্য। ভিন তাপগতিবিদ্যার যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন, ওই প্রসারণেও বিকিরণ পরিপূর্ণ থাকবে, কিন্তু সেই বিকিরণের ধর্ম হবে একটি নতুন উষ্ণতার বিকিরণের অনুরূপ। রুদ্ধতাপীয় প্রসারণের ক্ষেত্রে বিকিরণ চাপের প্রয়োগ ঘটিয়ে নতুন ধরনের শক্তি-বন্টন সূত্র পাওয়া গেল। এই শক্তি-বন্টন সূত্র 'ভিনের স্থানচ্যুতি সূত্র' [Wien's Displacement Law] নামে বিখ্যাত। প্রকৃতপক্ষে, এই সূত্রে দুটি সূত্র বিদ্যমান। এর একটি হল, λT= ধ্রুবক এবং অন্যটি হল ET^{-5} = ধ্রুবক, যেখানে λ হল উষ্ণতা সাপেক্ষে তরঙ্গদৈর্ঘ্য, T হল উষ্ণতা এবং E হল উৎসর্জন ক্ষমতা [Emissive Power]। প্রথম সূত্রটি বলছে তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও উষ্ণতা পরস্পর ব্যস্তানুপাতিক। আর দ্বিতীয় সূত্রটি বলছে, উৎসর্জন ক্ষমতা উৎসের পরম উষ্ণতার পঞ্চমঘাতের [Fifth Pwoer] সঙ্গে সমানুপাতিক। এই দুই সূত্রকে সংযুক্ত করলে পাওয়া যায়

$$E = K\lambda^{-5} f(\lambda T)$$

যেখানে, λ = তরঙ্গ দৈর্ঘ্য

T = উৎসের পরম উষ্ণতা

K = পরম ধ্রুবক

$f(\lambda T) = \lambda T$ এর একটি অপেক্ষক।

ম্যাক্সওয়েলের বন্টনসূত্র প্রয়োগ করে ভিন যে সূত্রে এসেছিলেন তা হল ঃ

$$d = K\lambda^{-5} e^{-\alpha/\lambda I}.d\lambda$$

যেখানে, K এবং α হল ধ্রুবক। এই সমীকরণ 'ভিনের সমীকরণ' নামে খ্যাত।

1900 খ্রিস্টাব্দে র‍্যালে এবং জীনস্ [Jeans] একটু অন্যভাবে শক্তি বন্টনের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করলেন। তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্ব অনুসারে কোন কৃষ্ণ-বস্তু বিকিরক নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ নিঃসরণ করে যার মান শূন্য থেকে অসীম [Infinity] হতে পারে। এই বিকিরণ একবর্ণী [Monochromatic] তরঙ্গে ভেঙ্গে যায় বলে কল্পনা করে নিলে, এই ধরনের তরঙ্গসংখ্যা, যেগুলি λ ও λ+dλ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে থাকতে পারে, তা নির্ণয় করা যায় পরিসাংখ্যিক বলবিজ্ঞানে'র [Statistical Mechanics] সূত্রগুলি দিয়ে। সবশেষে শক্তির সমবন্টনের উপপাদ্য প্রয়োগ করে, প্রত্যেকটি কম্পন যে পরিমাণ শক্তি বহন করে তা পাওয়া যায়। আর এর ফলেই বেরিয়ে আসে শক্তি বন্টনের সূত্র।

$$d = B\lambda^{-4}.T.e^{\alpha/\lambda T} d\lambda$$

যেখানে B এবং α দুইটি ধ্রুবক। এই সমীকরণটি 'র‍্যালে-জীনস্ সমীকরণ' নামে খ্যাত।

সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি বিকিরিত শক্তি বন্টনের তিনটি সূত্র পাওয়া গেল। একটি স্টিফেন-বোলৎজমান-এর সূত্র, দ্বিতীয়টি ভিনের সূত্র এবং তৃতীয়টি র‍্যালে-জীনস্-এর সূত্র। কিন্তু সনাতন বলবিজ্ঞানের সাহায্যে নির্ণীত শক্তি বন্টনের এইসব সূত্রগুলি থেকে যে সব ফল পাওয়া গেল তা পরীক্ষাগারে পাওয়া ফলের চেয়ে বেশ আলাদা। যেমন ভিনের সূত্রে $T = \infty$ (Infinity) হলেও E অসীম হবে না। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল তা স্টিফেনের চতুর্থ-ঘাত সূত্রের বিরোধী। অসীম উষ্ণতায় শক্তি সীমিত থাকতে পারে না। আবার র‍্যালে-জীনসের সমীকরণ থেকে পাওয়া গেল শক্তির বিকিরণের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সীমার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে অর্থাৎ dλ-য় দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বা λ-র মান হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে। খুব ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের ক্ষেত্রে এই শক্তির পরিমাণ অসীম হতে পারে, যা মোটেই সত্য নয়। এছাড়াও, র‍্যালে-জীনস্-এর সীমকরণের সাহায্যে যদি পুরো পাল্লার বা সীমার তরঙ্গদৈর্ঘ্যসমূহের শক্তির বন্টন শূন্য থেকে অসীম অবধি সমাকলন করে বের করা হয়, তবে মোট শক্তির পরিমাণ সমস্ত রকমের উষ্ণতাতেই অসীম হবে কেবল মাত্র পরম উষ্ণতা ছাড়া। এই ধরনের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি অবাস্তব। এইসব গোলমেলে সিদ্ধান্তের সমীকরণগুলি থেকে বিকীর্ণ শক্তির বন্টনের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। এই সময় পাস্চেন [Paschen] দেখালেন, ভিনের শক্তিবন্টন সমীকরণ ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য কিন্তু দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে নয়। তেমনি, রুবেনস [Rubens], এবং কার্লবাউম [Karlbaum] দেখালেন যে, র‍্যালে-জীনসের সমীকরণ কেবলমাত্র দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে নয়। এই দু-ধরনের

সমীকরণের কোনও একটি পুরো পাল্লার সমস্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপযোগী নয়। এই সমস্যার সমাধানে 1900 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক প্রকাশ করলেন তাঁর কোয়ান্টাম তত্ত্ব [Quantum Theory]। এই তত্ত্ব গাণিতিক রূপ নিয়ে পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় 1900 সালের 14ই ডিসেম্বর।

প্ল্যাঙ্ক তাঁর কণাবাদে বা কোয়ান্টাম তত্ত্বে বললেন, শক্তিব দেওয়া-নেওয়া ও বিকিরণ অবিরত ও অবিচ্ছিন্নভাবে হয না। সনাতন মতবাদের ওই ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন বিকিরণের ধারণাকে বাতিল করে তিনি বললেন যে, শক্তির দেওয়া-নেওয়া ও বিকিরণ সবই হয় বিচ্ছিন্নভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার আকারে। তিনি বললেন, কোনও তরঙ্গের শক্তি কখনও ন্যূনতম একটি সংখ্যার চেয়ে কম হতে পারে না। এই ন্যূনতম সংখ্যাটি হল বিকীর্ণ শক্তির কণা বা কোয়ান্টাম [Quantum]। এই ন্যূনতম শক্তির কণাটির শক্তি E হলে $E = h\upsilon$ হবে, যে υ হল ওই শক্তি তরঙ্গের কম্পাঙ্ক এবং h হল একটি ধ্রুবক যা 'প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক' [Planck's Constant] নামে পরিচিত। এই ধ্রুবকের মান হল 6.624×10^{-27} গ্রাম সেন্টিমিটার^2/সেকেন্ড বা আর্গ-সেকেন্ড।

প্ল্যাঙ্ক তাঁর কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে সম্ভাব্যতার সূত্র মেনে শক্তি বন্টনের যে বিখ্যাত সমীকরণটি বের করলেন তা হল ঃ

$$dE = \frac{8\pi hc\lambda^{-5} d\lambda}{e^{hc/K\lambda T} - 1}$$

যেখানে, dE = শক্তির বন্টন, h − প্ল্যাঙ্কেব ধ্রুবক
c = আলোর গতিবেগ, λ = শক্তিব তরঙ্গদৈর্ঘ্য
T = পরম তাপমাত্র [Abosolute Temperaturc]
K = বোল্ৎজমান ধ্রুবক [Boltzmannn's constant]

প্ল্যাঙ্কেব এই সমীকরণ পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হল। ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে $e^{hc/K\lambda T}$-র মান বেশি হওয়ায় $e^{hc/\lambda KT} - 1 \approx e^{hc/\lambda KT}$ হয় এবং প্ল্যাঙ্কের সমীকরণ সেক্ষেত্রে দাঁড়ায় ঃ

$$dE = 8\pi hc\lambda^{-5}\left(e^{-hc/K\lambda T}\right).d\lambda$$

$$= K.\lambda^{-5}.e^{-\alpha/\lambda T}.d\lambda$$

এটি ভিনের সমীকরণ। এখানে K= ধ্রুবক = 8πhc এবং α = ধ্রুবক = $\frac{hc}{K}$ [K= বোল্ৎজমান ধ্রুবক]

দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে $e^{hc/K\lambda T} - 1 \approx (hc/\lambda KT) \cdot e^{hc/\lambda KT}$ এবং এই মান বসিয়ে পওয়া যায় ঃ

$$dE = 8\pi hc\lambda^{-5} \cdot \frac{k\lambda T}{hc} \cdot e^{-hc/\lambda KT}.d\lambda$$

$$-B\lambda^{4}\, \Gamma e^{\alpha/\lambda\Gamma}\, d\lambda$$

এটি র‍্যালে-জীনসের সমীকরণ, যেখানে B = ধ্রুবক = 8πK এবং α = ধ্রুবক - hc/K [K = বোলৎজমান ধ্রুবক]।

প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব সরাসরি সংঘাতে এলো তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্বের সঙ্গে ম্যাক্সওয়েল তাঁর তত্ত্বে বিকীর্ণ শক্তির তথা আলোব তরঙ্গধর্ম প্রচাব করেছিলেন। প্ল্যাঙ্ক তাঁব কোয়ান্টাম তত্ত্বে আলোর কণাধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন। 1905 সালে আলোর কণাধর্ম আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল আইনস্টাইনের আলোকবৈদ্যুৎ ক্রিয়া তত্ত্বে। আইনস্টাইন বললেন, আলোক-শক্তি শুধু যে খণ্ডখণ্ড ভাবে নির্গত কিংবা শোষিত হয তাই নয়, নির্গমন ও শোষণ এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তীকালে অর্থাৎ প্রবহমান অবস্থায়ও আলো খণ্ড খণ্ড অবিভাজ্য টুকরোর সমষ্টি। কিছুদিন পরে তিনি এই টুকবোগুলির নাম দেন 'ফোটন' [Photon]। আলো কিংবা যে কোন বিকীর্ণ শক্তি হল ঝাঁক ঝাঁক ফোটনের সমষ্টি এবং 'ফোটন' হল শক্তির মূলকণা।

প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে পরবর্তীকালে উদ্ভূত হল কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান [Quantum Mechanics]। আইনস্টাইন, নীল্‌স্ বোর, ব্রগলি, সত্যেন্দ্রনাথ, শ্রোযেডিঙ্গার, হাইজেনবার্গ, ডিরাক, ফের্মি প্রমুখদের হাতে বিকশিত হয়ে প্ল্যাঙ্কের কণাবাদ তথা কোয়ান্টাম তত্ত্ব আজ নিয়ে এসেছে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। পদার্থবিজ্ঞান আজ যে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে তার একটি আপেক্ষিকতাবাদ বা আপেক্ষকীয় বলবিজ্ঞান [Relativistic Mechanics] এবং অন্যটি কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। প্রথমটি প্রযোজ্য হচ্ছে মূলতঃ জাগতিক ঘটনাবলীতে। আর দ্বিতীয়টি প্রয়োগ করা হচ্ছে কণাজগতের অভ্যন্তরীণ ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যায়। প্ল্যাঙ্ককে বলা হয় কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের জনক এবং আইনস্টাইন হলেন তার পরিপোষক। আর আপেক্ষিকতাবাদের জনক হলেন আইনস্টাইন স্বয়ং।

প্ল্যাঙ্কের যে সমস্ত বই ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে বিশ্বখ্যাত হয়েছে সেগুলি হল ঃ (1) Introduction to Theoretical Physics [5 Vols] [1932-33], (2) Treatise on Thermodynamics, 3rd revised edition [1945], (3) Scientific Autobiography and Other Papers [1949] এবং [4] New Science [1959] । New Science বইটিতে প্ল্যাঙ্কের তিনটি মূল্যবান পুস্তক একত্রিত করা হয়েছে। এই তিনটি বই হল ঃ (1) Where the Science is going ? (2) The Universe in the Light of Modern Physics এবং (3) The Philosophy of Physics। পদার্থ বিজ্ঞানে তাঁর এই বইগুলির অবদান অতুলনীয়। বিজ্ঞানের বই ছাড়াও তিনি দর্শন ও ধর্ম নিয়েও কয়েকটি বই লিখেছিলেন।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

[1879–1955]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছিল যে, পদার্থবিজ্ঞানের যুগ শেষ হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের এই শাখায় পড়াশুনো করা কিংবা গবেষণা করা অর্থহীন। এই রকম একটা সময়ে 1879 সালের 14 ই মার্চ জার্মানির উলম্ [Ulm] শহরে এক ইহুদী পরিবারে জন্মেছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন [Albert Einstein]। তিনি তাঁর যুগান্তকারী সব আবিষ্কার দিয়ে শুধু যে পদার্থবিজ্ঞনকেই নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত করলেন তা নয়, সমস্ত বিজ্ঞানকে দিলেন সুদুর-প্রসারী নতুন দিগন্ত। আধুনিক বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি তার মূল হোতা হলেন আইনস্টাইন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বললে তাই যাঁর নামটি সবার আগে মনে আসে তিনি হলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

উলম্ শহরটি আয়তনে ছোট, কিন্তু বেশ প্রাচীন। এর একপাশ দিয়ে বয়ে গেছে দানিয়ুর নদী। আর একদিকে আল্পস পর্বতমালা। জায়গাটা ফ্রান্সের আলসাস অঞ্চলের কাছাকাছি। কিন্তু এটি জার্মান প্রুসিয় অঞ্চলের অন্তর্গত। তাই, এই অঞ্চলে যেমন একদিকে প্রুসিয় ঐতিহ্যের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী, তেমনি এখানে ছিল ফরাসী প্রভাবও। ফলে, এই অঞ্চলের লোকেরা ছিল উদারনীতির ভক্ত এবং রক্ষণশীল ঐতিহ্যের পূজারী। এই দুটি মনোবৃত্তি আইনস্টাইনের চরিত্রেও বিদ্যমান ছিল। এই দুই ঐতিহ্যের ভালো দিকগুলিই এসেছিলো তাঁর মানসিকতায়, তাঁর চরিত্রে। এই শহরে বেশির ভাগ অধিবাসীই ছিল খ্রিস্টধর্মাবলম্বী, রোমান ক্যাথলিক। ইহুদী পরিবার ছিল মাত্র কয়েকশো। অ্যালবার্টের ঠাকুর্দা এই শহরে এসে বসবাস শুরু করেন 1868 খ্রিস্টাব্দে।

অ্যালবার্টের বাবা হেরমানের [Hermann] ইচ্ছে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার। কিন্তু স্টুটগার্ট [Stuttgart] জিমনেসিয়াম থেকে পাশ করে বের হওযার পর অর্থাভাবে তাঁকে পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে হয়। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। কিন্তু জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁকে ব্যবসায় নামতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা আর তাঁর হয়ে উঠে নি। হেরমান ব্যবসা শুরু করলেন। স্টুটগার্টের এক খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ীর মেয়ে পলিন কোখ-কে [Pauline Koch] হেরমান বিয়ে করলেন 1876 খ্রিস্টাব্দে। পলিনের বাবা ছিলেন স্টুটগার্টের [Stuttgart] ধনী ব্যবসায়ী। মেয়েকে তিনি গাইতে এবং বাজাতে শিখিয়েছিলেন। পলিন সঙ্গীত খুবই ভালোবাসতেন। তিনি গাইতে পারতেন। পিয়ানোও খুব ভাল বাজাতে পারতেন। তিনি ছিলেন বীটোভেনের ভক্ত। এই পলিনই হলেন বিশ্ববিশ্রুত আইনস্টাইনের মা। বিয়ের তিন বছর পর তাঁর কোলে আসেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

ছেলেবেলায় অ্যালবার্ট ছিলেন বেশ গম্ভীর এবং কিছুটা চাপা প্রকৃতির। যুদ্ধের বাজনা

ও সৈন্যদের কুচকাওয়াজ তিনি ছেলেবেলা থেকেই একদম সহ্য করতে পারতেন না। অথচ এই ব্যাণ্ডের আওয়াজ প্রায় সব ছেলেরাই ভালোবাসে। কিন্তু অ্যালবার্ট ছিলেন একেবারে ব্যতিক্রম। এই অনুভূতি তাঁকে ভবিষ্যৎ জীবনে এক মহান শান্তিবাদী হিসাবে গ'ড়ে তুলেছিল। তা ছাড়া সঙ্গীতজ্ঞা মায়ের পাশে বসে অতি অল্প বয়স থেকেই সঙ্গীতে তাঁর প্রবল অনুরাগ জন্মে। মিউনিখের আইনস্টাইন-বাড়ীতে যে পারিবারিক সান্ধ্যানুষ্ঠান হত, তাতে সবচেয়ে মুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন সম্ভবত অ্যালবার্ট, যদিও সে বয়সে গান কিংবা বিজ্ঞানের নানা নতুন নতুন আবিষ্কারের সম্বন্ধে তিনি প্রায় কিছুই বুঝতেন না। বয়স কিছুটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সব অনুষ্ঠান খুব দাগ কেটেছিলো তাঁর মনে। পরবর্তীকালে তিনি যখনই সুযোগ পেয়েছেন, বাড়ীতে এ ধরনের সান্ধ্য মজলিস বসিয়েছেন। এই সান্ধ্য মজলিসই তাঁর বিজ্ঞানী তথা বেহালাবাদক হওয়ার অনুপ্রেরণা।

ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন শান্ত ও সংযত। তাঁর যখন চার-পাঁচ বছর বয়স, তখন তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন এক সময়। বাবা হেরমান এই সময় অ্যালবার্টকে একটা কম্পাস [Compass] কিনে দেন। কম্পাসের কাঁটার একটা নির্দিষ্ট দিকের সর্বদা উত্তরে অবস্থান এবং অন্য যে কোন দিক থেকে ছেড়ে দিলে আবার তার উত্তর-দক্ষিণে ফিরে আসা— এগুলি বালক অ্যালবার্টের মনে প্রবল বিস্ময় ও কৌতূহল সৃষ্টি করে। ওই বয়সে তিনি কম্পাসটি সারাক্ষণ নাড়াচাড়া করতেন। এমন কি বিছানায় শুতে যেতেন ওই কম্পাস সঙ্গে নিয়ে। এই কম্পাস তাঁর মনে এক গভীর এবং স্থায়ী অনুভূতি জাগিয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি এক সময় লিখেছিলেন যে, এই ধরনের বিস্ময় জাগরিত হয় তখন, যখন আমাদের কোনও বিষয়ে অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের মনের কতকগুলি বদ্ধমূল কল্পনার সংঘাত বাধে। এই ভাবেই তাঁর মনে মানব-চেতনা-নিরপেক্ষ জগতের সত্তা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল।

ছেলেবেলায় অ্যালবার্ট একদম পড়াশুনা করতে চাইতেন না। লেখাপড়ার কথায় তাঁর গায়ে জ্বর আসতো। এই সময় তাঁর জীবনে প্রথম যে আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটে তা হল ওই কম্পাস সংক্রান্ত ঘটনা। বাবা তাঁকে যে কম্পাসটি কিনে দিয়েছিলেন তাকে নিয়ে অ্যালবার্ট হয়েছিলেন মন্ত্রমুগ্ধ। অন্যান্য পড়াশুনায় অমনোযোগী হলেও, কম্পাস নিয়ে তাঁর প্রকৃতিকে জানার প্রথম পাঠ শুরু হয় গৃহশিক্ষকের কাছে। জগতের সত্তা যে Extra-Personal বা মানব-চেতনা নিরপেক্ষ এই ধারণার শুরু কিন্তু ছেলেবেলায় পাওয়া ওই কম্পাস থেকেই। পরবর্তীকালে মানব-চেতনা নিরপেক্ষ জগতের সত্তার ধারণা আরও দৃঢ় হয় তাঁর চিন্তায়, তাঁর মননে।

1888 খ্রিস্টাব্দে তাঁর বয়স যখন নয় পেরিয়ে দশ বছর, তখন তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয় মিউনিখের লুইৎপোল্ড জিমনেসিয়ামে [Luitpold Gymnasium]। এই বিদ্যালয়ে এসে তিনি ইহুদী-বিদ্বেষের বেশ কিছু আভাস পান। খ্রিস্টধর্মবলম্বী ছাত্রেরা যে কয়েকজন ইহুদী ছাত্র ছিল, তাদের সবাইকে প্রবল ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো। শান্ত, দরদী অ্যালবার্ট এতে খুবই আগাত পেতেন। তার উপর শিক্ষকদের কঠোর ব্যবহার তাঁর মনে ভয় জাগাতো। বিদ্যালয়

তাঁর কাছে ছিল কয়েদখানা। তাঁর মনে হত, যে কয়েদখানায় ছাত্রেরা হল কয়েদী। আর মাস্টারমশাইরা সব পাহারাদার, যাঁরা পালা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাসঘরে এধার থেকে ওধারে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছেন। এছাড়াও তাঁর বিদ্যালয়ে না যেতে চাওয়ার আর একটি কারণ ছিল। ছোটবেলা থেকেই তিনি বাবা, মা ও কাকাকে এবং বিদ্যালয় শিক্ষকদের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। তিনি কোন বিষয় মুখস্থ করতে চাইতেন না, যতক্ষণ না তার মানে কিংবা তাৎপর্য বুঝতেন। এই স্বভাবের জন্য তিনি শিক্ষকদের নানা প্রশ্ন করতেন। ফলে, শিক্ষকেরা তাঁর উপর বেশ বিরূপ ছিলেন এবং তাঁরা মাঝে মাঝে রুলার দিয়ে অ্যালবার্টকে মারতেন। এই সব কারণে বিদ্যালয় তাঁর কাছে হয়ে ওঠে ঘৃণার বস্তু। মাঝে মাঝে তিনি তাই বিদ্যালয়ে যাবেন না বলে জিদ ধরতেন।

বিদ্যালয় সম্পর্কে যখন অ্যালবার্টের এমনই বিতৃষ্ণা, এই সময় কাকা ইযাকব তাঁকে বোঝালেন, "যে কাজ করতে কারো ভালো লাগে, সে নিশ্চয়ই সে কাজ করবে। কিন্তু যদি কেউ এমন অবস্থায় এসে পড়ে যে, তাকে যে কাজটি করতে হচ্ছে সেটি তার অপছন্দের, তবে তাকে এমন একটি উপায় বের করতে হবে, যাতে কাজটি ভালোভাবে করা যায়।" অ্যালবার্ট কাকাকে বললেন যে, বীজগণিত এবং জ্যামিতি পড়তে তাঁব একদম ইচ্ছা কবে না। ইয়াকব তখন দুটি উদাহরণ দিয়ে অ্যালবার্টের এই অনীহা দূব কবেন। এই দুটি উদাহবণেব কথা আইনস্টাইনের ছেলেবেলার কথার সঙ্গে ওতপ্রোত হযে জড়িযে আছে।

ইয়াকব ভাইপোকে বলেছিলেন, "মনে কর, আমরা শিকাব করতে গিয়ে অজানা কোন একটি ছোট্ট প্রাণীর পিছু ধাওয়া করছি। অজানা ওই বন্য প্রাণীটিকে আমরা বলবো 'x'। তারপর যখন শিকরটি ধরব তখন আমরা সেটিকে নানা প্রকাব পরীক্ষা-নিবীক্ষা কবে জানব সেটি কোন্ প্রাণী। আমাদের নানা উপায় খুঁজে বের করতে হবে অজানাকে জানতে।" এর পর তিনি আরেকটা উদাহরণ দিয়েছিলেন ভাইপোর জ্যামিতি ভীতি দূব করতে। "মনে কর তুমি একজন ডিটেকটিভ। তোমাকে বলা হযেছে একটা লোককে ধরতে। লোকটির নাম, পরিচয় জানো না, জানো না সে কী দুষ্কর্ম করে। তুমি একটি ফাইল খুললে এবং তার নাম দিলে 'x'। তারপর নানারকম সূত্র বের করে চেষ্টা করতে লাগলে লোকটিকে ধরতে এবং ফাইলে তোমার মন্তব্য লিখতে লাগলে। একদিন তার পিছু নিলে এক রাস্তা দিয়ে ঢুকে অন্য রাস্তা দিয়ে বেরুলে, কিংবা একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ [Hypotenuse] দিয়ে গড়িয়ে পড়লে, সে লোকটি হয়ত লম্ব [Perpendicular] বেয়ে উঠে পড়ল, তারপর হয়ত সে একটি সামান্তরিক [Parallelogram] ঘবের পাশের দেওয়ালগুলো ঘেঁসে পালাতে চেষ্টা করল, তুমি কর্ণ [Diagonal] দিয়ে দৌড়ে অবশেষে তাকে ধরলে। তখন তুমি তাব সব জানতে পারলে এবং তার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে তাকে তোমার ফাইল সমেত উপরওয়ালার কাছে দিয়ে দিলে। বীজগণিতই বল, আর জ্যামিতিই বল, এই হল সব।" এই দুটি উদাহরণে অ্যালবার্ট খুব খুশি হলেন এবং নানা সূত্র দিয়ে অজানাকে জানার আগ্রহে তাঁর বীজগণিত ও জ্যামিতি ভীতি দূর হয়ে গেল। এরপর তিনি বিদ্যালয়ে যেতে আর খুব একটা আপত্তি করতেন না।

যাই হোক, তাঁর কাকার ওই বোঝানোর পর তিনি বিদ্যালয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু লেখাপড়ায় অসাধারণত্ব কিছু দেখাতে পারেন নি, তবে বছর বছর প্রমোশন পেয়ে যেতে

লাগলেন। অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যায় খুব ভালো নম্বব পেলেও জীববিদ্যা, ল্যাটিন, গ্রীক ইত্যাদি প্রাচীন ভাষা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে আনন্দ পেতেন না মোটেই। সেইজন্য তিনি ভালো করে পড়তেনও না ওই বিষয়গুলি। ফলে নম্বর কম পেতেন ওইসব বিষয়ে।

জার্মানীর সামরিক শাসন ও কায়দাকানুনের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে তাঁর বাবা-কাকা ব্যবসা উঠিয়ে নিয়ে ইতালির মিলান শহরে চলে যান। তবে অ্যালবার্টের পড়া শেষ হয় নি বলে তাঁকে এক বন্ধুর বাড়ীতে রেখে যান। কিন্তু নানা কারণে অ্যালবার্ট মিউনিখে অত্যন্ত অসুখী বোধ করতে লাগলেন। গণিতে ও পদার্থবিদ্যায় আরো বেশি করে জানবার স্পৃহা তাঁর কিছুতেই মিটছিলো না। শিক্ষকদের জ্ঞানই ছিলো ভাসাভাসা। তাছাড়া গাদাগাদা গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার বই মুখস্থ কবা তাঁব পক্ষে খুবই বিরক্তিকর ছিল। মা-বাবা ছাড়া নিঃসঙ্গ জীবন, ছাত্রদের ব্যঙ্গ ও শিক্ষকদের কঠোরতা সব মিলিয়ে পরিবেশ তাঁর এমনি অসহনীয় হয়ে উঠলো যে এক ডাক্তারের কাছ থেকে স্নায়বিক দৌর্বল্যের সার্টিফিকেট জোগাড় করে ছয় মাসের ছুটি নিলেন বিদ্যালয় থেকে। তিনি মিলানে মা-বাবার কাছে চলে গেলেন। ইতালি তাঁর ভীষণ ভালো লাগলো। ইতালিতে এসেই জার্মানীর নাগরিকত্ব ত্যাগ করলেন বটে পরবর্তীকালে ঘটনাচক্রে এক বন্ধুর প্রাণ বাঁচাতে তিনি বাধ্য হয়ে জার্মানীর নাগরিকত্ব আবার গ্রহণ করেন।

হেরমান ও ইয়াকব প্রাণপণ চেষ্টা করেও মিলানে তাঁদের ব্যবসা দাঁড় করাতে পারলেন না। জমা টাকা ক্রমশঃ খরচ হয়ে যেতে থাকলো। তাঁদের শরীরও ভেঙ্গে পড়ছিল। হেরমান ছেলেকে জানিয়ে দিলেন, উচ্চতর গণিত ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষার ব্যয় বহন কবা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। বরং অ্যালবার্ট তাড়াতাড়ি কোনও কারিগরি শিক্ষা নিয়ে চাকরিতে ঢুকে পড়ুক—এই কথাই তিনি সরাসবি জানিয়ে দিলেন ছেলেকে। মিউনিখে থাকাকালীন অ্যালবার্ট 1895 খ্রিস্টাব্দে বেলজিয়ামে তাঁর মামা সিজাব কোখ [Caesar Koch]-কে একটি নিবন্ধ লিখে পাঠান। এর শিরোনাম- "চৌম্বক ক্ষেত্রে ইথারের অবস্থা নিয়ে একটি অনুসন্ধান" [An investigation of the state of the Ether in a magnetic field]। এটিই সম্ভবত আইনস্টাইনের প্রথম নিবন্ধ। তবে ওই বছবই বসন্তকালে তিনি মিউনিখের স্কুল ছেড়ে দিয়ে মিলানে চলে আসেন। এ সময়ে অ্যালবার্ট চেয়েছিলেন পদার্থবিদ্যা ও গণিতে উচ্চতর শিক্ষালাভ করতে। কিন্তু মিউনিখ স্কুলের ডিপ্লোমা না থাকায় কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। অনেক পরামর্শেব পর ঠিক হল তিনি জুরিখে 'দি ফেডারাল ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজী'-তে [E.T.H.] উচ্চশিক্ষা লাভ কববেন। কিন্তু সেখানে ভর্তি হওয়ার প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিদ্যায় অত্যন্ত ভালো ফল করলেও বিদেশী ভাষা, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায় ভাল ফল না করায় ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। পলিটেকনিকের কর্মকর্তারা গণিত এবং পদার্থবিদ্যায় তাঁর গভীর জ্ঞান দেখে তঁকে সুইজাবল্যাণ্ডের একটি ছোট্ট শহর আরাউয়ের ক্যান্টনাল বিদ্যালয়ে [Cantonal School] এক বছব ওই সব বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে পরের বছর পলিটেকনিকে আসতে বললেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অ্যালবার্ট আরাউয়ের প্রাদেশিক বিদ্যালয় Gewerbeabteilung - তে ভর্তি হলেন 28 শে অক্টোবর, 1895 খ্রিস্টাব্দে। তখনও মিউনিখ বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা-লব্ধ ভীতি তাঁর

কাটেনি। কিন্তু আরাউয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা হলো মিউনিখেব একেবারে বিপরীত। এখানে তিনি থাকতেন 'পাপা' জোস্ট উইন্‌টেলারের বাড়ীতে। ইনি অ্যালবার্টের শিক্ষকদেব অন্যতম। এই সময় আইনস্টাইন ফরাসীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধের শিরোনাম—"Mes projects d'avenir"।

আরাউতে পড়তে এসে মিউনিখের স্কুল-আতঙ্ক কেটে গেল। এখানে শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে ছিল মধুর সম্পর্ক। শিক্ষকদের পাণ্ডিত্য এবং পড়াবার পদ্ধতি অ্যালবার্টকে মুগ্ধ করল। অ্যালবার্ট খুব মন দিয়ে সব বিষয়ে পড়াশুনা করতে লাগলেন। উঁচু ক্লাসের ছাত্রেরা রাজনীতি, সমাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন। অ্যালবার্ট সেগুলিও শুনতেন। এগুলি তাঁর মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কও ধীরে দীরে সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে থাকে। আরাউতে অধ্যাপক উইন্‌টেলার ও তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। হেরমানের ব্যবসা এই সময় এতো খারাপ হয়ে পড়ে যে ছেলের পড়াশুনার খরচ যোগাতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়েন। এই উইন্‌টেলারই চেষ্টা করে জেনোয়াবাসী তাঁর এক ধনী বন্ধুর থেকে অ্যালবার্টের জন্য মাসিক একশো ফ্রাঁ আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। উইন্‌টেলারের ছেলে কার্ল অ্যালবার্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে পড়েন। এই কার্লই পরে তাঁর বোন মায়াকে বিয়ে করেন। কার্ল কিছুটা পরে হেরমানের ব্যবসাতে যোগ দিয়ে তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেন। উইন্‌টেলার-পরিবার নানাভাবেই আইনস্টাইন-পরিবারকে সাহায্য করেছিলেন। পরে এই দুই পরিবার আত্মীয়তায় আবদ্ধ হন। এই মাসিক একশো ফ্রাঁ সাহায্য না পেলে ওই সময় অ্যালবার্টের হয়ত আর পড়াশুনা করা সম্ভব হত না।

অ্যালবার্ট এইখানেই পড়বার সময় আলোর কয়েকটি আশ্চর্য গুণাবলী নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন। ম্যাক্সওয়েল [Maxwell] 1865 সালে প্রমাণ করলেন, আলো মানেই চলন্ত তরঙ্গ। অ্যালবার্টের প্রশ্ন হলো কোনও একটি লোক যদি আলোর গতিবেগ নিয়ে আলোর সঙ্গে ছোটে ওই রশ্মিকে ধরবে বলে তবে তার কাছে আলো সচল অবস্থায় প্রতীয়মান হবে না, মনে হবে স্থির। তাহলে আলোকে সচল তরঙ্গ হতেই হবে এই দাবী কী করে টিকে থাকছে? আবার মাইকেলসন ও মরলের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় [1881-1887] দেখা গেল আলোর বেগ উৎস কিংবা আলোক গ্রাহকের বেগের উপর নির্ভরশীল নয়। এই বিষয়টিই অ্যালবার্টকে আরাউয়ের এই সময় যথেষ্ট ভাবিয়ে তোলে। প্রথমে 1881 সালে এবং পরে 1887 সলে মাইকেলসন-মরলে তাঁদের অতি বিখ্যাত পরীক্ষায় দেখালেন, ইথারের কোন অস্তিত্ব নেই এবং আলোর রশ্মিকে পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম যে কোন দিক থেকে পাঠানো হোক না কেন, আলোর গতিবেগ সবসময় একই থাকবে। পৃথিবীতে থাকা আলোর উৎস থেকে নির্গত আলোক রশ্মির উপর পৃথিবীর গতির কিংবা আবর্তন বেগের কোনও প্রভাব থাকে না। পৃথিবীব কক্ষাবর্তনের বেগ সেকেণ্ডে প্রায় 30 কিলোমিটার। আবার শব্দের বেলায় যেমন উৎস কিংবা গ্রাহকের গতিবেগের সঙ্গে তার আপেক্ষিক গতিবেগ বাড়ে বা কমে, আলোর বেলায় তা হয় না কেন? এই প্রশ্ন আরাউয়ে থাকাকালীন তাঁর মনে বার বার নাড়া দিতে শুরু করে।

আইনস্টাইন তাঁর সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজতেন রেল ইঞ্জিনকে কল্পনায় এনে। শব্দের গতিবেগ সেকেণ্ডে 360 মিটার। ধরা যাক, একটা ইঞ্জিন ঘন্টায় 36 কিমি বেগে একটা ঘন্টাঘরের দিকে ছুটছে। সুতরাং তার সেকেণ্ডে গতিবেগ 10 মিটার। ঘণ্টাঘরে নিরলস ঘণ্টা বাজছে। ওই ইঞ্জিনের চালক যখন ঘণ্টাঘরের দিকে ইঞ্জিনটি নিয়ে যাচ্ছে তখন তার কাছে মনে হবে শব্দের বেগ 360+10 মিটার বা 370 মিটার। আবার ওই ঘণ্টাঘর পেরিয়ে ইঞ্জিনটি যখন একই বেগে দূরে চলে যাবে তখন ওই চালকের কাছে মনে হবে শব্দের গতিবেগ 360 –10 মিটার বা 350 মিটার। কিন্তু আলোর ক্ষেত্রে এই রকম তারতম্য ঘটবে না। ইঞ্জিনের বেগ যতই দ্রুত করা যাক, ওই ঘণ্টাঘরে মশাল জ্বালালে তার থেকে নির্গত আলোর গতিবেগ চালকটির কাছে একই থাকবে। অ্যালবার্টের মনে প্রশ্ন ছিল, শব্দের বেলায় যেমন আপেক্ষিক গতিবেগের তারতম্য ঘটেছিল গ্রাহকের গতিবেগের জন্য, আলোর বেলায় তা হয় না কেন? পরবর্তী জীবনে এই প্রশ্নের উত্তর তিনি পেয়েছিলেন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে [Special Therory of Relativity]। সে তত্ত্বে তিনি এসেছিলেন 1905 খ্রিস্টাব্দে।

1896 সালের 29 অক্টোবর আইনস্টাইন জুরিখের পলিটেকনিকে ভর্তি হলেন। আরাউয়ের পরীক্ষায় পাশ করায় এবার এখানে ভর্তি হতে তাঁর আর কোনও অসুবিধা হয় নি। এখানে তাঁর পাঠ্য বিষয় ছিল পদার্থবিদ্যা, গণিত, ইঞ্জিনীয়ারিং, ভূ-বিদ্যা [Geology], দর্শন, ইতিহাস, অর্থবিদ্যা শাস্ত্র [Economics] এবং সাহিত্য। এখানেই তাঁর চার-পাঁচজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়। এঁরা হলেন মার্সেল গ্রসম্যান [Marcel Grossman], ফ্রেডরিক অ্যাডলার [Fredrick Adlar], লুই কলরস [Louis Kollros], ইয়াকব য়েহরাট [Jacob Ehrat] এবং মিলেভা মারিচ [Mileva Maritsch]। এখানেও তিনি ক্লাস পালাতেন। বিশেষ করে যে সব অধ্যাপকের পড়ানো তাঁর ভালো লাগতো না তাঁদের ক্লাস মোটেই করতেন না এই ভাবী মহাবিজ্ঞানী। এই মিলেভাই পরবর্তীকালে আইনস্টাইনের প্রথমা পত্নী হন। জুরিখে পড়বার সময় তিনি ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির। সার্বিয়ার মেয়ে মিলেভা জার্মানীদের খুবই ঘৃণা করতেন তাদের সামরিক শাসন এবং পরের দেশ জয়ের মনোবৃত্তির জন্য। জুরিখে উচ্চ-বিজ্ঞান শিখে সার্বিয়ায় গিয়ে শিক্ষকতা করবেন এই ইচ্ছা নিয়েই তিনি পড়তে এসেছিলেন। জুরিখে এসে হলেন অ্যালবার্টের সহপাঠিনী। বন্ধুদের মধ্যে এই সময় নানা বিষয়ে আলোচনা হত। বিজ্ঞান আলোচনা শুরু হলে অ্যালবার্ট একাই ছিলেন একশো। গম্ভীর প্রকৃতির মিলেভা এই সব আলোচনায় যোগ দিতেন। কিন্তু তিনি কেবল শুনতেন। সব আলোচনাতেই তিনি ছিলেন নীরব শ্রোতা। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অ্যালবার্টের একেবারে বিপরীত। তেমন কিছু আকর্ষণীয় সৌন্দর্যও তাঁর ছিল না। অ্যালবার্টের সঙ্গে একটা বিষয়ে তাঁর বেশ মিল ছিল। তা হল প্রসিদ্ধ পদার্থবিদদের কাজ সম্বন্ধে আগ্রহ এবং তাঁদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও নিবন্ধ ইত্যাদির পড়াশুনা। এই মিলেভাকেই অ্যালবার্ট ভালোবাসলেন। পরে এঁকে বিয়ে করলেন। মিলেভাই আইনস্টাইনের প্রথম পত্নী।

1900 খ্রিস্টাব্দ। পলিটেকনিকের শেষ পরীক্ষায় পাশ করলেন অ্যালবার্ট তথা

আইনস্টাইন। গ্র্যাজুয়েট হলেন মহাবিজ্ঞানী। পরীক্ষার ফল খুবই সাধারণ। বন্ধুরা তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে ভেবেছিলেন আইনস্টাইন অসাধারণ ফল করবেন। তা হয় নি। তার কারণ ছিল কয়েকজন অধ্যাপকের বিরূপতা এবং আইনস্টাইনের পড়াশুনা কেবল পরীক্ষায় পাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকা। যাইহোক, আইনস্টাইন শিক্ষা পর্ষদের ডিপ্লোমা পেলেন 28 শে জুলাই, 1900 খ্রিস্টাব্দে। তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যা [Theoretical Physics], পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যা [Experimental Physics], জ্যোতির্বিজ্ঞানে [Astronomy] আইনস্টাইন পান পূর্ণ নম্বর ছয়ের মধ্যে পাঁচ নম্বর এবং ফাংশনে পান 5.5 নম্বর। ডিপ্লোমা পত্রে মোট নম্বর পান 4.5 পূর্ণ মান 6-এর মধ্যে। সুতরাং তাঁর পাশ ছিল খুবই সাধারণভাবের পাশ। মার্সেল গ্রসম্যানও তাঁর সঙ্গে পাশ করেন অনেক বেশি নম্বর পেয়ে। কিন্তু মিলেভাকে আরো এক বছর পড়তে হয়।

বহু চেষ্টা করেও আইনস্টাইন এই সময় একটা চাকরি জোটাতে পারেন নি। পরীক্ষার ফল তাঁর ভালো ছিল না এবং সুইশ নাগরিকত্বও তাঁর ছিল না তখন। 1901 সালের 21 শে ফেব্রুয়ারী তিনি সুইশ নাগরিকত্ব পান। বন্ধু এডলারের সুপারিশে দু'মাসেব জন্য তিনি শিক্ষকের কাজ পান। 1901 সালের 15 ই মে থেকে 15 ই জুলাই পর্যন্ত তিনি ভিনটারটুর [Winterthur] শহরের টেকনিক্যাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন এডলারের জায়গায়।

বন্ধু ফ্রেডরিক অ্যাডলার এই চাকরিটি স্থায়ীভাবে পেয়েছিলেন। তাঁকে দু-মাসেব সামরিক শিক্ষায় যেতে হয়। তিনিই ওই দু'মাসের জন্য আইনস্টাইনের নাম সুপারিশ করেন কর্তৃপক্ষের কাছে। বন্ধু আইনস্টাইনের পাণ্ডিত্যের উপর অ্যাডলারের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ভবিষ্যতেও তিনি জুরিখের পলিটেকনিকের অধ্যাপকের পদ-প্রার্থনা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সে পদে আইনস্টাইনকে নিযুক্ত করার সুপারিশ করেছিলেন।

দু'মাস পরে আবাব বেকার হলেন আইনস্টাইন। এদিকে মিলেভা ও আইনস্টাইন তাঁদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চান। এমনও কথা হল যে, মিলেভা চাকরি করবেন জুরিখ কিংবা সার্বিয়াতে। তেমন একটা চাকরি পাওয়া মিলেভার পক্ষে কঠিনও হবে না। আর আইনস্টাইন থাকবেন মিলেভার কর্মস্থলে। মিলেভার এই প্রস্তাবে আইনস্টাইন রাজী হলেন না। বন্ধুরা মিলেভাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে রাজী করালেন। কিছুদিনের জন্য আবারো একটা অস্থায়ী শিক্ষকের কাজ পেলেন শ্যাফহাউজেন [Schaffhausen]-এ। কাজ করলেন 1901 সালের 20 শে অক্টোবর থেকে জানুয়ারী, 1902 খ্রিস্টাব্দ। এরই মধ্যে 18 ই ডিসেম্বর, 1901 খ্রিস্টাব্দে বার্নের পেটেন্ট অফিসে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেন আইনস্টাইন। 21 শে ফেব্রুয়ারী, 1902 খ্রিস্টাব্দে তিনি বার্নে আসেন। 1902 সালের প্রথম দিকটায় তাঁকে ব্যয় নির্বাহ করতে হত বাড়ী থেকে পাঠানো সামান্য কিছু টাকা এবং পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কের ছাত্রদের পড়িয়ে যা পেতেন তাই দিয়ে।

সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন [Bern] শহরের পেটেন্ট [Patent] অফিসে অল্প মাইনের পেটেন্ট পরীক্ষকের কাজটির খোঁজ এনেছিলেন বন্ধু মার্সেল।ওই অফিসের এক কর্মকর্তা ছিলেন মার্সেলের বাবার বন্ধু। মার্সেলের বাবার চেষ্টাতেই পেটেন্ট অফিসের কাজটি আইনস্টাইন

পেয়ে যান। আইনস্টাইনের তখন একটা চাকরির দরকার ছিল প্রবলভাবেই। মার্সেল যখন প্রথম সসঙ্কোচে আইনস্টাইনকে এই চাকরির খবরটা জানান এবং বলেন যে তাঁর বাবার অনুরোধে ওই চাকরিটি আইনস্টাইন পেতেও পারেন, তখন আইনস্টাইন বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন যে, সামান্য কি অসামান্য তা তিনি মূল্য দিয়ে যাচাই করবেন না। তাঁর নিজের পাণ্ডিত্যের কদরও এতদিন খুব দেখেছেন। যা পাবেন তাই তাঁর কাছে মহামূল্যবান। আইনস্টাইন বার্নের ওই কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি ওঁকে ওই চাকরির জন্য মনোনীত করলেন। 1902 খ্রিস্টাব্দের 16ই জুন সুইস ফেডারেল কাউনসিল পরীক্ষমূলকভাবে বার্নের পেটেন্ট অফিসে তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীর প্রযুক্তি-বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োগ করে। তাঁর বেতন ঠিক হয় বাৎসরিক 3500 সুইশ ফ্রাঁ। 23 শে জুন থেকেই এই অফিসে কাজ শুরু করে দেন তিনি।

1903 সালের 6 ই জানুয়ারী মিলেভা মারিচের [Mileva Maritsch] সঙ্গে আইনস্টাইনের বিবাহ হয়। বার্নের Naturforschende Gesellschaft-এ তিনি 'তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গতত্ত্ব' নামে এক গবেষণাপত্র জমা দেন। 1904 সালের 14 ই মে তাঁর ও মিলেভার প্রথম পুত্র হ্যানস্ জন্মগ্রহণ করেন। ওই বছর তাঁর পেটেন্ট অফিসের চাকরিটিও পাকা হয়।

1905 খ্রিস্টাব্দ। মার্চ মাসে তিনি লিখলেন 'আলোক কোয়ান্টাম প্রকল্প' [Light Quantum Hypothesis] নামের গবেষণা পত্রটি। এপ্রিলমাসে তিনি তাঁর পি-এই-ডি-এর গবেষণাপত্রটি শেষ করেন। তাঁর বিষয় হল 'আণবিক মাত্রগুলির নব নির্ণয়' [On a new determination of molecular dimension]। এটি ছাপা হয় বার্নে, পেশ করা হয় জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এটি মনোনীত হয় জুলাইতে। ওই 1905 সালেই প্রকাশিত হয় 'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ' [Special Theory of Relativity] নিয়ে দুটি গবেষণাপত্র। ওই বছরই প্রকাশিত হয় 'ব্রাউনীয় বিচলন'-এর দুটি গবেষণাপত্র। 1906 সালে আইনস্টাইন 'কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ' [Specific Heat of Solid] বিষয়ক গবেষণাপত্রটি শেষ করেন। পদার্থের কঠিন অবস্থা বিষয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর সর্বপ্রথম লিখিত গবেষণাপত্র ছিল এটি।

1907 সালে তিনি আবিষ্কার করেন, 'সমভাবে ত্বরান্বিত যান্ত্রিক তন্ত্রসমূহের তুল্যতার নীতি' [The Principle of Equivalence for Unifomly Accelerated Mechanical System]। এর থেকেই তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, বিশাল ভরের বস্তুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আলোর গতিপথ বেঁকে যায়। 1909 সালে আইনস্টাইন জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রী [Honoris Causa] গ্রহণ করেন। পরবর্তী বছরগুলিতে এই সম্মানীয় ডিগ্রী তিনি লাভ করেন—Zürich, Rostok, Madrid, Brussels, Buenos Aires, Sorborne, London, Oxford, Cembridge Glasgo, Leeds, Manchester, Harvard, Princeton, New York State at Albany and Yeshiva থেকে। 1910 সালের জুলাই মাসে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়। 1912-1913 সালে গ্রসম্যানের সঙ্গে আইনস্টাইন একত্রিতভাবে সাধারণ আপেক্ষিকতার কাজ করেন। মহাকর্ষ বর্ণিত হয় মেট্রিক টেনসর [Metric Tensor] দিয়ে। 1913 সালে তিনি প্রুশীয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের অধীনে অধ্যাপনার পদ গ্রহণ করেন। তিনি মিলেভা ও বাচ্চাদের নিয়ে চলে আসেন বার্লিনে। তবে এর কিছুদিন পরেই মিলেভা দুই পুত্রকে নিয়ে চলে যান জুরিখে। বিচ্ছেদের সেই শুরু।

1915 সালে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদের উপর ছয়টি বক্তৃতা দেন। ওই বছরই তিনি বুধ গ্রহের অনুসূরের [Perihelion] অয়ন-চলনের [Precession] মান পেলেন 575 সেকেন্ড। তিনি আরও পেলেন, সূর্যের মহাকর্ষের ক্ষেত্রে আলোর বক্রতার যে মানের কথা তিনি 1911 সালে বলেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে সে মান হবে তার দ্বিগুণ। 1916 সালের 20 শে মার্চ সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের প্রথম সুসংবদ্ধ স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

1919 খ্রিস্টাব্দ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। আইনস্টাইন যে দাবী করেছিলেন, সূর্যের পাশ দিয়ে আসার সময় সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের জন্য এবং আলোক-কণা ভরবিশিষ্ট হওয়ায় 1·74 সেকেন্ড [Seconds of an arc] বেঁকে যাবে আলোর গতিপথ এবং তা সূর্যের দিকেই বাঁকবে, সেই দাবীর যাথার্থ্য যাচাই করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন বৃটিশ পদার্থ বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিদ স্যার আর্থার এডিংটন [Sir Arthur Eddington]। 1918 সালের নভেম্বরে যুদ্ধ শেষ হলে দ্রুত প্রস্তুতি নিলেন এডিংটন 1919 সালের মে মাসের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণকে এব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে লাগাবার। 1914 সালে যে কাজ করতে গিয়ে জার্মান বিজ্ঞানীরা রাশিয়াতে যুদ্ধ বন্দী হয়েছিলেন, সেই কাজই কবতে মনস্থ করলেন এডিংটন। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে জার্মানরা পরাজয় স্বীকার করল। সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানী ছেড়ে হল্যান্ড পালিয়ে গেলেন। ফলে, জার্মানীতে তখন এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার মত অবস্থা ছিল না। এডিংটন 1917 সাল থেকেই এমন একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ভাবছিলেন। যুদ্ধ শেষ হতেই তিনি মনস্থির করে ফেললেন। ঠিক হল 1919 সালে মে মাসের সূর্যগ্রহণকেই তাঁরা কাজে লাগাবেন।

1919 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানীদের দুটি দল দু'দিকে গেলেন। এডিংটনের নেতৃত্বে প্রথম দলটি গেলেন গিনি উপসাগরের প্রিনসিপি দ্বীপে। অন্য দলটি গেলেন ব্রাজিলের সোব্রাল গ্রামে। 29 শে হল পূর্গ্রাস সূর্যগ্রহণ। বিজ্ঞানীরা তৎপর হলেন তারার আলোর ছবি নিতে। প্রিনসিপি দ্বীপে গ্রহণের প্রথম দিকে খুব মেঘ করেছিল। এডিংটন খুবই নিরাশ হয়েছিলেন। পরে গ্রহণের শেষের দিকে মেঘ কেটে যায় এবং ফটো তুলতে এডিংটনের কোন অসুবিধা হয় নি। ব্রাজিল যাওয়া দলটি অবশ্য কোনও অসুবিধায় পড়ে নি। দুই দলই ফিরে এলেন লন্ডনে। সূর্যগ্রহণের সময় যে নির্দিষ্ট তারকাপুঞ্জের ছবি নেওয়া হয়েছিল, কয়েকমাস বাদে সূর্য যখন তার আগের অবস্থান থেকে অনেকটা দূরে চলে গেল, তখন ওই তারকাপুঞ্জের আলোর ছবি আবার নেওয়া হল। এবার তারকাপুঞ্জের আলো সূর্যের অনেক দূর দিয়েই পৃথিবীতে এল, যদিও গ্রহণের দিন ওই তারকপুঞ্জের আলো আসছিল সূর্যের একেবারে পাশ দিয়ে। এডিংটন ফোটোগুলি বেশ কিছুদিন ধরে গভীর মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। আইনস্টাইনের মতবাদ সত্যি কি না তা জানার জন্য পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহল তাকিয়ে রইলেন এডিংটনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের দিকে। সেপ্টেম্বর মাসে এডিংটন একবার এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল নিয়ে তাঁর ধারণার কথা বলেছিলেন বিজ্ঞানী লোরেঞ্জকে। ওই বছর 22 শে সেপ্টেম্বর লোরেঞ্জ আইনস্টাইনকে টেলিগ্রাম করে জানালেন,

প্রাথমিক বিশ্লেষণে আলোর ওই বক্রতা বেরিয়েছে নিউটনীয় মানে 0·86 সেকেন্ড এবং আইনস্টাইনীয় মানে 1·73 সেকেন্ড। 1919 সালের 6ই নভেম্বর রয়াল সোসাইটি এবং রয়াল অ্যাসট্রোনমিক্যাল সোসাইটির এক যৌথ সভা হল লন্ডনে। সেখানে বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানীর উপস্থিতিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডিংটন ঘোষণা করলেন তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল। বিজ্ঞানীদের এই সভায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে এডিংটন জানালেন, আইনস্টাইন যা বলেছেন তা সম্পূর্ণভাবে সত্য। আলোকরশ্মি সূর্যের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার গতিপথ সত্যি সত্যিই 1·74 সেকেন্ড বেঁকে যায়, যা আইনস্টাইনের তত্ত্বমত অঙ্ক কষে বের করা মানের সঙ্গে একেবারে এক।

7ই নভেম্বর, 1919 খ্রিস্টাব্দ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের প্রথম বার্ষিক দিবসের 'লন্ডন টাইমস' বড় বড় হরফের হেডিং দিয়ে লিখলো ঃ "Revolution in Science : Newtonian Principles Overthrown"। 10ই নভেম্বর নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার শিরোনাম ছিল ঃ "মহাকাশে সব আলো বেঁকে যায়। আইনস্টাইন তত্ত্বের বিজয়"। সংবাদপত্রের এই ধরনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় জনসাধারণের কাছে আইনস্টাইন বিশ্ববন্দিত হয়ে উঠছেন। আইনস্টাইন কিন্তু এডিংটনের এই ফলাফল সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত ছিলেন। তিনি জানতেন তাঁর তত্ত্ব সত্য হবেই। সেপ্টেম্বরে লোরেঞ্জের টেলিগ্রাম পাওয়ার পর আইনস্টাইন তাঁর মাকে একটি পোস্টকার্ডে লিখেছিলেন, "আজকে একটি সুখবর পাওয়া গেছে। লোরেঞ্জ টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন যে, একটি ইংরেজ অভিযাত্রীদল প্রমাণ করতে পেরেছে যে, আলোর রশ্মি সূর্যের পাশ দিয়ে যাবার সময় বেঁকে যায়।" আইনস্টাইন তাঁর মাকে খুশি করতে চেয়েছিলেন বলেই এই চিঠি লেখা। আইনস্টাইন কিন্তু চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন তাঁর মতবাদ সত্য হবেই। তিনি নিশ্চিত জানতেন, তাঁর মহাকর্ষীয় তত্ত্ব প্রাকৃতিক সত্য এবং অকাট্য।

1919 সালে 14ই ফেব্রুয়ারী আইনস্টাইন ও মিলেভার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। 29শে মে একটি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সুযোগ করে দেয় আলোর বক্রতা পরিমাপের। 2রা জুন আইনস্টাইন এলসা আইনস্টাইন লোয়েনথালকে বিয়ে করেন। এলসার দুই কন্যা ইল্‌সে [Ilse] (জন্ম 1897) এবং মারগট [Margot] [জন্ম 1899] আইনস্টাইনের কাছেই থাকেন।

1920 সাল থেকেই আইনস্টাইনকে ইহুদি বলেই জার্মানীতে অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। হিটলারের জমানায় আইনস্টাইনের জীবননাশের চেষ্টা করা হয় আরও কিছুটা পরে। 1921 সালের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় আইনস্টাইনকে। এই পুরস্কারের ঘোষণা করা হয় 1922 সালের 9ই নভেম্বর। আইনস্টাইন ও এলসা তখন জাপানের পথে। 17ই নভেম্বর থেকে 29 শে ডিসেম্বর তিনি সস্ত্রীক জাপান ভ্রমণ করেন। 1922 সালের 10ই ডিসেম্বর নোবেল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আইনস্টাইনের প্রতিনিধিত্ব করেন জার্মান কূটনীতিবিদ Rudolf & Nadolny। আইনস্টাইনের পুরস্কারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, 'অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে পদার্থবিদ্যার পরিষেবার জন্য, বিশেষ করে 'ফোটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট' আবিষ্কার করার জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হল।'

1924 সালে তাঁর বিশেষ আবিষ্কার হল 'বোস-আইনস্টাইন ঘনীভবন' [Bose-Einstein Condensation]। 1925 সালে আইনস্টাইন পান কপ্‌লে [Copley] মেডেল। 1926 সালে তিনি পান রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির স্বর্ণপদক। 1929 সালে পান প্ল্যাঙ্ক পদক [Planck Medal]। 1932 সালের 10ই ডিসেম্বর আইনস্টাইন সস্ত্রীক জার্মানী ত্যাগ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁদের এই যাত্রা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ হিসাবে জার্মান ফ্যাসিস্টদের কাছে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু আইনস্টাইন আর জার্মানীতে ফিরে আসতে পারেন নি।

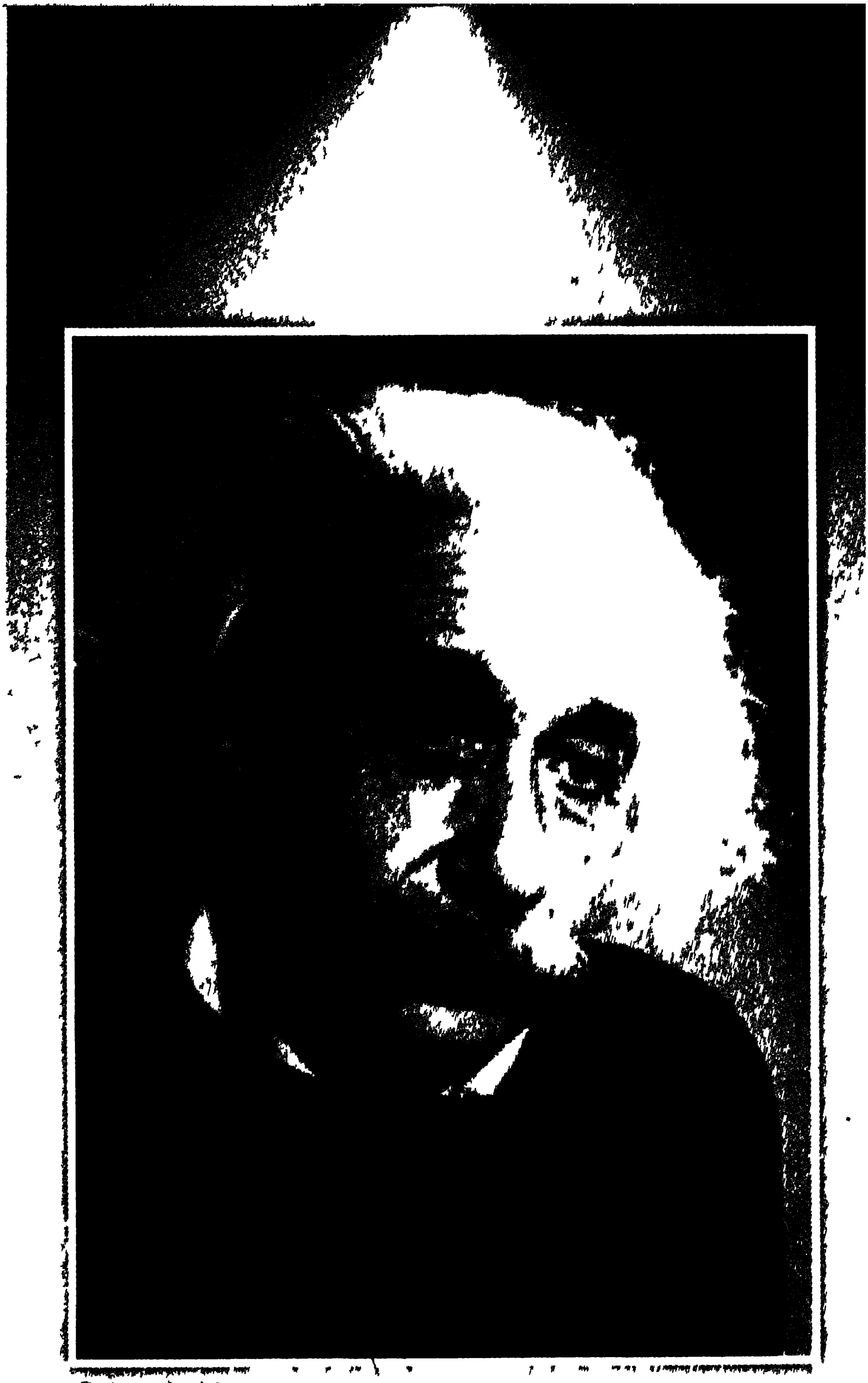
1933 সালের জানুয়ারী মাসে জার্মানীতে নাৎসী দল ক্ষমতা দখল করে। আইনস্টাইনের অনুপস্থিতিতে কাপুত-এ তাঁর গ্রীষ্মবাসে নাৎসীরা হামলা চালায়। তাদের অজুহাত ছিল আইনস্টাইনের বাড়ীতে কমিউনিস্ট পার্টির অস্ত্র-শস্ত্র লুকানো আছে। আমেরিকা থেকে ইউরোপে ফিরে এসে আইনস্টাইন শুনলেন তাঁকে হত্যার জন্য 5000 সুইশ ফ্রাঁ পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। আইনস্টাইন ওই বছর 28 শে মার্চ প্রুশীয়ান অ্যাকডেমিতে পাঠিয়ে দেন তাঁর পদত্যাগ পত্র। বেলজিয়ামের রাণী এই সময় তাঁকে বেলজিয়ামে রেখে তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা করেন। বেলজিয়ামের সমুদ্রতীরে একটি ভিলাতে তিনি সস্ত্রীক বসবাস করতে থাকেন এবং বেলজিয়ামের রক্ষীরা তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেন। পরে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন ইলসে, মারগট, হেলেন ডুকাস এবং আইনস্টাইনের সহযোগী Walther Mayer। আইনস্টাইনের বার্লিনের কিছু কাগজপত্র রক্ষা পেয়েছিল এবং এগুলি রক্ষা পেয়েছিল রুডলফ কাইজারের সাহায্যে। ফরাসী কূটনৈতিক পাউচে-এ সেগুলি আনা হয়। এপ্রিল মাসে আইনস্টাইন ব্যাভারিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স থেকে পদত্যাগ করেন।

1933 সালের 9ই সেপ্টেম্বর তিনি চিরকালের জন্য ইউরোপ মহাদেশ ছেড়ে চলে যান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। 1940 সালে তিনি পাকাপাকিভাবে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের নাগরিক হন। 1933 সালের 17ই অক্টোবর থেকেই আইনস্টাইন প্রিন্সটনে বসবাস শুরু করেন। আইনস্টাইন প্রথমে একটা অস্থায়ী বাড়িতে থাকতেন। পরে তাঁর জন্য 112 নং মারসার স্ট্রিটে [Mercer Street] নতুন বাড়ি তৈরি হয়। সেখনেই তিনি সারা জীবন সপরিবারে বাস করতে থাকেন। মৃত্যুদিন অবধি তিনি এই বাড়িতেই ছিলেন। এখানেই 1936 সলে এলসা মারা যান। 1939 সালে তিনি বিজ্ঞানীদের প্রবল অনুরোধে প্রেসিডেন্ট এফ. ডি. রুজভেল্টকে সেই ঐতিহাসিক চিঠিটি লেখেন, যেখানে তিনি পারমাণবিক শক্তির সামরিক সম্ভাবনার বিষয়টির প্রতি রুজভেল্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই চিঠি থেকেই জন্ম নেয় 'ম্যানহাটান পরিকল্পনা' এবং পারমাণবিক বোমা।

1948 সালে জুরিখে মিলেভার মৃত্যু হয়। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে ধরা পড়ে যে, আইনস্টাইনের পেটে মহাধমনীর স্ফীতি হয়েছে। 1952 সালে তিনি ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ পান। কিন্তু তিনি সে পদ গ্রহণে তাঁর অক্ষমতার কথা জানান। 1954 সালের 14ই এপ্রিল, জে আর ওপেনহাইমারের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকার যে অভিযোগ আনেন তার বিরুদ্ধে এবং ওপেনহাইমারের সমর্থনে তিনি সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। প্রিন্সটনে



যৌবনে আইনস্টাইন [1879-1955]



প্রিন্সটনে আইনস্টাইন [1879-1955]

তাঁর সঙ্গে শেষবারের মত বিখ্যাত পদার্থ´বজ্ঞানী নীল্স্ বোরের সাক্ষাৎ হয়। আইনস্টাইনের হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হয়। 1955 সালের 11 ই এপ্রিল আইনস্টাইন তাঁর স্বাক্ষরিত শেষ পত্রটি লেখেন। এটি তিনি লিখেছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেলকে। এতে তিনি পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য একটি ইস্তাহারে স্বাক্ষর করতে সম্মত হন এবং ওই একই সপ্তাহে তিনি তাঁর অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে সংযোজন করে লেখেন—'সর্বত্র জাগ্রত রাজনৈতিক লালসা দাবি করছে তাদের বলির সমাগ্রী।'

1955 সালের 13 ই এপ্রিল তাঁর পেটের মধ্যের একটি মহাধমনীর বিদারণ ঘটে। তিনি মারা যান 1955 সালের 18 ই এপ্রিল রাত্রি 1 টা 15 মিনিটে। ওই দিন বিকাল চারটার সময় টেনট্রনে তাঁর শেষকৃত্য (দাহ্) সম্পন্ন হয়। তাঁর চিতাভস্ম ছড়িয়ে দেওয়া হয় অজানা জায়গায়।

আইনস্টাইন সারাজীবন মনেপ্রাণে শান্তিবাদী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীকে তিনি খুব ভালোবাসতেন এবং তাঁর মতবাদ মনেপ্রাণে বিশ্বস করতেন। যুদ্ধের ভীতি ও যুদ্ধকে একেবারে লোপ করে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠাই তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল। তিনি বলেছেন, "এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক মহামানব গান্ধী আমাদের পথ দেখিয়েছেন। তিনিই প্রমাণ করেছেন যে, পথের সন্ধান পেলে মানুষ কি মহান ত্যাগ করতে পারে। আপাততঃ দৃষ্টিতে অজেয় জড় শক্তির চেয়ে অদম্য বিশ্বাসে প্রবুদ্ধ মানুষের ইচ্ছা যে মহত্তর, ভারতের মুক্তির জন্য গান্ধীর প্রচেষ্টা তার জীবন্ত স্বাক্ষর।" পাঠকক্ষের দেওয়ালে আইনস্টাইন তিনজন মনীষীর ফটো রেখেছিলেন, যাঁদের তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। এই তিনজন হলেন মাক্সওয়েল, ফ্যারাডে এবং গান্ধীজি। গান্ধীজি মানবতার দিক দিয়ে তাঁর আদর্শ স্বরূপ ছিলেন।

তাঁর রাজনৈতিক মহামানব সম্বন্ধে 1939 সালে তিনি লিখেছিলেন ঃ

"A leader of his people, unsupported by any outward authority : a politician whose success rests not upon craft nor the mastery of tenchical devices, but simply on the convincing power of his personality ; a victorious fighter who has always scorned the use of force; a man of wisdom and humility, armed with resolve and inflesxible consistency, who has devoted all his strength to the uplifting of his people and the betterment of their lot; a man who has confronted the betterement of their lot; a man who has confronted the brutality of Europe with the dignity of the simple human being, and thus at all times risen superior.

Generations to come, it may be, will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth." আমরা বুদ্ধদেব সম্পর্কে যেমন বলি, আইনস্টাইন গান্ধীজির সম্বন্ধে সে রকম কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এটা বিশ্বাস করা কষ্টকর হবে যে, গান্ধীজির মত একজন রক্তমাংসের মানুষ এই পৃথিবীতে একদিন হেঁটে-চলে বেড়িয়েছেন।

1939 সালের 2রা অক্টোবর গান্ধীজির সপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আইনস্টাইন তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে উপরোক্ত কথাগুলি লিখেছিলেন প্রিন্সটন থেকে। এর বাংলা তর্জমা এই রকম ঃ "তিনি তাঁর জাতির নেতা, এর জন্য বাইরের কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় নি; একজন রাজনীতিবিদ, যাঁর সাফল্য কোন কৌশল কিংবা কোন প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে নি, করেছে শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিত্বের শক্তি উপলব্ধি করানোতে; একজন বিজয়ী যোদ্ধা, যিনি বলপ্রয়োগকে সব সময়েই ঘৃণা করেছেন; এমন মানুষ, যাঁর জ্ঞান ও নম্রতার সঙ্গে ছিল স্থির সঙ্কল্প ও অনমনীয় দৃঢ়তা, যিনি তাঁর জাতির জনগণের উন্নতি ও তাদের মঙ্গলসাধন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন, এমন একজন মানুষ যিনি ইউরোপের বর্বরতার সম্মুখীন হয়েছেন সাধারণ মানুষের আত্মসম্মানবোধ নিয়ে, যার ফলে সব সময়েই শ্রেষ্ঠতর বলে প্রমাণিত হয়েছেন।

"ভবিষ্যৎ কালের বংশধরদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হবে যে, রক্তমাংসের দেহে এইরূপ একজন মানুষ সত্যি সত্যিই এককালে এই পৃথিবীর মাটিতে চলাফেরা করেছেন।"

আমেরিকার ধর্মযাজকরা তাঁকে লিখেছিলেন "আপনি কি ঈশ্বরে ও ধর্মে বিশ্বাস করেন?" উত্তরে তিনি লিখলেন, "বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের রূপ ও গুণধারী এবং আমাদের প্রার্থনা শুনতে পান কিংবা আমাদের ক্ষতি করতে পারেন এ রকম ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি না, এবং তথাকথিত প্রচলিত ধর্মেও আমার বিশ্বাস নেই। স্পিনোজার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর।" ঈশ্বর বলতে তিনি সব সময়েই মনে করেছেন প্রকৃতির ঘটনার বাস্তব-সত্যতা যে সত্যতা হল সুষ্ঠু সামঞ্জস্য পূর্ণতার ও অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্যের ঈশ্বর ধারণার সঙ্গে তাঁর ঈশ্বর ধারণার অদ্ভুত মিল। কারণ, স্পিনোজার ঈশ্বর ধারণা গড়ে উঠেছিল রামানুজের ওই মতবাদ থেকেই। আর ধর্ম সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বিজ্ঞানের প্রকৃত সেবকই হচ্ছেন সবচেয়ে বড় ধার্মিক, কারণ বিশ্ব-রহস্যে অভিভূত হওয়া থেকেই আসে ধর্মের অভিজ্ঞতা এবং এটি হল বৈজ্ঞানিক গবেষণার সবচেয়ে বড় প্রেরণা।"

তিনি আরও লিখেছেন, "বিজ্ঞান ও ধর্মের ভিতরে যে অসঙ্গতি বা সংঘাত প্রচলিত আছে তার প্রধান কারণ হল বিশ্বে যে অসীম শক্তি বিদ্যমান, যা কেউ অস্বীকার করবে না, তাকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা। ধর্মীয় নেতারা বা ধর্মযাজকরা যে বিজ্ঞানসেবীদের প্রতি অত্যাচার করেছেন ও সর্বদাই তাদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন, তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।" তাঁর মতে, "মানুষের নৈতিক ব্যবহারের সার্থক ভিত্তি হওয়া উচিৎ অপরের প্রতি সহানুভূতি, শিক্ষা, সামাজিক বন্ধন ও সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ; কোন ধর্মের ভিত্তির প্রয়োজন নেই। মানুষকে যদি ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে মৃত্যুর পরে শাস্তির ভয় দেখিয়ে এবং পুরস্কারের লোভ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, তবে মানুষ সত্যই দুর্ভাগা।"

তাঁর নিজের ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, আইনস্টাইন প্রায়শই বলতেন,

'স্পিনোজার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর'। মাঝে মাঝে বলতেন 'ঈশ্বর পাশা খেলেন না' বা 'ঈশ্বর এটি করতে পারেন না'। এই ঈশ্বর বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন প্রকৃতির ঘটনার বাস্তব সত্যতা, যে সত্যতা হল সুষ্ঠু সামঞ্জস্য পূর্ণতার ও অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ। আইনস্টাইনের ঈশ্বর ধারণা নিয়ে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ আছে। তিনি নিজের বহু বক্তৃতায় বা লেখায় তা সহজ করেই বুঝিয়ে বলেছেন। এই যুক্তিবাদী মহান বৈজ্ঞানিকের ঈশ্বর সম্পর্কীয় ধারণা তাঁর নিজের লেখা নিম্নলিখিত নিবন্ধাংশটুকু পড়লেই যথেষ্ট পরিষ্কার ও সহজবোধ্য হবে। এই বক্তব্য আমাদের উপনিষদের 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' শ্লোকটাই মনে করিয়ে দেয়। তিনি তাঁর ঈশ্বর ধারণা সম্পর্কে বললেন,

"বিশ্ব চরাচরে প্রাণ-অপ্রাণ সকলের কাছে যিনি স্ব-প্রকাশ আমি সেই ঈশ্বরকে মানি। আমি বিশ্বাস করি প্রকৃতি কখনও জুয়া খেলে না। আমি বেশ অনুভব করতে পারি, এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূলে আছে অজ্ঞেয়, অলৌকিক ও চিরভাস্বর এক বিস্ময়কর প্রতিভার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ। এ পার্থিব জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যবোধ ও মহত্তর অনুভূতিসমূহ সেই অতীন্দ্রিয় জগতের স্পর্শ পায় না। জাগতিক স্থূল-বুদ্ধি-বৃত্তি, তীব্রবাস্তবতানিয়ন্ত্রিত ও দৈহিক সীমানায় আবদ্ধ আমাদের ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি ও জ্ঞান সেই সুদূর-প্রসারী কল্পনা, সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টি ও উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বিজ্ঞানী মহাজাগতিক সেই অপার অস্তিত্বকে স্বীকার করতে সংকোচ বোধ করেন—পাছে লোকে ভাবে এ তাঁর মোহ। অথচ এই অজ্ঞেয় সত্যের অনুসন্ধানই তো শত সহস্র রহস্যের আবরণ উন্মোচন ক'রে প্রকৃতি বিজ্ঞানের পথ রচনা করতে পারে।

"এই মহাজাগতিক অতীন্দ্রিয় চেতনা আমাকে বিজ্ঞান-সাধনা ও সত্যানুসন্ধানে নিত্য-প্রবর্তনা জুগিয়েছে। অসীম রূপ-রহস্যে ভরা দুর্জ্ঞেয় শক্তির আধার স্বরূপ যে বিশ্বনিয়ন্তার সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মশৃঙ্খলা বিশ্ব চরাচরে নিত্য পরিব্যাপ্ত—আমি সে রহস্যের অনুভূতি লাভ করেছি অসীম কৃতজ্ঞতা ও বিস্ময়কর তৃপ্তিবোধ নিয়ে। এই অমূর্তের অনুসন্ধানই রচনা করেছে আমার ধর্মবোধ, আমার ঈশ্বর।................

"আমাদের জাগতিক উপলব্ধি স্থূল ইন্দ্রিয় নির্ভর বলেই তা যেন পরম সত্যের সঙ্গে আমাদের এক হাতাশা-ব্যঞ্জক ব্যবধান রচনা করেছে। প্রকৃত সত্য তাই এতো দূরে।

...........এক সুললিত সংগীতের সুসমঞ্জস ছন্দের মতোই এ মহাবিশ্ব এক সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলায় সদা ছন্দিত। বার্কলে, দেকার্তে ও স্পিনোজা মহা-প্রকৃতির কর্মমুখর এই ছন্দের নাম দিয়েছেন ঈশ্বর।"

স্পিনোজা [Spinoza - 1632-1677] বলেছেন, "কোন একটি চলন্ত বা স্থির বস্তুকে ওই অবস্থায় আনতে হলে দরকার হবে অপর একটি বস্তুর, আবার এই দ্বিতীয় বস্তুটির গতির বা স্থিতাবস্থার জন্য দরকার হবে অপর একটি বস্তুর, আবার এই দ্বিতীয় বস্তুটির গতির বা স্থিতাবস্থার জন্য দরকার হবে তৃতীয় একটি বস্তুর এবং এভাবে চলবে সংখ্যাতীত বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।" তিনি বিশ্বাস করতেন, "যে সমস্ত কারণকে বস্তুগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়ার হেতু বলে খাপ খাওয়ানো যায় না, সেগুলিকে বিশ্ব-সংক্রান্ত কার্য-কারণ সম্বন্ধ

থেকে বাদ দিতে হবে।" স্পিনোজা ছিলেন কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্বাসী। আইনস্টাইনও তাঁর সারা জীবন কার্যকারণ সম্পর্কের থেকে কখনও বাইরে যান নি। কণাবাদের বা কোয়ান্টাম তত্ত্বের সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা তিনি সারা জীবন মেনে নিতে পারেন নি। চেষ্টা করেছেন অক্লান্তভাবে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব আবিষ্কার করে কার্যকারণ সম্পর্ক নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রমাণিত হলে কণাজগতেও কার্য-কারণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। মনে রাখতে হবে, স্পিনোজার ঈশ্বর, আইনস্টাইনের ঈশ্বর এবং ভারতীয় দার্শনিক রামানুজের ঈশ্বর মূলতঃ এক।

আইনস্টাইন বিজ্ঞানের যেখানেই হাত দিয়েছেন সেখানেই সোনা ফলিয়েছেন। বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান অনবদ্য। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সেরা আবিষ্কারগুলির সময় তিনি কোনও গবেষণাগার কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন অনন্য। যে কোনও অবস্থায় তিনি থাকুন না কেন, অনায়াসে চেতনা-নিরপেক্ষ জগতের চিন্তায় তন্ময় হয়ে যেতে পারতেন। তাঁর মস্তিষ্কই ছিল এক বিশাল গবেষণাগার। তাই বার্নের পেটেন্ট অফিসে, গবেষণাগার কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা আইনস্টাইনের পক্ষে বিজ্ঞান চিন্তায় মনোনিবেশ করা অনেক বেশি সহজ হয়েছিল। জীবনের শেষের দিকে তিনি বলতেন, বার্নের কাজ তাঁর কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়েছিল।

আইনস্টাইন যে কেবল তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে যুগান্তকারী সব আবিষ্কার করেছিলেন তা নয়। প্রযুক্তি-বিদ্যাতেও তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। বার্নে তাঁর এক বন্ধুর ভাই ছিল পল হাবিশ্‌ট [Paul Habicht]। হাবিশ্‌টের বার্নে একটা কারখানা ছিল বৈদ্যুতিক পরিমাপ যন্ত্রের [Measuring Instruments]। 1908 সালে আইনস্টাইন হাবিশ্‌টের সহযোগে অতি ক্ষুদ্র মানের বৈদ্যুতিক বিভব [Electrical Potential] পরিমাপ করার যন্ত্র তৈরি করলেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে 0.0005 ভোল্ট বৈদ্যুতিক বিভব মাপা সম্ভব হল। এত ক্ষুদ্র মানের বিভব মাপার যন্ত্র সেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এরই কিছুটা পরে 1910 খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা দু'জনে 'আইনস্টাইন-হাবিশ্‌ট বিভব বর্ধনকারী' যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন। কয়েকটি এমন ধরনের যন্ত্রের প্রস্তুত প্রণালী আইনস্টাইন উদ্ভাবন করেছিলেন পরবর্তীকালে।

তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে যে সব অনন্য আবিষ্কারের জন্য আইনস্টাইন অমর হয়ে আছেন, সেগুলির কথা একটু বলে নেওয়া যাক। এগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ ক) ব্রাউনীয় বিচলন [Brownian Movement]; খ) আলোকবৈদ্যুৎ ক্রিয়া [Photo-electiric Effect]; গ) বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ [Special Theory of Relativity] ঘ) কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ [Specific Heat of Solids], ঙ) সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ [General Theory of Relativity]; চ) উদ্দীপিত বিকিরণ তত্ত্ব [Theory of Stimulated Emission]; ছ) বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন [Bose-Einstein Statistics]; জ) একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব [Unified Field Theory]; এবং ঝ) কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান [Quartum Mechanics]। এগুলির প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আসা যাক।

ব্রাউনীয় বিচলন

1827 খ্রিস্টাব্দ। রবার্ট ব্রাউন [Robert Brown] নামে এক উদ্ভিদবিজ্ঞানী জলের মধ্যে রাখা পরাগরেণু নিয়ে গবেষণা করছিলেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরাগরেণুগুলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় দেখলেন এগুলি একরকম বিশৃঙ্খল এবং সূক্ষ্মগতিতে নড়াচড়া করছে। তিনি প্রথমে ভাবলেন, এই নড়াচড়া হয়ত পরাগরেণুর বিশেষ গুণ। কিন্তু তিনি রজন [Gambose] এবং অন্যান্য কয়েকটি পদার্থের ক্ষুদ্র কণিকা নিয়ে পরীক্ষা করেও একই ধরনের ফল দেখতে পেলেন। তিনি এর কারণ বুঝতে পারেলন না। কিন্তু কণাগুলির এই নড়াচড়ার বিশদ বিবরণ তিনি প্রকাশ করলেন। এই বিজ্ঞানীর নাম অনুসারে কণাগুলির এই নড়াচড়ার ঘটনার নাম হল 'ব্রাউনীয় বিচলন' [Brownian Movement]। অনেক বিজ্ঞানী কৌতূহলী হয়ে ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখতে পেলেন ঃ

পরাগরেণুগুলির বিচলন সম্পূর্ণ অনিয়মিত ও দিকশূন্য, একই জায়গায় পাশাপাশি অবস্থিত রেণুগুলির নড়াচড়া বিভিন্ন, কোনটির সঙ্গে কোনটির মিল নেই, যার থেকে বোঝা যায় যে, জলের কোন রকম গতির সঙ্গে এই নড়াচড়া বা বিচলনের কোন যোগাযোগ নেই, যে পাত্রে জল আছে সেই পাত্রে ঝাঁকুনির উপরও এই বিচলন নির্ভরশীল নয়; রেণু বা কণা যতই ক্ষুদ্র হবে নড়াচড়ার মাত্রাও তত বেড়ে যাবে, এই বিচলন নিরন্তর এবং চিরকাল চলতে পারে। 1877 সালে ডেলসক্স [Delsaux] এই বিচলনের ব্যাখ্যায় বললেন যে, কণাগুলির বিচলন ওই তরল পদার্থের অণুগুলির বিশৃঙ্খল বিচলনের ইঙ্গিত দেয়। আইনস্টাইন 1905 খ্রিস্টাব্দে এই ব্যপারটির একটা পূর্ণ গাণিতিক তত্ত্ব দেন এবং তাপগতিবিদ্যার তত্ত্ব [Thermodynamics] দিয়ে এই ঘটনার বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

আইনস্টাইন 'ব্রাউনীয় বিচলন'-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, "জলের অণুগুলির এলোমেলোভাবে বিচলন পরাগরেণুগুলির অবিরাম নড়াচড়ার কারণ। কোন একটি রেণু তার চারপাশের জলের অণুগুলির বিচলনের জন্য অনবরত ধাক্কা খাচ্ছে। অণুগুলির বিচলন এলোমেলো ও বিশৃঙ্খল হবার জন্য পরাগরেণুটির চারপাশে অসমান ধাক্কা হচ্ছে এবং সেইজন্যই রেণুটি নড়াচড়া করছে। রেণুটির আয়তনের উপর এই অসমতা নির্ভরশীল। রেণুটি যত বড় হবে, তাকে পরিবেষ্টন করা জলের অণুসংখ্যা ততই বেশি হবে। সম্ভাব্যতা [Probablity] অনুযায়ী অণুগুলির নড়াচড়ায় একটি মধ্যক সমবগে [Mean Uniform Velocity] আসবে এবং রেণুটির উপর চারপাশের ধাক্কার সমতা বড়াবে বলে তার নড়াচড়াও কম হবে। কিন্তু রেণুটি যত ছোট হবে, চারপাশের পরিবেষ্টনকারী অণুর সংখ্যাও কম হবে। ফলে, এলোমেলো ও বিশৃঙ্খলভাব বেশি হবে এবং রেণুটির উপর চারপাশের ধাক্কার অসমতা বেড়ে যাবে বলে বিচলনও বেশি হবে।"

আইনস্টাইন ব্রাউনীয় বিচলনের গাণিতিক সূত্রও বের করেন। 1906 সালে বিজ্ঞানী স্মোলিউকৌস্কি [Smoluchowski] প্রায় একই রকমভাবে তাপগতিবিদ্যা ও সম্ভাব্যতা প্রয়োগ করে এ সম্পর্কে একই সূত্র বের করলেন। ব্রাউনীয় বিচলনের এই সূত্র তাই 'আইনস্টাইন-স্মোলিউকৌস্কি সমীকরণ' [Einstein-Smoluchowski Eqation] নামে বিজ্ঞানীদের কাছে

পরিচিত। যদিও আইনস্টাইনই সর্বপ্রথম সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ব্রাউনীয় বিচলনের এবং তার গাণিতিক রূপের প্রথম স্রষ্টাও তিনি, তবু স্মোলিউকৌস্কি এসে গেছেন এই সমীকরণের নামকরণে একই সময়ে ওই বিষয়ে কাজ করার সুবাদে। এই সমীকরণটি আইনস্টাইন যে ভাবে রূপ দিয়েছিলেন, তা হল ঃ

$$\Delta^2 = \frac{RT}{N_A} \cdot \frac{1}{3\pi\eta r} \cdot t$$

যেখানে, Δ = নির্দিষ্ট সময়ে সরণ [Displacement],
t = নির্দিষ্ট সময়,
R = নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যবর্তী স্তর অতিক্রমকারী কণার সংখ্যা,
N_A = অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা [Avogadro Number],
η = কণাটি যে তরলে তার সান্দ্রতা [Viscosity],
r = কণাটির ব্যাসার্ধ,
T = তরলের তাপমাত্রা [Absolute Temperature]

আইনস্টাইনের এই সমীকরণের সত্যতা প্রমাণ করলেন ফরাসী বিজ্ঞানী পেরঁ্যা [Perrin] 1909 খ্রীস্টাব্দে। এই সমীকরণ বললো যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোনও ব্রাউনীয় কণার বিচলন বা সরণের বর্গ [Square] ওই সময়ের সঙ্গে সমানুপাতিক। পেরঁ্যা বিচলন বা সরণের সঙ্গে তরলের তাপমাত্রা, সান্দ্রতা এবং কণার ব্যাসার্ধের সম্পর্কসমূহ মিলিয়ে দেখলেন। সেগুলি অদ্ভুতভাবে মিলে গেল ওই সমীকরণের সঙ্গে। তিনি দেখলেন সরণ বা বিচলন নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত; কণাটির ব্যাসার্ধের সঙ্গেও বিচলনের সম্পর্ক আছে, অথচ কণাটির ভরের সঙ্গে সরণ বা বিচলনের কোন সম্পর্ক নেই। এই সমীকরণ থেকে পেরঁ্যা অ্যাভোগাড্রো নম্বর [Avogadro Number] বের করলেন 6×10^{23}, যা বর্তমানের গৃহীত মান 6.022045×10^{23}-এর খুবই কাছাকাছি এলো। পেরঁ্যা ঘোষণা করলেন, ব্রাউনীয় বিচলনের ওপর আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত এই সমীকরণটি পরীক্ষাগারে অতুলনীয়ভাবে সত্য।

আলোকবৈদ্যুৎ ক্রিয়া

আলোর স্বরূপ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বাদানুবাদ বহুকালের। সপ্তদশ শতাব্দীতে নিউটন বললেন, আলো সূক্ষ্মতর আণুবীক্ষণিক [Microscopic] বস্তু কণিকার [Corpuscles] সমষ্টি। আলোর উৎস [Source] থেকে বহুসংখ্যক আলোর কণা আমাদের চোখে এসে পড়লে আমরা দেখতে পাই। এইসব কণা শূন্যস্থান দিয়ে [Empty Space] দিয়ে সরলরেখায় চলে। এগুলি আমাদের চোখে এসে পড়লে তবেই উৎসের রূপ আমাদের চোখে প্রতিভাত হয়। নিউটন তাঁর এই কণা-তত্ত্ব [Corpuscular Theory] দিয়ে আলোর প্রতিফলন [Reflection] এবং প্রতিসরণ [Refraction] এই দুই ঘটনার ব্যাখ্যা করেন। আলোর বিভিন্ন রঙের ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, সাদা আলোর ভিতরে সব রঙ আছে। বিভিন্ন রঙের কণিকার সমষ্টিগত

ফল হল সাদা আলো। এই সাদা আলো একটি প্রিজমের [Prism] ভিতর দিয়ে গেলে বিভিন্ন রংয়ের কণিকা আলাদা হয়ে যায়।

নিউটনের সমকালীন বিজ্ঞানী হুইগেন্স [Huygens] 1678 সালে বললেন, শব্দ যেমন শক্তি, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় তরঙ্গের আকারে; আলোও তেমনি এক শক্তি, যা উৎস থেকে বেরিয়ে তরঙ্গের আকারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। এই তত্ত্বে আলোর তরঙ্গ-ধর্ম প্রমাণিত হল। হুইগেন্স আলোর এই তরঙ্গ-তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং বিভিন্ন রঙের কারণ। কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠলো। শব্দ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় কঠিন, তরল কিংবা বায়বীয় মাধ্যম দিয়ে। শূন্য স্থানে শব্দ-তরঙ্গ যেতে পারে না। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন এলো, আলোর তরঙ্গের যাতায়তের মাধ্যম কী? বিশ্বের সর্বত্রই আলোর যাতায়াত। কোন্ মাধ্যমে আলোর তরঙ্গ যাতায়াত করে? হুইগেন্স কল্পনা করলেন সারা বিশ্ব জুড়ে এবং সকল বস্তুর ভিতরে রয়েছে এক মাধ্যম, যে মাধ্যম দিয়ে আলোর তরঙ্গ যাতায়াত করে। তিনি এই কাল্পনিক মাধ্যমের নাম দিলেন 'ইথার' [Ether]।

এইভাবে আলো দুই রূপ নিয়ে বিজ্ঞানীদের কাছে প্রতিভাত হল। সে সময় বিজ্ঞানীরা মেনে নিল আলোর কণাধর্ম এবং তরঙ্গধর্ম। এর প্রায় 150 বছর পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফ্রেনেল [Fresnel] এবং ইয়ং [Young] আবিষ্কার করলেন, দুটি আলোক রশ্মি উপযুক্ত অবস্থায় মিশলে অন্ধকার সৃষ্টি করতে পারে। এই ঘটনার ব্যাখ্যা কণা-তত্ত্বে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় তরঙ্গ-তত্ত্বে। কোনও তরঙ্গে থাকে তরঙ্গ-শীর্ষ [Crest] এবং তরঙ্গ-তল [Trough]। একটি আলোর তরঙ্গ যখন একই রকম অন্য একটি আলোর তরঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তাদের শীর্ষের সঙ্গে শীর্ষের এবং তলের সঙ্গে তলের মিলন ঘটে, তবে সেখানে আলো উজ্জ্বলতর হয়। কিন্তু একটির শীর্ষ অন্যটির তলের উপর পড়লে দুটি মিলে তরঙ্গটির বিলোপ করবে এবং ফলতঃ সেখানে আলোর অভাব হেতু অন্ধকার দেখাবে। সুতরাং দুটি আলোর তরঙ্গের সংঘর্ষের ফলে আলো এবং অন্ধকারের নমুনা বা ছক [Pattern] তৈরি হতে পারে। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় আলোর ব্যতিচার [Interference of Light]।

আলোর পথে যদি কোন অস্বচ্ছ বস্তু রাখা হয়, তবে বস্তুটির ছায়া পড়ে। কোন পর্দায় বা ফোটোগ্রাফী প্লেটে সে ছায়া ধরলে দেখা যাবে ছায়াটির ধারগুলি মনে হবে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট। এই ঘটনা কণিকা-তত্ত্ব ও তরঙ্গ-তত্ত্ব দুটোতেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু ওই বস্তুটি যদি খুবই ছোট এবং সূক্ষ্ম অকারের হয় তবে ফোটোগ্রাফী প্লেটে দেখা যাবে একটি অস্পষ্ট ছায়ার চারপাশে পর্যায়ক্রমে কতগুলি উজ্জ্বল ও অন্ধকার বৃত্তাকার ছায়া। এতে প্রমাণ হয়, আলো প্রতিবন্ধকটির দু'ধার দিয়ে বেঁকে গিয়ে মিশে ওই রকম আলো-অন্ধকার ছায়া বানিয়েছে। কোন বাধার ধার দিয়ে বেঁকে গিয়ে আলোর এই ধরনের ঘটনা 'আলোর ডিফ্রাকসন' [Diffraction of Light] নামে পরিচিত। এই ঘটনার ব্যাখ্যা সম্ভব আলোর তরঙ্গ-ধর্মিতা দিয়ে, তার কণা-ধর্ম দিয়ে নয়। ফলে, বিজ্ঞানীরা মেনে নিলেন আলো হল তরঙ্গ। এই তরঙ্গের গতিবেগ বের হল 1,86,000 মাইল বা 3,00,000 কিলোমিটার প্রতি

সেকেন্ডে। ম্যাক্সওয়েল [Maxwell] তাঁর সূত্রের সাহায্যে বের করলেন তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের [Electromagnetic Waves] গতিবেগও 3,00,000 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে। তিনি বললেন, আলো হল চলন্ত তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ।

1888 খ্রিস্টাব্দে হার্ৎজ [Hertz] বানিয়ে ফেললেন বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ [Electromagnetic Waves] এবং সব বিজ্ঞানী মেনে নিলেন শুধু আলো নয়, সব শক্তিই তরঙ্গের আকারে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়।

সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে আলোর ও অন্যান্য শক্তির তরঙ্গ-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু এই তত্ত্বেও কিছু সমস্যার সমাধান হল না। চরম সত্য একটাই হবে। আইনস্টাইন বলতেন "মানুষের চেতনায় উপলব্ধ জগতের সত্য বিজ্ঞানীদের অনুমান নির্ভর, যার জন্য এই সত্য একেবারে চরম ও খাঁটি হতে পারে না, সময় সময় সত্যের পরিবর্তন হয়। কিন্তু বিশ্বের দ্বিতীয় রূপে যাকে বলা যেতে পারে Objective extra-personal World, সত্য শাশ্বত, এ সত্যের কোনদিন পরিবর্তন হয় না।" আলোর তরঙ্গ তত্ত্বে দুটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিল। একটি হল ইথারের অস্তিত্বহীনতা এবং দ্বিতীয়টি হল 'আলোকবৈদ্যুৎ ক্রিয়া' [Photo-electric Effect]। 1881 সালে মাইকেলসন-মরলের [Michelson-Morley] অতিবিখ্যাত পরীক্ষা প্রমাণ করলো ইথার [Ether] বলে কিছু নেই। সুতরাং আলোক-তরঙ্গ যাতায়াত করে কোন্ মাধ্যমের সাহায্যে তা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হল। অন্য সমস্যা হলো, আলো লিথিয়াম [Lithium], সোডিয়াম [Sodium], পটাসিয়াম [Potossium], রুবিডিয়াম [Rubidium], সীজিয়াম [Caesium] ইত্যাদি ধাতুর উপর পড়লে সেগুলি থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। এই ঘটনার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া গেল না। তরঙ্গ-তত্ত্ব দিয়ে এই ঘটনার কারণ বের করাও সম্ভব হল না। আলো পুরোপুরি তরঙ্গ-শক্তি কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রবল হল।

কিছু কিছু ধাতুর উপর আলো বিশেষ করে বেগুনি বা তার কাছাকাছি রঙের আলো পড়লে ওই সব ধাতুর পাত থেকে ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে আসে। নির্গত ইলেকট্রনগুলির বেগ আলোর উজ্জ্বলতার উপর নির্ভর করে না। উজ্জ্বলতার উপর নির্ভর করে নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যা। আলোর উজ্জ্বলতা বেশি হলে বেশি সংখ্যায় ইলেকট্রন নির্গত হবে অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা বাড়বে। নির্গত ইলেকট্রনের বেগ নির্ভর করে আলোর রঙের উপরে অর্থাৎ কম্পাঙ্কের উপরে। সাত রঙের আলোর মধ্যে বেগুনি আলোতে নির্গত ইলেকট্রনের বেগ সবচেয়ে বেশি হয়। কোন কোন ধাতুর উপর লাল অথবা তার কাছাকাছি রঙের আলো ফেললে ইলেকট্রন নির্গত হয় না, কিন্তু বেগুনি অথবা তার কাছাকাছি রঙের আলো ফেললে ইলেকট্রন নির্গত হয়। এই সব আলোকবৈদ্যুৎ ক্রিয়ার কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

আবারও আলোর তরঙ্গ-ধর্ম নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হল। এইভাবে আলোর স্বরূপ নিয়ে নিউটনের আমল থেকে চলে আসা বহু বাদানুবাদের পর 1900 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষের দিকে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক [Max Planck] তাঁর বিখ্যাত কণাবাদ বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব [Quantum

Theory] প্রচার করলেন। এই কণাবাদকে ভিত্তি করে আজকের কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান [Quantum Mechanics] গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞান এখন দুটি তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার একটি হলো কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান ও অপরটি আপেক্ষিকতাবাদ। প্ল্যাঙ্ক বললেন যে, শক্তির দেওয়া-নেওয়া ও বিকিরণ অবিরত ও অবিচ্ছিন্নভাবে হয় না, হয় ঝাঁকে ঝাঁকে [By Jerks], অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড ভাবে [Discontinuously]। প্ল্যাঙ্ক আরও বললেন, এই ন্যূনতম কণার শক্তি 'E' হলে, $E = h\upsilon$ হবে, যেখানে υ হল ওই শক্তি-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক [Frequency] এবং h কে বলা প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক বা Planck's Constant। এই ধ্রুবকের নির্ধারিত মান হলো 6.624×10^{27} গ্রাম-সেন্টিমিটার^2/সেকেন্ড বা আর্গ-সেকেন্ড। প্ল্যাঙ্কের এই যুগান্তকারী মতবাদ থেকেই আইনস্টাইন 1905 সালে 'আলোকবৈদ্যুৎ ক্রিয়া' [Photo-Electric Effect] সম্পর্কে সব প্রশ্নের মীমাংসা করে এই সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্ব খাড়া করেন ও যথারীতি তার গাণিতিকরূপ দেন। প্ল্যাঙ্কের কণাবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় আইনস্টাইনের 'আলোকবৈদ্যুৎ তত্ত্বে' [Photo-electric Theory]।

আইনস্টাইন বললেন যে, আলোক-শক্তির তরঙ্গ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি-কণার বা কণিকার সমষ্টিমাত্র [Granules of Energy]। আলো যখন কোনও ধাতুর উপর পড়ে, তখন তার একটি শক্তি-কণিকা ধাতুটির পরমাণুর উপর আঘাত ক'রে, একটি বিলিয়ার্ড বল যেমন অন্যটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, তেমনি একটি ইলেকট্রনকে ছিটকে বের করে দেয়। কোন কারণে বাইরের থেকে যখন কোন ধাতু শক্তি পায় এবং সেই ধাতুর উপরিভাগের পরমাণুগুলির ভিতরে দূরতম কক্ষপথে আবর্তনরত কোনও ইলেকট্রন ও কেন্দ্রকের মধ্যেকার আকর্ষণ বলের চাইতে যদি ওই শক্তির বল বেশি হয়, তবে ওই ইলেকট্রনটি ছিটকে বেরিয়ে আসবে। আপতিত শক্তির কিছুটা ব্যয়িত হবে ইলেকট্রনটিকে মুক্ত করতে আর কিছুটা খরচ হবে তাকে গতি দিতে বা নির্গমন-বেগ দিতে। কোনও ধাতুর পরমাণু থেকে একটিমাত্র ইলেকট্রন বের করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তাকে ওই ধাতুর 'মুক্তি-বিভব' বা 'ওয়ার্ক-ফাংশন' [Work-function] বলে। এই ওয়ার্ক-ফাংশন সব ধাতুর ক্ষেত্রে এক নয়। একে সাধারণতঃ W ধরা হয় এবং W স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন ধাতুর বেলায় বিভিন্ন। এখন আপতিত শক্তি $h\upsilon$ যদি মুক্তি-বিভব বা ওয়ার্ক-ফাংশানের চেয়ে কম হয় তবে আলোক কণিকারা এই ধাতু থেকে ইলেকট্রন বের করতে পারে না। কিন্তু $h\upsilon > W$ হলে অর্থাৎ আপতিত শক্তিটি 'W'-এর চেয়ে বেশি হলে তা ইলেকট্রন নির্গমন ঘটাবে এবং ইলেকট্রনটি একটি নির্দিষ্ট বেগ পাবে। আলোর কণিকার শক্তি যত বেশি হবে ইলেকট্রনের গতিও তত বাড়বে। আলোর উজ্জ্বলতা নির্ভর করে তার শক্তি-কণিকার সংখ্যার উপর। একটি আলোক-কণিকা একটি ইলেকট্রন যে বেগে মুক্ত করবে ওই আলোর সমস্ত কণিকা প্রত্যেকেই এক-একটি ইলেকট্রন ওই বেগে মুক্ত করবে। বিভিন্ন তীব্রতায় ইলেকট্রনগুলির বেগ একই থাকে, কিন্তু নির্গত ইলেকট্রন-সংখ্যা তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধির সমানুপাতিক। আলোর তীব্রতা বাড়লে বৈদ্যুতিক পথে বিদ্যুৎপ্রবাহ বাড়বে ইলেকট্রন-নির্গমন সংখ্যা বাড়ার জন্য। তীব্রতা

কমলে প্রবাহ কমবে। তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্গত ইলেকট্রনের গতিবেগ নির্ভর করে না, করে শক্তির কম্পাঙ্কের [Frequency] উপর। সুতরাং আপতিত আলোর তীব্রতা বাড়লে নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়বে, তার তীব্রতা কমলে নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যা কমবে। আলোকবৈদ্যুৎ ক্রিয়া সম্পর্কে আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণটি হল ঃ

$$h\upsilon = W + \frac{1}{2}mv^2$$

যেখানে, h হলো প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক [Planck's Constant],
υ হলো আলোর কম্পাঙ্ক
m হলো ইলেকট্রনের ভর
v হলো নির্গত ইলেকট্রনের বেগ
আর, W-হলো ধাতুটির মুক্তি বিভব বা ওয়ার্ক ফাংশান

সুতবাং আপতিত শক্তির কিছুটা ব্যয় হচ্ছে ওয়ার্ক-ফাংশানের জন্য, আব বাকীটা ব্যয়িত হচ্ছে নির্গত ইলেকট্রনকে বেগ দিতে। এখানে কোনও একটি ধাতুব ক্ষেত্রে W ধ্রুবক বলে v ও υ হবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ υ এর মান অর্থাৎ আলোকের কম্পাঙ্ক বেশি হলে নির্গত ইলেকট্রনের বেগও বেশি হবে। বেগুনি আলোর কম্পাঙ্ক লালের চেয়ে বেশি, তাই আপতিত রশ্মি বেগুনি হলে নির্গত ইলেকট্রনের বেগ, লাল আলো আপতিত হলে যে ইলেকট্রন নির্গত হয় তার বেগের চেয়ে বেশি হবে। আলোর তীব্রতা বাড়লে নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়ে, আলোর কম্পাঙ্ক বাড়লে নির্গত ইলেকট্রনের গতিবেগই বাড়ে। এর বিপরীত ব্যাপারটাও সমান সত্য। অর্থাৎ আপতিত রশ্মির তীব্রতা কমলে নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে এবং তার কম্পাঙ্ক কমলে নির্গত ইলেকট্রনের গতিবেগ কমে।

আইনস্টাইন বললেন, আলোক-শক্তি শুধু খণ্ড খণ্ড ভাবে নির্গত [Emitted] হয় কিংবা শোষিত [Absorbed] হয় তাই নয়, নির্গমন ও শোষণ—এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তীকালে অর্থাৎ আলোর প্রবহমান অবস্থায়ও আলো খণ্ড খণ্ড অবিভাজ্য টুকরোর সমষ্টি। কিছুদিন পরে তিনি এই টুকরোগুলির নাম দেন 'ফোটন' [Photon]। আলো কিংবা যে কোন বিকীর্ণ শক্তি হল ঝাঁক ঝাঁক ফোটনের সমষ্টি এবং 'ফোটন' হল শক্তির মূলকণা।

সুইডিশ অ্যাকাডেমি কমিটি বেশ কিছুদিন ধরে ভাবছিলেন, আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত। কিন্তু লেনার্ডের মত খ্যাতনামা এবং নোবেল পুরস্কার পাওয়া কিছু বিজ্ঞানী আপেক্ষিকতাবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এমন কি 1919 খ্রিস্টাব্দে এডিংটনের পরীক্ষায় সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা এই তত্ত্ব মেনে নেন নি। এছাড়া নোবেল কমিটির সাধারণ নিয়মমত এই পুরস্কার তাঁদেরই দেওয়া হয় যাঁদের বিশিষ্ট আবিষ্কার ব্যবহারিকভাবে মানবজাতির উন্নতি সাধনের কাজে লাগে। নোবেল কমিটি তখনও বুঝতে পারেন নি আপেক্ষিকতাবাদ মানবজাতির উন্নতিতে কীভাবে কাজে লাগবে? আসলে আপেক্ষিকতাবাদ তখনও অধিকাংশ বিজ্ঞানী ঠিকঠাক বুঝতে পারেন নি। নোবেল

কমিটিও আপেক্ষিকতাবাদ বোঝেন নি। ফলে, এই কমিটি 1921 খ্রিস্টাব্দের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কারের জন্য আইনস্টাইনকে মনোনীত করার পর বলেছিলেন, "এই পুরস্কার আইনস্টাইনকে দেওয়া হল তাঁর আলোকবৈদ্যুৎ তত্ত্ব ও তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট অবদানের জন্য।" লেনার্ড প্রমুখেরা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে নোবেল কমিটিকে কড়া চিঠি লিখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, 1922 খ্রিস্টাব্দে এই ঘোষণা করা হয়। ওই বছর জাপান যাওয়ার পথে 9 ই নভেম্বর তিনি এই খবর পান। ওই দিনই ঘোষিত হয় যে, 1921 সালের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন আইনস্টাইন।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ

ছাত্রাবস্থা থেকেই আইনস্টাইন ভাবতেন, যদি কেউ আলোর বেগে কোন আলোক রশ্মির সঙ্গে ছুটতে থাকে, তবে তার কাছে রশ্মিটি হবে একটি স্থির-তরঙ্গ। অথচ ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বানুসারে আলো হল তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের [Electromagnetic Field] তরঙ্গ আকারে গতির ফল। গতি না হলে আলো হতে পারে না। সুতরাং আলোর বেগে ছুটন্ত ওই লোকটির কাছে স্থির তরঙ্গ হয়ে যাওয়া রশ্মিটি আর আলো নয়। আবার 1881 এবং 1888 সালে মাইকেলসন-মরলে [Michelson Morley] তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণ করলেন 'ইথার' [Ether] বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানীরা সমস্যায় পড়লেন। ইথার না থাকলে আলোর তরঙ্গ যাতায়াত করে কোন্ মাধ্যম দিয়ে? এই সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানীদের কয়েকজন কিছু মতবাদ খাড়া করলেন। ইথারের অস্তিত্ব এবং পরমবেগের [Absolute Velocity] ধারণা বজায় রাখতে চাইলেন এই সব বিজ্ঞানীরা। ফিৎজেরাল্ড [Fitzgerald] বললেন, কোন চলন্ত বস্তু তার গতির দিকে কিছুটা সঙ্কুচিত হয় এবং এই সঙ্কোচনের মান নির্ভর করে বস্তুটির বেগের উপর। লোরেনৎস [Lorentz] এই মতবাদের উন্নতি ঘটিয়ে বললেন, প্রতিটি বস্তুই মৌলিক বিদ্যুৎ-আধানের দ্বারা গঠিত। তড়িৎ-গতিবিদ্যার [Electro-dynamcis] নিয়মানুযায়ী বস্তুটির গতিতে বলের [Force] সৃষ্টি হয়। এই বল আধানগুলিকে গতির অভিমুখে চেপে রাখে এবং সে কারণে বস্তুটি গতির দিকে সঙ্কুচিত হয়।

তাঁর মতে মাইকেলসন-মরলের ইনটারফেরোমিটার যন্ত্রে আলোর গতিবেগের তারতম্য না পাওয়ায় অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। ব্যাপারটি সনাতন বলবিদ্যার ব্যাপার। আলোর বেগের মান পশ্চিম-পূর্বে রাখা নলটিতে কমেই যায়, কিন্তু এই নলটি পৃথিবীর বেগের জন্য দৈর্ঘ্যে সমানুপাতে ছোট হয়ে যায় বলে আলোর তরঙ্গের এই দিকে প্রবাহের সময়-মান এবং উত্তর-দক্ষিণ দিকের নলে আলোর তরঙ্গের প্রবাহের সময়-মান সমান থাকে, কারণ পৃথিবীর গতির লম্বের [Perpendicular] দিকে আলোর বেগ ও নলের দৈর্ঘ্যে কোন পরিবর্তন হয় না। আবার পশ্চিম-পূবে রাখা নলটির দৈর্ঘ্যের তফাৎ বোঝা যাবে না এই কারণে যে, যে স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপা হবে সেটিও সমান অনুপাতে ছোট হয়ে যাবে। লোরেনৎস এই বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ লিখলেন 1895 খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মতবাদ পূর্ণ গাণিতিক রূপ নিয়ে

প্রকাশ পায় 1904 খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এই মতবাদ মূল সমস্যার সমাধান করতে পারল না। তাঁর মতবাদ ছিল পুরোপুরি তদর্থক [Adhoc]। বিজ্ঞানীরা তাঁর অঙ্কগুলিকে কেবল অঙ্ক হিসাবেই নিলেন। তার বাস্তবতা নিয়ে তাঁদের সন্দেহ এবং জিজ্ঞাসা রয়েই গেল।

লোরেনৎসের এইসব ব্যাখ্যার কিছুদিন পরেই 1905 খ্রিস্টাব্দে আইনস্টাইন তাঁর অতিবিখ্যাত বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ উপস্থাপনা করলেন। এর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, মহাকাশ বা দেশ [Space] অনন্ত, অনন্যগত বা পরনির্ভরশীল নয়। মহাকাশের কাঠামো স্থির। তার সাপেক্ষে কোন বস্তুর পরমবেগ [Absolute Velocity] বের করা যায়। আবার লোরেনৎসের তত্ত্বে পাওয়া গেল চলন্ত বস্তুর দৈর্ঘ্য সংকোচন, কাল-প্রসরণ [Time Dilation] এবং আলোর অপরিবর্তনীয় বেগ। আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বে এগুলিকে রাখলেন এবং এতাবৎ চলে আসা মহাকাশ সম্পর্কে ধ্যানধারণার পুরোপুরি পরিবর্তন ঘটিয়ে আপেক্ষিকতাবাদ প্রতিষ্ঠিত করলেন।

আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে বললেন, বস্তুহীন মহাকাশের কোন অস্তিত্ব নেই। বস্তু আছে তাই মহাকাশ [Space] আছে। তাঁর প্রায় 200 বছর আগে লাইবনিৎস [Leibnitz] মহাকাশ সম্বন্ধে এমন ধারণা দিয়ে বলেছিলেন, "Space is the order or relation of things among themselves, without things occupying it, it is nothing." মহাকাশ শুধু বস্তুগুলির নিজেদের ভিতর বিন্যাস। মহাকাশে বস্তুগুলি না থাকলে মহাকাশ কিছু নয়।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের দুটি মূল স্বীকার্য [Fundamental Postulates] হল ঃ

1] The laws of physical phenomena are the same when stated in terms of two systems of reference in uniform translatory motion relative to each other ;

2] The velocity of light in vacuum is a constant, independent not only of the direction of propagation but also of the relative velocity of the source and the observer.

প্রথম স্বীকার্যটিকে বলা হয় হয় 'সমতুল্যতা নীতি' [Principle of Equivalence]। দ্বিতীয় স্বীকার্য বলছে বিশ্বের সর্বত্র আলোর গতিবেগ একই এবং এই গতিবেগ সর্বোচ্চও বটে। এই স্বীকার্য দুটিকে একটু অন্যভাবেও বলা হয়েছে মূল বক্তব্য একই রেখে। যেমন ঃ

1] The laws of physics apply equally well for any two observers moving with constant linear velocity relative to each other, or, in other words the observations on one reference-frame are not preferred above those on any other.

2] All observers must find the same value of the free-space velocity of light regardless of any motion they may have.

আইনস্টাইন বললেন, সময় অনন্ত কিংবা অনন্যগত নয়। ঘটনা ঘটছে বলেই আমরা সময়ের নির্দেশ পাই। চোখ না থাকলে যেমন রঙ থাকে না তেমনি ঘটনা না থাকলে সময় থাকে না। সময় অপরিবর্তনীয় নয়, বিশ্বের যে জিনিষটি অপরিবর্তনীয় তা হলো আলোর

বেগ। বিশ্বের সর্বত্র আলোর বেগ সমান এবং কোনও বস্তুর বেগ আলোর বেগের সমান হতে পারবে না। আলোর বেগ বিশ্বের সর্বত্র সমানই শুধু নয় এই বেগ সর্বোচ্চ বেগ। শুধু তাই নয়। আলোর বেগ পর্যবেক্ষকের গতির উপরও নির্ভরশীল নয়। এই বেগ ধ্রুবক। সারা বিশ্বের সর্বত্রই কাঁটায় কাঁটায় এক।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে আইনস্টাইন সময় সম্পর্কে যে ধারণা দিলেন তাতে জানা গেল সময় আপেক্ষিক এবং ঘটনা ঘটছে বলেই সময় আছে, ঘটনা না থাকলে সময় বলে কিছু নেই। সময় অনন্ত বা অনন্যগতও নয়, সময় আপেক্ষিক। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে কোন বস্তুই আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগ সম্পন্ন হবে না বা হতে পারে না। আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার [3×10^5 কিমি/সেকেন্ড]। আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনও বস্তুতে তিনটি ঘটনা ঘটবে। বস্তুর দৈর্ঘ্য-সংকোচন ঘটবে গতির অভিমুখে, দ্বিতীয়তঃ তার ভর [Mass] বৃদ্ধি ঘটবে এবং সর্বোপরি ওই বস্তুর সঙ্গে কোনও ঘড়ি যুক্ত থাকলে সেই ঘড়ি 'স্লো' [Slow] চলবে। এই তিনটি ঘটনা যে আনুপাতিক হারে ঘটবে তা হল ঃ

$$r = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

যেখানে, r = আনুপাতিক হার
v = বস্তুটির গতিবেগ
c = আলোর গতিবেগ

মনে করা যাক, v=1/7c, অর্থাৎ বস্তুটির গতিবেগ আলোর গতিবেগের সাত ভাগের এক ভাগ বা এক সপ্তমাংশ। তখন,

$$r = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{7}\right)^2 c^2/c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{49}}} = 1\cdot01$$

অর্থাৎ গতিশীল অবস্থায় বস্তুর ভর 1% বৃদ্ধি পাবে, ওই গতিশীল বস্তুটির দৈর্ঘ্য ছোট হবে 1%। বস্তুটির সঙ্গে সংযুক্ত ঘড়িটি গতিশীল অবস্থায় 1% 'স্লো' চলবে। এ সবই ঘটবে বস্তুটির গতিশীল অবস্থায়। আলোর গতিবেগের সাত ভাগের এক ভাগ গতিতে চললে কোনও বস্তুর পৃথিবী ঘুরে আসতে সময় লাগে প্রায় এক সেকেন্ড। এই গতিতে সময় স্লো হবে 1% মাত্র। আর এই গতিবেগ দ্বিগুণ হলে [v=2/7c], এই অনুপাত দাঁড়াবে 1·04, অর্থাৎ সময় ধীরে চলবে 4% হারে। তেমনি v = 6/7c হলে, r হবে 2, অর্থাৎ সময়ের গতি অর্ধেক হয়ে যাবে ওই গতিশীল বস্তুতে। পৃথিবীতে কোন সময়ের পরিমাণ এক ঘণ্টা হলে পৃথিবীর আপেক্ষিকে কোনও গতিশীল বস্তুতে, যার গতিবেগ আলোর গতির 6/7 ভাগ, সময়ের মাপ হবে আধঘণ্টা। আইনস্টাইনীয় পরিমণ্ডলে গতিবেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গতিশীল বস্তুতে সময় ধীরে চলবে এবং তা হবে মোটামুটি এই রকম অনুপাতে ঃ

$v = 0.995c$ হলে $r = 10$
$v = 0$ $99995c$ হলে $r = 100$
$v = 0.9999995c$ হলে $r = 1000$
$v = 0.999999995c$ হলে $r = 10,000$

সহজ কথায়, কোন মহাকাশযাত্রীর মহাকাশযানের গতি 0.9999995c হলে অর্থাৎ আলোর গতিবেগের 99.99995% হলে, মহাকাশযাত্রীর ঘড়িতে এক বছর অতিক্রান্ত হলে এই পৃথিবীতে তখন 1000 বছর অতিক্রান্ত হবে। ওই মহাকাশযাত্রীর এক বছর হবে পার্থিব এক হাজার বছরের সমান। গতিশীল মহাকাশযানের পর্যবেক্ষক দেখবেন পৃথিবীতে ঘড়ি অত্যন্ত দ্রুত চলছে। আর পৃথিবীর পর্যবেক্ষক দেখবেন মহাকাশযানের ঘড়ি খুব ধীরে চলছে। ওই মহাকাশযাত্রী তাঁর ঘড়ির এক বছর পরে পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখবেন তাঁর যাত্রার সময় থেকে পৃথিবীতে এক হাজার বছর কেটে গেছে। সব বদলে গেছে পৃথিবীর, কিন্তু মহাকাশযাত্রীর পরিবর্তন হয়েছে খুব সামান্যই। কারণ তাঁর সময় কেটেছে মাত্র এক বছর।

আগেই বলা হয়েছে, আলোর বেগ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বেগ বা চরম বেগ। অন্য কোনও বস্তুর বেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশি এমনকি সমান হতেও পারবে না। কোনও বস্তুর উপর বাইরের থেকে বল প্রয়োগ করে যতই বেগ বাড়ানো হবে ততই বস্তুটির ভর যাবে বেড়ে। বস্তুটির বেগের মান যত আলোর কাছাকাছি হবে, ভরের মান হবে অনন্তমুখী। তাই বস্তুটি কখনও আলোর বেগের সমান বেগ পাবে না। বস্তুটির বেগ যতই আলোর বেগের কাছাকাছি হতে থাকবে, বস্তুটি ততই বাইরের বলকে অধিকতর বাধা দিতে থাকবে, যার জন্য তার ত্বরণ [Acceleration] কমতে থাকবে। অঙ্ক কষে গতির সঙ্গে বস্তুর ভরের সম্পর্ক বের করলেন আইনস্টাইন। সম্পর্কটা হল ঃ

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

যেখানে, $m = v$ বেগে চলন্ত বস্তুর ভর,
m_0= বস্তুটির স্থিতাবস্থার ভর
v = বস্তুটির গতিবেগ,
c = আলোর গতিবেগ।

বস্তুর বেগ বাড়ার সঙ্গে তার ভরের এই আপেক্ষিক বৃদ্ধি থেকে আইনস্টাইন এক যুগান্তকারী পরমাশ্চর্য সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তিনি ভাবলেন, বস্তুর গতি বাড়ার সঙ্গে তার গতিশক্তি [Kinetic Energy] বাড়ছে এবং সেই গতিশক্তিই তার ভর বাড়াচ্ছে। অর্থাৎ শক্তির আধিক্যই ভর বৃদ্ধির কারণ। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন, শক্তির ভর আছে। তাঁর এই

সিদ্ধান্তের গাণিতিকরূপ দিলেন তিনি। যদি শক্তির এই আধিক্যকে 'E' ধরা হয়, তবে এই শক্তির ভর হবে E/c^2, যেখানে c হল আলোর গতিবেগ। যদি স্থিতাবস্থায় কোন বস্তুর জড়ত্বজনিত ভর [Interial Mass] m_0 হয় এবং চলন্ত অবস্থায় তার ভর m_v হলে, ভর বৃদ্ধি হবে m_v-m_0 এবং তা E/c^2-এর সমান। ভর বৃদ্ধিকে m ধরলে বেরিয়ে আসে সেই বিখ্যাত সূত্র ঃ

$$E = mc^2$$

যেখানে, E= শক্তির পরিমাণ, m = বস্তুর ভর, c = আলোর গতিবেগ।

এইভাবেই আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের অনুসিদ্ধান্তে বস্তুর ভর ও শক্তির তুল্যতার [Equivalence of Mass and Energy] সূত্র প্রকাশ করলেন। এই বিখ্যাত সূত্র অনুসারে এক গ্রাম ভরের কোন বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে, তা হল ঃ

$E = m \times c^2 = 1\times(3\times10^{10})^2 = 9\times10^{20}$ আর্গস

$= 5\ 6 \times10^{12}$ ইলেকট্রন-ভোল্ট $= 2\times10^{13}$ ক্যালোরি

$= 25 \times 10^6$ কিলো-ওয়াট-ঘণ্টা [K.W H]

যেখানে এক কিলো-ওয়াট-ঘণ্টা হল বিদ্যুৎ খরচের এক একক [Unit]।

সুতরাং এক গ্রাম বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে আমরা 25×10^6 একক বিদ্যুৎ পেতে পারি। এখনও পর্যন্ত কোনও পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তি বা অন্যশক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয় নি। হলে, আড়াই কোটি কিলো-ওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎ পাওয়া যেত একগ্রাম ভরের কোন পদার্থ থেকে।

এখন পরমাণুকে ভেঙ্গে বিপুল শক্তি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ইউরেনিয়াম জাতীয় ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রককে [Nucleus] নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে বিভাজিত [Split] করে এই শক্তি পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। পারমাণবিক চুল্লী এবং পারমাণবিক বোমায় এই বিভাজন [Fission] পদ্ধতি ব্যবহৃত। এই ফিশনে পরমাণুটি ভেঙ্গে দুটি সম্পূর্ণ অন্য পদার্থের পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় এবং এতে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয় আইনস্টাইনের ওই $E = mc^2$ সূত্র মেনে।

কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ

1907 খ্রিস্টাব্দে আপেক্ষিক তাপের [Specific Heat] উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের অবতারণা করেন আইনস্টাইন। প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বকে [Quantum Theory] কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে পুরানো এক সমস্যার সমাধান করলেন আইনস্টাইন। 1819 সালে ডুলং ও পেটিট [Dulong and Petit] বিভিন্ন কঠিন মৌলের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় করে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই দুই ফরাসী বিজ্ঞানীর এই সিদ্ধান্ত 'ডুলং-পেটিট সূত্র' [Dulong and Petit's Law] নামে অভিহিত। এই দুই বিজ্ঞানীর পুরো নাম হল P. L. Dulong এবং A.T. Petit। এঁদের সূত্রটি হল ঃ

"কঠিন মৌলের পারমাণবিক ওজন [Atomic Weight] ও আপেক্ষিক তাপের গুণফল একটি ধ্রুবক রাশি। এই গুণফলটিকে বলা হয় 'পারমাণবিক তাপ' [Atomic Heat]। মোটামুটিভাবে প্রত্যেকটি কঠিন মৌলের পারমাণবিক তাপ 6.4 ক্যালরি।"

আইনস্টাইনই সর্বপ্রথম প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম মতবাদ দিয়ে উষ্ণতার পরিবর্তনে কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন এবং ব্যাখ্যাও দেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হল, T উষ্ণতায় দোলকের শক্তি KT নয়, এর পরিবর্তে প্ল্যাঙ্কের সমীকরণ অনুযায়ী υ কম্পাঙ্কের দোলকে গড় শক্তি হল ঃ

$$\overline{E}_{\upsilon} = \frac{h\upsilon}{e^{h\upsilon/kT} - 1}$$

আইনস্টাইন অনুমান করলেন, নির্দিষ্ট-কঠিন পদার্থের পরমাণুগুলি প্রত্যেকে একই কম্পাঙ্কে আন্দোলিত হয় [Monochromatic], কিন্তু বিভিন্ন কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে এই কম্পাঙ্ক ভিন্ন হবে। এক গ্রাম-পরমাণুর মোট শক্তি ঃ

$$U = 3N\frac{h\upsilon}{e^{h\upsilon/KT} - 1}$$

এবং $$C\upsilon = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{\upsilon} = 3NK.\left(\frac{h\upsilon}{KT}\right)^2 . \frac{e^{h\upsilon/KT}}{e^{h\upsilon/KT} - 1}$$

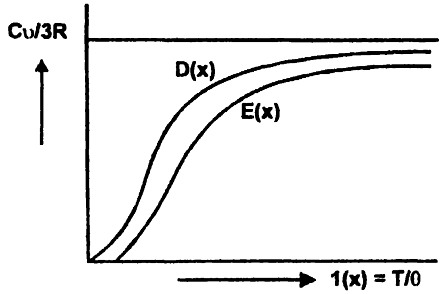
$$= 3Rx^2 . \frac{e^x}{\left(e^x - 1\right)^2} = 3RF_E(x)$$

যেখানে, $x = \frac{h\upsilon}{KT}$ এবং আইনস্টাইনীয় অপেক্ষক হল,

$$F_E(x) = \frac{x^2 e^x}{\left(e^x - 1\right)^2}$$

আইনস্টাইনের ওই সমীকরণ বলে দেয় উষ্ণতার পরিবর্তনে আপেক্ষিক তাপের পরিবর্তনের কথা। এই সমীকরণ থেকে পাওয়া যায় $T > h\upsilon / K$ হলে $x \ll 1$ এবং $F_E(x) \approx 1$ এবং $C_{\upsilon} \simeq 3R$। অন্যদিকে $T \to 0$ অথবা $x \to \infty$ হলে $C_{\upsilon} \to 0$। এই সিদ্ধান্তটি মোটামুটিভাবে পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত হল, কোন একটি বিশেষ, কঠিন মৌলের ক্ষেত্রে υ একটি ধ্রুবক। সেইজন্য $h\upsilon/K = \theta_E$ [ধ্রুবক] এবং $x = \frac{\theta_E}{T}$। সমীকরণ থেকে θ_E স্থির করা সম্ভব হয়, যদি পরীক্ষার সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় C_{υ} জানা যায় এবং $C_{\upsilon} = 3RF_E(\theta_E/T)$ সমীকরণে তা প্রয়োগ করা হয়। Ag-র ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের সমীকরণের সাহায্যে $14^{0}K$ উষ্ণতায় C_{υ}-র মান যা পাওয়া গেল তা পরীক্ষালব্ধ মানের ·0356 গুণ। উষ্ণতা কমলে এই পার্থক্য আরও বেশি হয়।

আইনস্টাইনের সমীকরণ $C_\upsilon = 3RF_E(x)$ বা $\frac{C_\upsilon}{3R} = F_E\left(\frac{\theta_E}{T}\right)$ থেকে পরীক্ষার সাহায্যে C_υ জেনে যে লেখচিত্র পাওয়া যায় তা হল ঃ



আইনস্টাইন ও ডিবাই ফাংশনের লেখচিত্র

এখানে $F_E(x)$ হল আইনস্টাইনের অপেক্ষক [Enstein's Function] এবং $F_D(x)$ ডিবাইয়ে অপেক্ষক [Debye's Function]। আইনস্টাইনের সমীকরণে কিছু ভুল ছিল, যার জন্য উষ্ণতা পরমশূন্যের কাছাকাছি এলে আপেক্ষিক তাপের পরীক্ষালব্ধ মানের সঙ্গে সমীকরণলব্ধ মানের পার্থক্য ঘটছিল। আইনস্টাইনের সমীকরণের মূল ত্রুটি হল, এখানে পরমাণুগুলির প্রত্যেকের জন্য একই কম্পাঙ্ক ধরা হয়েছে। বাস্তবে কিন্তু পরমাণুগুলির প্রত্যেকের কম্পাঙ্ক অন্যান্য পরমাণুর উপস্থিতির কারণে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং প্রতিটি পরমাণু একই কম্পাঙ্ক-যুক্ত, এই ধারণাটা ঠিক নয়। এই পদ্ধতির আরেকটা ত্রুটি হল θ_E স্থির করার পর একে যাচাইয়ের কোনও উপায় নেই। প্রায় একই সময়ে ডিবাই [Debye], ম্যাক্স বর্ন [Max Born] ও ক্যারম্যান [Karman] আইনস্টাইনের সমীকরণের ত্রুটিগুলি দূর করতে সচেষ্ট হন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, প্রত্যেক পরমাণুকে একই কম্পাঙ্কের দোলক চিন্তা না করে ওদের সকলের জন্য কম্পাঙ্কের একটি নিরবচ্ছিন্ন কম্পাঙ্ক বর্ণালী [Continuous Frequency Spectrum] নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হবে। কিন্তু আইনস্টাইন যে এক্ষেত্রে সনাতন পদার্থবিদ্যার বাইরে এসে কোয়ান্টাম মতবাদের আশ্রয় নিয়েছেন সে সম্পর্কে এঁরাও একমত। এ কথা অনস্বীকার্য যে, কোয়ান্টাম মতবাদের দিকে আইনস্টাইনের এই পদক্ষেপ ছিল একেবারে সঠিক এক পদক্ষেপ এবং যুগান্তকারী ঘটনা। ডিবাই কোয়ান্টাম মতবাদ বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসরণ করেই আইনস্টাইনের সমীকরণে প্রয়োজনীয় সংস্কার করেন। তাঁর সমীকরণে $C_\upsilon = 3R\,F_D(x)$, যেখানে F_D ডিবাইয়ের অপেক্ষক এবং

$$F_D(x) = \frac{12}{x^3}\int_0^x \frac{\varepsilon^3 d\varepsilon}{e^\varepsilon - 1} - \frac{3x}{e^1 - 1}$$

যাইহোক, কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা কণাবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ এবং আইনস্টাইনের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ

1916 খ্রিস্টাব্দে আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশ করলেন। নিউটন তাঁব 'Principia' গ্রন্থে যা বলেছিলেন, তা সহজ কথায় বললে দাঁড়ায়, 'একটি মাধ্যমে বলবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলগুলি অকাট্য প্রমাণিত হলে, সেগুলি ওই মাধ্যমের আপেক্ষিকে অপরিবর্তনীয় বেগে বা সমবেগে চলন্ত অন্য সব মাধ্যমে সমানভাবে অকাট্য বলে প্রমাণিত হবে।' আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে বললেন যে, এই মাধ্যমগুলিতে শুধু বলবিদ্যারই নয় প্রাকৃতিক সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলগুলিও একই রকম হবে যদি ওই মাধ্যমগুলি সম্পূর্ণরূপে জাড্যগুণ সম্পন্ন মাধ্যম [Perfectly Inertial System] হয়। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে তিনি দেখালেন, যে মাধ্যমগুলি পরস্পরের আপেক্ষিক সমবেগে চলমান অবস্থায় আছে সেগুলিতে তো বটেই, তা ছাড়াও কোন নিয়ম না মেনে চলে খামখেয়ালিভাবে বা যদৃচ্ছভাবে [Arbitrarily] চলন্ত অবস্থায় আছে, অথবা নিয়মিত ত্বরান্বিত বেগে [Accelerated Velocity] আছে, এইরূপ সব মাধ্যমগুলিতেও প্রাকৃতিক নিয়মাবলী একইভাবে অকাট্য বলে প্রমাণিত হবে।

'মহাকর্ষীয় আকর্ষণ' [Gravitational Attraction]—নিউটনের এই সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়ে তিনি বললেন, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র [Gravitational Field]। দেশ-কাল-সন্ততির বা মহাকাশ-সময়-সন্ততির [Space-time-continuum] গঠনেব জন্য বা জ্যামিতিক গুণসম্পন্ন হওয়ার জন্য বিশ্বের প্রতিটি বস্তু গতিশীল হয়। তাঁর মহাকর্ষ তত্ত্বে 'বল' বলে কোন জিনিস নেই। মহাকাশ-সময়-সন্ততির গঠনের ব্যাখ্যায় তিনি সনাতন ইউক্লিডীয় জ্যামিতির [Euclidean Geometry] সাহায্য না নিয়ে রীমানীয় জ্যামিতির [Riemannian Geometry] সাহায্য গ্রহণ করলেন। তিনি বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর গতিকে বোঝালেন মহাকাশের ক্ষেত্রের ধারণা দিয়ে এবং জানালেন মহাকাশে সময়-সন্ততির গঠনের জন্য এমনটা হয়। আইনস্টাইন 'বল' বলে কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। সমস্ত রকম বলকে শক্তির [Energy] সংজ্ঞায় প্রকাশ করা যায় এবং প্রতিটি শক্তিকে একটি 'ক্ষেত্র' [Field] হিসাবে বিবেচনা করা যায়। তাই নিউটনের মহাকষীয় বলকে বাদ দিয়ে অইনস্টাইন তাঁর 'মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র' ধারণা প্রতিষ্ঠিত করলেন 1916 সালের ওই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে [General Therory of Relativity]।

বস্তুহীন মহাকাশের [Space] অস্তিত্ব নেই। বস্তু আছে বলেই মহাকাশ আছে। প্রতিটি বস্তুই মহাকাশে একটি ক্ষেত্র রচনা করে তার ঘনত্ব ও বেগ অনুযায়ী। তাঁর এই মতে তিনি বললেন, মহাকাশ সমস্ত বস্তু ধারণকারী কোন অনমনীয় [Rigid] এবং পরিবর্তনাতীত [Immutable] কাঠামো নয়, পরন্তু মহাকাশ বা দেশ ও সময় বা কাল যে দুটিকে অনন্যগত [Independent] বলে মনে করা হত, সে দুটি অবিচ্ছিন্ন এবং এই সন্ততি কোন নির্দিষ্ট আকার শূন্য, নমনীয় এবং অতিরিক্ত মাত্রায় পরিবর্তনশীল। প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বই এই সন্ততিকে নুইয়ে দেয় [Bends], বিকৃত করে [Distorts] এবং বস্তুর ঘনত্ব যত বেশি হবে, সন্ততির নুইয়ে পড়া এবং বিকৃতি দুই-ই তত বেশি হয়।

প্রতিটি বস্তুই মহাকাশে ক্ষেত্র রচনা করে তার ঘনত্ব ও বেগ অনুযায়ী, যার গঠন হলো এবড়ো-খেবড়ো, উঁচু-নীচু আল-দেওয়া জমির মত। মহাকাশের যে কোন স্থানে ও যে কোনও সময়ে ওই ক্ষেত্রের শক্তি [Field Strength] জানা যায় আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণের দ্বারা। সাবানের ফেনা যেমন সাবানের বুদ্বুদ তৈরি করে, এই বিশ্বের বুদ্বুদ তেমনি তৈরি হয়েছে শূন্য মহাকাশের সঙ্গে শূন্য সময়কে ঝালাই করে [Welded]।

বিশ্বের এই বক্রতার জন্য কোন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে আলো সরল রেখায় যেতে পারে না, কারণ এই বক্র মহাকাশে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এরূপ যে, তার ভিতরে সরল রেখা বলে কিছুই থাকতে পারে না। আলো যে ক্ষুদ্রতম পথে যায় তাও একটি নির্ভেজাল বক্রপথ যার আকৃতি নির্ভর করে ওই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের উপর। সৌরজগতের ভিতরে বস্তু-ঘনত্বের পরিমাণ বেশি বলেই এখানে আলোর বক্রপথ যতটা বেশি বাঁকা হবে, তুলনামূলকভাবে আন্তর্নক্ষত্র বা আন্তঃ-গ্যালাক্সী পথে আলো অতটা বাঁকা পথে চলবে না, ববং বেশ সোজা বা সরল পথেই চলবে। সূর্যের পাশ দিয়ে আসবার সময় আলোকরশ্মির বাঁক নেওয়ার পরিমাণ হবে 1·74 সেকেন্ড [Seconds of an arc]। এডিংটন এটা 1919 সালে পরীক্ষা করে প্রমাণ কবার সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইনেব এই নতুন তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার সিংহাসনে এসে বসে।

আইনস্টাইন অঙ্ক কষে দেখালেন, সূর্যের পাশ দিয়ে কোনও আলোক-রশ্মি আসার সময় সেটি সূর্যের দিকে যতটা বেঁকে যায় তার পরিমাণ হবে,

$$\Delta = 4\ GM/ac^2,$$

যেখানে, Δ = বিচ্যুতির কৌণিক মাপ
G = মহাকর্ষীয় ধ্রুবক [Gravitational Constant],
M = সূর্যের ভর,
a = সূর্যের ব্যাসার্ধ,
c = আলোর গতিবেগ,

সূর্যের বেলায় Δ-এর মান হয় 1.74 সেকেন্ড (কৌণিক মান)। এটা আইনস্টাইন অঙ্ক কষেই দেখিয়েছিলেন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে 1916 খ্রিস্টাব্দে। বৃটিশ বিজ্ঞানী এডিংটন তার নিখুঁত সত্যতা প্রমাণ করলেন সর্বপ্রথম 1919 সালে। তারপর 1922 এবং অন্যান্য বছর নানা সময় নানাভাবে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এখন সর্বজনীন সত্য। এই আলোক পথের বিচ্যুতির ঘটনা বিজ্ঞানে 'আইনস্টাইন অভিক্রিয়া' [Einstein Effect] নামে বিশ্ববিখ্যাত। তিনি তাঁর এই তত্ত্বে তিনটি সিদ্ধান্ত অঙ্ক কষে নির্দিষ্ট করেন। তাদের দ্বিতীয়টি ছিল এই আলোর বেঁকে যাওয়া যেটি সর্বপ্রথম প্রমাণিত হয় বাস্তবে এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রমাণিত হয়।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে আইনস্টাইনের প্রথম অনুসিদ্ধান্তটি ছিল বুধগ্রহের কক্ষপথের বিচলন সম্পর্কে সমস্যার সমাধান। এটিকে বলা হয় 'বুধের অনুসূরের চলন' [Advance

of the perihelion of Mercury]। আইনস্টাইন বললেন, গুরুভার বস্তুর আশেপাশের মহাকাশ বা মহাকাশ-সময়-সন্ততি বেশি বক্রতা লাভ করে। সেই মহাকাশে গতিশীল কোনও বস্তু বাঁকা পথে [Curved Path] পথ পরিক্রমা করে। সূর্যের থেকে যে গ্রহ যত বেশি দূরে তার কক্ষপথ ততই বৃত্তাকার। কাছাকাছি থাকা গ্রহদের সূর্য পরিক্রমণ কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। বুধগ্রহ যেহেতু সূর্যের খুব কাছাকাছি অবস্থিত তাই তার কক্ষপথ অত্যন্ত উৎকেন্দ্রিক [Eccentric]। এর ব্যাখ্যা নিউটনের সূত্রে ছিল না। পাওয়া গেল আইনস্টাইনের তত্ত্বে এবং সূত্রে। নিউটনের সূত্র অনুসারে কোন গ্রহের সূর্যের চারিদিকে ঘোরার অবকল সমীকরণ [Differential Eqation] হল,

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{\alpha}{h^2u^2}$$

আইনস্টাইনের দেওয়া এই সমীকরণ হল,

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{\alpha}{h^2u^2} + 3\alpha$$

দুটি সমীকরণেই, $u = \frac{1}{r}$ Radius Vector

$\alpha = Mu^2$, যেখানে,

M = গুরু বস্তুটির ভর। বুধের বেলায় যা সূর্যের ভর।

h = ক্ষেত্রীয় গতি [বুধের]।

বুধের অনুসূরের [Perihelion] তথা কক্ষপথের অয়নচলন [Precession] নিউটনের সূত্র দিয়ে সঠিকভাবে নির্ণয় করা গেল না বহুদিন। এই অয়নচলন গতি বাস্তবে প্রতি 100 বছরে 574 সেকেন্ড (কৌণিক)। কিন্তু নিউটনের সূত্র দিয়ে এই অয়নচলন গতির মান পাওয়া গেল 532 সেকেন্ড। পার্থক্য হল 42 সেকেন্ডের। এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা দিয়ে সনাতন পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান একটি অনাবিষ্কৃত গ্রহের কথা বলল। নেপচুন গ্রহ আবিষ্কৃতও হল। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হল না। আইনস্টাইনের ওই সমীকরণ এই সমস্যার সমাধান করল। নিউটনের সমীকরণের সঙ্গে আইনস্টাইনের সমীকরণের পার্থক্য হল 3α এবং এর থেকে আইনস্টাইন দেখালেন বুধের কক্ষপথের অয়নচলন গতির ওই পার্থক্য $\varepsilon = \frac{6\pi M^2}{h^2}$, যেখানে M = সূর্যের ভর, h = বুধের ক্ষেত্রীয় গতি। এখান থেকে ε -এর মান বের হল 43 সেকেন্ড প্রতি 100 বছরে। সুতরাং বহুকাল ধরে চলে আসা বুধগ্রহের কক্ষপথের অয়নচলন সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল। নিউটনের সমীকরণ থেকে পাওয়া বুধের কক্ষপথের অয়নচলন গতির মানের সঙ্গে বাস্তব মানের পার্থক্য ছিল 42 সেকেন্ড প্রতি 100 বছরে। আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে এই মান 43 সেকেন্ডপাওয়া গেল। এই সমীকরণ

তৈরি হয়েছে তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মহাকর্ষ তত্ত্ব থেকে। সুতরাং তাঁর তত্ত্ব যে সঠিক এবং একেবারে বাস্তব তা প্রমাণিত হল। বুধের অনুসূরের অয়নচলন [Precession of Perihelion] প্রতি 100 বছরে 574 সেকেন্ডের (কৌণিক) কিছুটা বেশি। নিউট'নর সমীকরণ থেকে তা পাওয়া গেল 532 সেকেন্ড প্রতি 100 বছরে। আর আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে তাঁর সমীকরণ দিয়ে এই মান অঙ্ক কষে বের হল প্রায় 575 সেকেন্ড প্রতি 100 বছরে। এই মান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাওয়া বাস্তব মানের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ এবং প্রায় এক। মহাকর্ষ সম্পর্কে আইনস্টাইনের দেওয়া সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সত্য বলে আবারো প্রমাণিত হল এবং তাঁর মহাকর্ষ-ক্ষেত্র-তত্ত্ব [Gravitational Field Theory] প্রতিষ্ঠিত হল।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে তিনি দেখিয়েছিলেন আলো যদি কোন শক্তিশালী মহাকর্ষক্ষেত্র থেকে দূরে চলে যেতে থাকে তবে তার কম্পাঙ্ক [Frequency] কিছুটা কমবে এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য [Wavelength] কিছুটা বাড়বে। ফলে ওই আলোর বর্ণালীতে লালের দিকে কিছুটা সরণ [Shift] দেখা যাবে। আইনস্টাইন অঙ্ক কষে দেখালেন এই সরণ হবে,

$$\frac{d\lambda}{\lambda} = \frac{Gm}{ac^2}$$ যেখানে, λ = আলোকরশ্মিটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য,

$d\lambda$ = তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন,

G = মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, m = যে বস্তুর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র থেকে আলোক রশ্মিটি দূরে চলে যাচ্ছে তার ভর, a = ওই বস্তুর ব্যাসার্ধ, c = আলোর গতিবেগ।

এই সূত্র থেকে অঙ্ক কষে পাওয়া গেল সূর্যের আলোর বর্ণালীর ক্ষেত্রে এই সরণ কিংবা $d\lambda$-এর মান হবে 0.01 অ্যাংস্ট্রম যদি আলোক রশ্মিটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 5000 অ্যাংস্ট্রম হয়। এক অ্যাংস্ট্রম [Angstrom] একক হল 10^{-8} সেন্টিমিটার। একে লেখা হয় Å চিহ্ন দিয়ে। সুতরাং সূর্যের মহাকর্ষ ক্ষেত্রে 5000 অ্যাংস্ট্রমের তরঙ্গ বিশিষ্ট আলোক রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হবে 10^{-10} সেন্টিমিটার। মাপের পক্ষে এই দৈর্ঘ্যটি সে সময় খুবই অসুবিধাজনক ছিল। 1925 খ্রিস্টাব্দে ডবল্যু, এস, অ্যাডামস [W. S. Adams] মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে 'লুব্ধক' [Sirius] নক্ষত্রের সঙ্গী-নক্ষত্রটির বর্ণালী পরীক্ষা করে তার 'লাল-সরণ' [Red Shift] মাপলেন। এই নক্ষত্রটি যথেষ্ট ভারী নক্ষত্র এবং এর মহাকর্ষ ক্ষেত্রের শক্তিও সূর্যের তুলনায় অনেক বেশি। ডপলার এফেক্ট [Doppler Effect]-জনিত সংশোধন করে নেওয়ার পর বর্ণালীর লাল-সরণের মান পাওয়া গেল 0.32 অ্যাংস্ট্রম। ওই নক্ষত্রটির ব্যাসার্ধ প্রায় 18,000 কিলোমিটার। আইনস্টাইনের ওই সূত্র থেকে অঙ্ক কষে পাওয়া গেল লাল-সরণ 0.32 অ্যাংস্ট্রম। সুতরাং আবারো পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হল আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব তথা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ। মহাকর্ষ ক্ষেত্রজনিত কারণে আলোর বর্ণালীর এই সরণ 'আইনস্টাইনীয়-সরণ' [Einsteinian Shift] নামে অভিহিত।

উদ্দীপিত বিকিরণ তত্ত্ব

1917 সালে উদ্দীপিত বিকিরণ তত্ত্ব [Theory of Stimulated Emission] আবিষ্কার করেন আইনস্টাইন। বোরের [Niels Bohr] পরমাণু মডেল ও বিকিরণ ব্যাখ্যা আইনস্টাইনের মনে খুব রেখাপাত করে। কিন্তু সে সময় তিনি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন বলেই ওদিকটায় তেমন মনোযোগ দিতে পারেন নি। তাই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশের পরেই আইনস্টাইন উদ্দীপিত বিকিরণ তত্ত্ব [Theory of Stimulated Emission] প্রকাশ করেন। আইনস্টাইন বললেন, স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ ছাড়াও আর এক প্রকারের বিকিরণ আছে। সেটি হল উদ্দীপক বিকিরণ। কোনও এক রকমের ফোটনের দ্বারা উত্তেজিত যে সব ইলেকট্রন তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক শক্তি-স্তর ছেড়ে উচ্চতর শক্তি-স্তরে অবস্থান করছে, সেই উচ্চতর শক্তি স্তরের ইলেকট্রনগুলির উপরে ঠিক একই প্রকারের শক্তির ফোটন বর্ষিত হলে পূর্বের উত্তেজিত ফোটন ও পরের উদ্দীপক ফোটন, একই পরিমাপের এই দুই ফোটন পরমাণু থেকে একই দিকে নির্গত হয়। এটিই উদ্দীপিত বিকিরণ। এখানেও সম্ভাব্যতার প্রশ্ন আছে। বিকিরণের সম্ভাবনা যদি পাঁচ ভাগের একভাগ হয়, তবে 10 লক্ষ উত্তেজিত পরমাণু থেকে আমরা 2 লক্ষ উদ্দীপিত বিকিরণ বা ফোটন পাবো।

উদ্দীপিত বিকিরণ তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে 1951 খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক টাউনস [Charles H. Townes] আবিষ্কার করলেন 'মেসার' [MASER] বা Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation এবং 1954 সালে মেসার রশ্মি কাজে লাগানো সম্ভব হল সর্বপ্রথম। এখন নানা ধরনের মেসার আবিষ্কৃত হয়েছে। মহাকাশ গবেষণায় মেসার নানাভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। মেসারের মাইক্রোওয়েভের কম্পাঙ্ক মোটামুটি 30 কোটি থেকে 30,000 কোটি হার্ৎজ প্রতি সেকেন্ডে। একে ব্যবহার করা হয় স্পন্দক [Oscillator], উৎপাদক [Generator], বিবর্ধক [Amplifier] হিসাবে। বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানে [Radio Astronomy] মেসার বহুল ব্যবহৃত।

অধ্যাপক টাউনস্ এরপর 1958 খ্রিস্টাব্দে মাইক্রোওয়েভ বা অণু তরঙ্গ [Microwave]-এর বদলে আলোক তরঙ্গ ব্যবহার করে শক্তির উদ্দীপিত বিকিরণের দ্বারা আলোর তীব্রতা বর্ধনের প্রস্তাব দিলেন। 1960 খ্রিস্টাব্দে থিওডোর মেইম্যান [Theodore H. Maiman] মাণিক্যের কেলাস [Ruby Crystal] ব্যবহার করে বানিয়ে ফেললেন 'লেসার' [LASER] বা Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation। লেসার ব্যবহৃত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থায়, শিল্পে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, ওষুধপত্রে, জরিপকার্যে, সেনাবাহিনীতে, বিজ্ঞানের নানা গবেষণায়, সমস্থানিক মৌলগুলির পৃথগীকরণে এবং হাইড্রোজেন পরমাণু সংযোজনে [Fusion]। সারা পৃথিবীতে লেসারের এখন ব্যাপক ব্যবহার। অন্ততঃ ছয় ধরনের লেসার তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য।

সুতরাং উদ্দীপিত বিকিরণ তত্ত্ব তার ব্যবহারিক প্রয়োগে মানুষের নানা কল্যাণ সাধন করছে। সভ্যতা গতি পেয়েছে, প্রগতি হয়েছে মানব জাতির। আইনস্টাইনের তত্ত্বীয়

আবিষ্কারগুলি বিজ্ঞানকে যেমন নবদিগন্ত দিয়েছে, তেমনি পৃথিবীর সভ্যতাকে দিয়েছে দ্রুত উন্নতি। মানবসভ্যতার বর্তমান পর্যায়ের উন্নতির কেন্দ্রবিন্দু তাই স্বয়ং আইনস্টাইন। বিজ্ঞানে, সভ্যতায় আর কোনও বিজ্ঞানীর এমন ব্যাপকতম অবদান নেই।

বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময় প্ল্যাঙ্কের বিকিরণ সূত্রের উপর গবেষণা করছিলেন। বসু ফোটনকে বস্তুকণার তুল্যরূপ বিবেচনা করে প্ল্যাঙ্কের সূত্রটিকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট হলেন। তিনি শক্তির তরঙ্গ চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করলেন এবং কেবলমাত্র বস্তুকণার গ্যাস হিসাবে কল্পনা করে তাতে প্রয়োগ করলেন পরিসাংখ্যিক গতিবিদ্যার [Statistical Dynamics] নিয়মাবলী। ফোটন সমষ্টির মধ্যে এক ফোটনকে অন্য ফোটন থেকে ভিন্ন ভাবা সম্ভব নয়। অধ্যাপক. বসু বস্তুকণাদের নির্দিষ্ট সংখ্যাক পরিস্থিতির [States] মধ্যে বণ্টন করবার চেষ্টা করলেন না, বরং তিনি সন্ধান করলেন কি ভাবে পরিস্থিতিসমূহের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। এই পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হল কেবল মাত্র একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কণাসমূহ যেন এক একটি পরিস্থিতির পরিচায়ক হিসাবে থাকে। এই গণনা পদ্ধতির সঙ্গে অধ্যাপক বসু জুড়ে দিলেন প্রয়োজনীয় ভৌত শর্তাবলী [Physical Conditions]। এইভাবে তিনি বের করলেন প্ল্যাঙ্কের সেই বিখ্যাত সূত্র ঃ

$$dE = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \cdot \frac{d\lambda}{e^{hc/\lambda KT} - 1}$$

যেখানে, dE = শক্তির বণ্টন, h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, c = আলোর গতিবেগ,

λ = শক্তির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, T = তাপমাত্রা [Absolute].

K = বোল্‌ৎজমান ধ্রুবক [Boltzmann's Constant]

অধ্যাপক বসুর গবেষণার কাজটির কথা আইনস্টাইন জেনে ছিলেন ডাক মারফৎ। কাজটি দেখে আইনস্টাইন বলেছিলেন "বোস যেভাবে প্ল্যাঙ্কের সূত্র উপস্থাপিত করেছেন, তা আমার মতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি এখানে যে পন্থা প্রয়োগ করেছেন, তার সাহায্যে একটি আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টাম তত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে।" আইনস্টাইন অধ্যাপক বসুর কাজে খুবই অভিভূত হয়েছিলেন। সময়টা ছিল 1924 খ্রিস্টাব্দ।

আইনস্টাইন বসুর এই কাজে এতোই অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি দ্রুত পর পর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি দেখালেন বসুর এই আবিষ্কার কত সুদূর-প্রসারী। বসুর পরিসাংখ্যিক নিয়ম অনুসরণ করে তিনি সৃষ্টি করলেন এক পরমাণু সম্পন্নম্ন গ্যাসের কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা কণাবাদ। বসুর এই কাজটিকে তিনি গ্যাসের গতি-তত্ত্বে প্রয়োগ করে অতি অল্পমাত্রার গ্যাসের আচরণাদির ব্যাখ্যা করলেন। এই নতুন গণনা পদ্ধতি খ্যাতি পেলো "বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন" [Bose-Einstein Statistics] হিসাবে।

এখন এটি 'বোস সংখ্যায়ন' নামেই পরিচিত। আচার্য বোসের পরিসংখ্যান যে সব কণা মেনে চলে তাদের একই শ্রেণীভুক্ত করে বলা হয় 'বোসন' [Boson]। আর যারা ফের্মির পরিসংখ্যান মেনে চলে তাদের বলা হয় 'ফের্মিয়ন' [Fermion]। ইদানীংকালে 'ইলেকট্রোউইক তত্ত্বের' [Electroweak Theory] নব আবিষ্কৃত $W^{\pm}$ এবং Z^{0} কণাগুলিও 'ভেক্টর বোসন' [Vector Boson]।

ম্যাক্সওয়েল-বোল্ৎজমান শক্তিবণ্টন সূত্র বা সনাতন শক্তিবণ্টন সূত্র [Classical Energy Distribution Formula] থেকে পাই

$$n_i = \frac{g_i}{A e^{\beta u_i}} \quad \text{[ম্যাক্সওয়েল-বোল্ৎজমান]}$$

যেখানে,

$n_i = u_i$ শক্তির কণা-সংখ্যা
g_i = শক্তি-অবস্থার গুরুত্ব-গুণিতক,
u_i = কণার শক্তি, A = ধ্রুবক,

$$\beta = \text{ধ্রুবক} = -\frac{1}{KT}$$

সনাতন সংখ্যায়নে কয়েকটি প্রায়োগিক ত্রুটির মধ্যে একটি হল, এই পরিসংখ্যান অনুসারে,

$$u_\upsilon d\upsilon = KT\frac{8\pi\upsilon^2}{c^3}d\upsilon$$

এই সমীকরণ অনুযায়ী স্থির উষ্ণতায় কৃষ্ণ-বিকিরণে υ-বাড়ার সঙ্গে ফোটনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল, υ খুব বেশি এবং খুব কম—এই দুই অবস্থাতেই ফোটন সংখ্যা খুবই কম। সনাতন সংখ্যায়নে গুরুত্ব-গুণিতিক সঠিকভাবে নির্দেশ করা যায় না। কোয়াণ্টাম সংখ্যায়নে এই সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত মত পাওয়া যায়।

বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নে তাপগতীয় সম্ভাব্যতা হিসাব করার সময় আমাদের দেখতে হয় n_i সংখ্যক কণাকে কত ভাবে g_i সংখ্যক কোষের [Cell] মধ্যে রাখা সম্ভব। কণাগুলি প্রত্যেকে একই ধরনের এবং একটি কোষে যতগুলি ইচ্ছা কণা রাখা যায়। এখানে কোষ মানে নির্দিষ্ট শক্তির বিভিন্ন quantum state বুঝতে হবে। এই পরিসংখ্যান থেকে আমরা পাই ঃ

$$n_i = \frac{g_i}{A e^{\beta u_i} - 1} \quad \text{[বোস-আইনস্টাইন]}$$

যেখানে, $n_i = u_i$ শক্তির কণা-সংখ্যা, g_i = শক্তি-অবস্থার গুরুত্ব গুণিতক, u_i = কণার শক্তি সাম্যাবস্থায়, $A = \text{ধ্রুবক} = \frac{V}{nh^3}(2\pi mKT)^{3/2}$, $\beta = \text{ধ্রুবক} = \frac{1}{KT}$

এটি বোস-আইনস্টাইনের বণ্টনসূত্র [Distribution Law according to B-E Statistics]। একই পদ্ধতিতে ফের্মি-ডিরাক বণ্টনসূত্রে পৌঁছানো যায়। ফের্মি-ডিরাক বণ্টন সূত্র [Distribution Law according to F-D Statistics] থেকে আমরা পাই ঃ

$$n_i = \frac{g_i}{Ae^{\beta u_i} + 1} \quad \text{[ফের্মি-ডিরাক]}$$

বোস-আইনস্টাইন ও ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়নে মূল পার্থক্য এই যে, প্রথম ক্ষেত্র 1-এর আগের চিহ্নটি হবে ঋণাত্মক, কিন্তু দ্বিতীয়ক্ষেত্রে তা ধনাত্মক। সে জন্য ফের্মি-সংখ্যায়নে 0 থেকে ∞-র মধ্যে A-র যেকোন মান নির্দিষ্ট হতে পারে। আবার A>>1 অবস্থায় অর্থাৎ উষ্ণতা বেশি ও ঘনত্ব কম অবস্থায় ফের্মির এই সূত্র থেকে সনাতন বণ্টন সূত্রে পৌঁছানো যায়। গ্যাসের ক্ষেত্রে ফের্মি-বণ্টন সূত্রকে পরীক্ষার মাপকাঠিতে যাচাই করতে যাওয়া এই কারণে অর্থহীন। কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণে বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নের যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এই সংখ্যায়ন থেকে প্ল্যাঙ্কের বণ্টন সূত্রে আসা যায় তা আগেই বলা হয়েছে।

বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন তথা বোস-সংখ্যায়নের প্রসঙ্গ শেষ করি তিনটি সংখ্যায়নের পার্থক্য চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করে।

1] সনাতন সংখ্যায়ন	[pq |]	[p | q]	[q | p]	[| pq]
2] বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন	[•• |]	[• | •]	[| ••]	
3] ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন	[• | •]			

মনে করা যাক, দুটি ফোটন আছে এবং দুটি মাত্র কোষ [Cell] আছে তাদের অবস্থানের জন্য। সনাতন সংখ্যায়ন অনুসারে দুটি ফোটনের একটি অন্যটির চেয়ে আলাদা বা পার্থক্যহীন নয়। ফোটন দুটি একসঙ্গে বা আলাদা আলাদা ভাবে এই দুটি কোষে অবস্থান করতে পারে। এর ফলে, সনাতন সংখ্যায়নের নিয়মে এই দুটি ফোটনের বিন্যাস [Arrangement] চার রকমের হতে পারে। ধরা যাক, ওই ফোটন দুটির একটি p এবং অন্যটি q। আর p ও q পার্থক্যহীন নয়। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সনাতন সংখ্যায়নে p ও q প্রথম কোষটিতে অবস্থান করতে পারে, আর দ্বিতীয়টি ফাঁকা থাকতে পারে, কিংবা তারা দুটি কোষেই অবস্থান করতে পারে, প্রথমটিতে p এবং দ্বিতীয়টিতে q কিংবা প্রথমটিতে q এবং দ্বিতীয়টিতে p। আবার প্রথম কোষটি ফাঁকা থাকতে পারে এবং তারা একই সঙ্গে দ্বিতীয়টিতে অবস্থান করতে পারে। এইভাবে সনাতন সংখ্যায়নে দুটি ফোটনের বিন্যাস চার রকমের হতে পারে।

বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন অনুসারে ওই p ও q পরস্পর পার্থক্যহীন [Indistinguishable]। ফলে তাদের আর আলাদা করে p কিংবা q সত্তা থাকে না। দুটি ফোটন তাই প্রথম কোষে কিংবা দ্বিতীয় কোষে যেমন থাকতে পারে, তেমনি এরা এক একটি কোষে অবস্থান করতে পারে। এইভাবে এই সংখ্যায়নে এদের তিন ধরনের বিন্যাস সম্ভব।

ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়নে একটি কোষে একটির বেশি ফোটন থাকতেই পারবে না এবং তারা পরস্পর পার্থক্যহীন। ফলে, দুটি ফোটন ও দুটি কোষের মধ্যে বিন্যাস কেবলমাত্র এক রকমই হতে পারে এই সংখ্যায়নে।

কণাবাদ বা কোয়ান্টাম তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে সত্যেন্দ্রনাথের অবদান অনেক। কণাবাদের স্রষ্টা প্ল্যাঙ্ক হলেও তার প্রতিষ্ঠা এবং সমৃদ্ধির মূল হোতা হলেন আইনস্টাইন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন না কণাজগতের সম্ভাব্যতায়, অনিশ্চয়তায়। আইনস্টাইন বিশ্বাস কবতেন একদিন এই সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা কণাজগৎ থেকে বিদায় নেবে এবং কার্য-কারণ সম্পর্কের ব্যাপারটা সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আশা নিয়েই তিনি জীবনের শেষ 30 বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের গবেষণায়।

একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব

আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির বিভিন্ন সত্য ব্যাখ্যা করা যাবে একটি বা খুব সামান্য কয়েকটি তত্ত্ব থেকে। তিনি বলতেন, "সমস্ত বিজ্ঞানের আসল লক্ষ্য হল যথা সম্ভব কম সংখ্যক কল্পনা বা তত্ত্ব থেকে যুক্তিপূর্ণ বিচারের দ্বারা বৃহত্তর সংখ্যক অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যাপারের নিষ্পত্তি সাধন করা।" প্রকৃতির বিভিন্নতার মধ্যে আছে এক মহৎ সমন্বয়। সেই সমন্বয় সূত্রটি খুঁজে বের করাটাই হল বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য। বহুর মধ্যে ঐক্যে ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। আইনস্টাইনের জীবনের প্রথম দিকটায় বিজ্ঞান বিশ্বের মূল উপাদান বলেছিল, মহাকাশ [Space], সময়, বস্তু, শক্তি এবং মহাকর্ষ। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে তিনি দেখালেন মহাকাশ ও সময়ের অবিচ্ছিন্নতা, সময়ের পর-নির্ভরতা, বস্তু ও শক্তির তুল্যতা। 1916 সালের পর থেকে তাঁর চেষ্টা হল চরম সূত্রটি বের করে সমস্ত বিচ্ছিন্নভাবকে একীভূত করা। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে মহাকর্ষ-তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের তত্ত্ব। ম্যাক্সওয়েল প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র। আইনস্টাইন চাইলেন, মহাকর্ষ ও তড়িচ্চুম্বকত্ব—বিশ্বের এই দুই প্রধান ব্যাপারের নিয়মাবলীকে একীভূত করতে বা এক করে ফেলতে। তাঁর মতে, মহাকর্ষ ক্ষেত্র যেমন মহাকাশ-সময়-সন্ততির বা দেশ-কাল-সন্ততির জ্যামিতিক গুণ, তেমনি তড়িচ্চুম্বক বলও ওই রকম কোন জ্যামিতিক গুণ হবে এবং দুই ক্ষেত্রকে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। তিনি বলেছেন, "মহাকাশের একটি মহাকর্ষীয় ও অপরটি তড়িচ্চুম্বকীয়—এই রকম দুটি বাস্তব বিষয়ের পরস্পরের অনন্যগত গঠন থাকতে পারে, এই কল্পনা তত্ত্বীয় জ্ঞানে মেনে নেওয়া অসম্ভব।"

1924 খ্রিস্টাব্দ। এই বছর থেকে পদার্থবিদ্যার গতি নতুন পথ ধরল। কণাবিদ্যা থেকে এল কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান [Quantum Mechanics]। নানা ধরনের মৌলিক কণা আবিষ্কৃত হতে থাকল। অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতা, চতুর্দিক ছেয়ে ফেলল। প্রকৃতির ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় সমন্বয় ও পূর্ণতা হারিয়ে গেল। 1924 সালে লুই দ্য ব্রগলি 'বস্তুতরঙ্গ' [Matter Waves] আবিষ্কার করলেন। ব্রগলি অঙ্ক কষে দেখালেন বস্তুর ভর ও বেগ জানা থাকলে সেই বস্তুর

তরঙ্গের দৈর্ঘ্য জানা যাবে।

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

যেখানে, λ = বস্তু-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য, h = প্ল্যাঙ্ক-ধ্রুবক, m = বস্তুর ভর, v = বস্তুর বেগ।

এরই কিছুটা পরে শ্রোয়েডিঙ্গার [Schroedinger] 'তরঙ্গ বলবিজ্ঞান' [Wave Mechanics] প্রকাশ করলেন। 1927 সালে হাইজেনবার্গ [Heisenberg] বললেন, কণার অবস্থান ও ভরবেগ একই সঙ্গে কখনই নির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব নয়। তিনি তাঁর এই মতবাদকে বললেন 'অনিশ্চয়তা নীতি' [Uncertainty Principle]। বস্তুর বা কণার ভরবেগের অনিশ্চয়তা Δp এবং অবস্থানের অনিশ্চয়তা Δq হলে, $\Delta p.\Delta q \approx h$, যেখানে h হল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক [Planck's Constant]। এখান থেকেই বস্তুর তরঙ্গ হল 'সম্ভাব্যতার তরঙ্গ' [Wave of Probability]। এইভাবে কণা-জগতে এল অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতা, কার্য-কারণহীনতা, বিশৃঙ্খলা। আইনস্টাইন নতুন বিজ্ঞানীদের এই সব আবিষ্কারকে অস্বীকার করতেন না, কিন্তু তিনি খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছেন সেই সত্যকে যে সত্য না জানায় কণা-জগতে এমন বিশৃঙ্খলা এসে হাজির হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন বহির্জগতের সত্য ও কণা জগতের সত্য আলাদা হতে পারে না। আসলে মূল সত্যকে না জানার জন্যই কণা জগতে এই অনিশ্চয়তা, বিশৃঙ্খলা, সম্ভাব্যতা। তিনি বিশ্বাস করতেন, নতুন কোন বিজ্ঞানী আসবেন যিনি সেই সত্য আবিষ্কার করবেন, যা বহির্জগৎ ও কণাজগতের দুই ভিন্ন সত্যকে এক করে দেবে। আপেক্ষিকতাবাদ এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা কণাবাদকে আজও মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন। আজও কণাজগতে সত্য হয়ে আছে বিশৃঙ্খলা, অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতা ইত্যাদি এবং বহির্জগতে সত্য হয়ে আছে আপেক্ষিকতাবাদ।

জীবনের শেষ ত্রিশ বছর আইনস্টাইন মৌলিক ক্ষেত্র বা শক্তিগুলি একীভূত করতেই ব্যয় করেছেন। কঠোর পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারেন নি নানা কারণে। তিনি তাঁর একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বে [Unified Field Theory] প্রথমে মহাকর্ষ ক্ষেত্রকে তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাইলেন। এদের মধ্যে সম্পর্ক বের করে একটাকে আরেকটায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করলেন। এটা সম্ভব হলে, তারপর তিনি চেয়েছিলেন, পরমাণুর কেন্দ্রকের সবল মিথস্ক্রিয়া [Strong Inter-action] এবং কেন্দ্রকের বাইরের অঞ্চলের দুর্বল মিথস্ক্রিয়া [Weak Inter-action] বল দুটিকেও ওদের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে। আইনস্টাইন প্রথম দুটিকে একীভূত করে তারপর পরমাণুর অভ্যন্তরের দুটি ক্ষেত্রের দিকে নজর দেবেন ঠিক করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল চারটি মৌলিক ক্ষেত্রকেই একীভূত করা। তিনি সারা জীবন বিশ্বাস করতেন কার্য-কারণ সম্পর্কে। অনিশ্চয়তায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। এর জন্য আইনস্টাইনকে তরুণ বিজ্ঞানীদের কাছে প্রায় একঘরে হয়ে থাকতে হয়। বোর বহুবার আইনস্টাইনকে কণাবাদের এই সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তার দিকে আনতে চেষ্টা করেন। আইনস্টাইন কার্য-কারণ সম্পর্কহীন এই পথে যেতে রাজী হন নি। অবিচ্ছিন্নতা [Continuity] এবং দ্বৈতরূপ [Duality] নিয়ে তর্কাতর্কির সময় বোর বেশ রেগেমেগেই

আইনস্টাইনকে বলেছিলেন, "আপনি কী আশা করেন? আপনি নিজে যে পদার্থবিদ্যায় আলোর দ্বৈতরূপ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই পদার্থবিদ্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে যদি উদ্বিগ্ন হন যে, আলোর একটি রূপ থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং সেটি তার তরঙ্গ রূপ হওয়াই উচিত, তবে জার্মান সরকারকে আলোকবৈদ্যুৎ সেল [Photoelectric Cell] ব্যবহার করতে বারণ করে দিন, আর যদি মনে করেন যে, আলো হল কণিকা তবে ডিফ্রাকসন গ্রেটিং [Diffraction Grating] বন্ধ করে দিন।"

জীবনের শেষ ত্রিশ বছর আইনস্টাইন অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেছেন, মৌলিক ক্ষেত্র বা বলগুলিকে একীভূত করতে। কঠোর পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করেন নি নানা কারণে। তাই বলে তাঁর 'একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্ব' [Unified Field Theory] বাতিল হয়ে যায় নি। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে আবদুস সালাম, কার্লো-রুব্বিয়া প্রমুখেরা একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্বের সত্যতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। 1955 সালের 18ই এপ্রিল আইনস্টাইন মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর 'একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্ব' বিষয়টি বিজ্ঞানীদের কাছে 'মৃত বিষয়' [Dead Subject] বলে ভাবতে শুরু করেন এবং অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এর থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন। এই সময় পদার্থবিজ্ঞানে তথা সমগ্র বিশ্বে চারটি মৌল বলের ধারণা থেকে যায়। এগুলি হল তড়িচ্চুম্বকীয় ব ল, মহাকর্ষ বল, দুর্বল বল বা দুর্বল মিথস্ক্রিয়া এবং সবল বল বা সবল মিথস্ক্রিয়া।

1979 খ্রিস্টাব্দে আবদুস সালাম, স্টিভেন ভিনবার্গ ও শেলডন গ্লাসোকে তাঁদের ইলেকট্রোউইক তত্ত্বের [Electro-Weak Theory] জন্য পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্বের দিকে তাকাবার তাগিদ অনুভব করলেন বিজ্ঞানীরা। এঁরা এঁদের ইলেকট্রোউইক তত্ত্ব [Electro-Weak-Theory] দিয়ে প্রমাণ করলেন, তড়িচ্চৌম্বক বল ও দুর্বল বল বা দুর্বল মিথস্ক্রিয়া, যা নানা ধরনের নিউক্লীয় ক্ষয় বা তেজস্ক্রিয়তার (বিটাক্ষয়) জন্য দায়ী—এক ও অভিন্ন। তাঁরা এই বলের নাম দিলেন 'ইলেকট্রোউইক বল' [Electro-Weak Force]। কোন নিউক্লিয়াস যেমন একটি বিশেষ অবস্থায় গামারশ্মি বা উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফোটন বের করতে পারে যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'গামাক্ষয়', তেমনি আরেক অবস্থায় তা ইলেকট্রন বের করে থাকে যাকে বলা হয় 'বিটাক্ষয়'। প্রথমটি ঘটে তড়িচ্চৌম্বক বলের প্রভাবে আর দ্বিতীয়টি ঘটে দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার প্রভাবে।

ইলেকট্রোউইক তত্ত্বে অপেক্ষাকৃত বিপুল ভর সম্পন্ন ডব্লিউ [W] কণা ছাড়াও আরেক ধরনের তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণার কথা ভাবা হল। তার নাম দেওয়া হল Z কণা। 1973 খ্রিস্টাব্দে নিউট্র্যাল কারেন্ট [Neutral Current] বা নিরপেক্ষ স্রোতের আবিষ্কারের পর Z-এর ধারণা পদার্থবিদ্যায় সুদৃঢ় হয়। এই $W^{\pm}$ কণা ও নিরপেক্ষ Z^0 কণার অস্তিত্ব প্রমাণের উপরই ইলেকট্রোউইক তত্ত্বের সত্যতা নির্ভর করছিল। ওই নিরপেক্ষ স্রোতের আবিষ্কার ও পরবর্তী কয়েকটি অনুকূল পরীক্ষার ফল দেখেই 1979 খ্রিস্টাব্দে সালাম-ভিনবার্গ-গ্লাসো-কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়—অনেকটা দুঃসাহসিক ভাবে। কারণ তখনও Z^0 কিংবা

$W^{\pm}$ কণার অস্তিত্ব পরীক্ষাগারে কিংবা বাস্তবে অপ্রমাণিত। W-কণা পরীক্ষাগারে পেতে হলে যে প্রচণ্ড শক্তিশালী কণা-ত্বরায়ক যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল, তা তখন ছিল না। এই কারণে গ্লাসো 'ইন্টার ন্যাশন্যাল হেরাল্ড ট্রিবিউনে' 16 ই অক্টোবর [1979] বলেই ফেললেন, "নোবেল কমিটি আমাদের পুরস্কার দিয়ে একটা চান্স নিয়েছেন। কেন না, আমাদের প্রস্তাবিত কণিকাগুলি পরীক্ষা করে দেখবার মতো কোন যন্ত্র এখনও কেউ তৈরি করতে পারেন নি।" কিন্তু তাঁদের পাঁচ বছরও অপেক্ষা করতে হল না। কার্লো রুবিবয়া ও সাইমন ভ্যানডার মির দুজনে মিলে ওঁদের স্বপ্নকে সত্যরূপ দিলেন। এঁরা দুজন $W^{\pm}$ ও Z^0 কণার অস্তিত্ব পরীক্ষাগারে ভালোভাবেই প্রমাণ করে দিলেন। এঁদেরও 1984 সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ইলেকট্রোউইক তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত হল সব দিক দিয়েই। ফলে, মৌল বল রইল তিনটি—মহাকর্ষ বল, সবল বল এবং তড়িচ্চুম্বকীয় ও দুর্বল বলের মিলিতরূপ ইলেকট্রোউইক বল।

কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান

কৃষ্ণ-বিকিরণের শক্তিবণ্টন সনাতন পদার্থবিদ্যা [Classical Physics] দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। 1900 খ্রিস্টাব্দে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক [Max Planck] 'কণাবাদ'-এর অবতারণা করে কৃষ্ণ-বিকিরণে শক্তিবণ্টন সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হন। 1905 সালে আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত আলোকবৈদ্যুৎ তত্ত্বে [Photo-Eelectric Effect Theory] এই কণাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। আলোর আপাতনে ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গমনের ব্যাখ্যায় তিনি আলোর তরঙ্গরূপের জায়গায় কণিকারূপের কল্পনা করলেন। এই ঘটনার পূর্ণ ব্যাখ্যা দিলেন তাঁর তত্ত্বে। তিনি আলোর ওই কণিকার নাম দিলেন 'ফোটন' [Photon]। প্ল্যাঙ্ক কণাবাদের জনক হলেও তাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন আইনস্টাইনই। আলোর দ্বৈত রূপ প্রতিষ্ঠিত হল বিজ্ঞান জগতে। শুধু আলো নয়, যে কোন বিকিরিত শক্তি যেমন গামা-রশ্মি ইত্যাদি সব শক্তিরই দুই রূপ পাওয়া গেল।

1924 সালে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ফোটনকে বস্তুকণার তুল্যরূপ ধরে প্ল্যাঙ্কের অতিবিখ্যাত শক্তি বণ্টন সূত্রটিকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করলেন। এই গবেষণাপত্রটিই আইনস্টাইন ডাক মারফৎ পেয়েছিলেন। আবিষ্কৃত হয়েছিল 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' যার কথা একটু অগেই বলা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের এই সংখ্যায়নের মূলে শুধু যে কণাধর্ম আছে তা নয়, এখন এই সত্য প্রতিষ্ঠিত যে ওতে তরঙ্গ-ধর্মও রয়েছে। এই তথ্যটি তাঁর নিবন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে বলা না থাকলেও পরবর্তীকালে তা প্রমাণিত হয়েছে। শক্তিপ্রবাহের মধ্যে কণাধর্ম ও তরঙ্গধর্ম যুগপৎ নিহিত আছে, এটা সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। 1924 সলের 4ঠা জুন সত্যেন্দ্রনাথ চিঠি লিখে আইনস্টাইনকে জানান তাঁর আবিষ্কারের বিবরণ। ওই সালের জুলাই মাসে সতেন্দ্রনাথের ওই প্রথম নিবন্ধটি আইনস্টাইনের দ্বারা অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয় 'ৎসাইটশ্রিফট ফুয়ের ফিজিক' [Zeitschrift fur Physik] পত্রিকায়। ওই বছরই সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় লুই দ্য ব্রগলির বিখ্যাত নিবন্ধটি।

সমস্ত শক্তির এই দ্বৈত-ভাবের চিন্তা করেই লুই দ্য ব্রগলি [Louis de Broglie] 1924 খ্রিস্টাব্দে তাঁর বস্তুতরঙ্গের মতবাদ প্রকাশ করেন। দুটি বস্তুর ভিতরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু একটি বস্তু ও শক্তির ভিতরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি খুব একটা বোধগম্য তখন ছিল না। দ্য ব্রগলি এই ব্যাপারটির পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিলেন বস্তুর তরঙ্গরূপ মতবাদে।

1924 খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর সংখ্যার 'ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন' লুই দ্য ব্রগলি নামের অখ্যাত এক তরুণ বিজ্ঞানীর একটি নিবন্ধ প্রকাশ করল। নিবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য হল বস্তুর তরঙ্গরূপের অস্তিত্ব গাণিতিকভাবে প্রমাণ করা। তিনি লিখলেন, যে কোন বস্তু, সেটি গ্রহ, পাথর, ধূলিকণা, কিংবা ইলেকট্রন যাই হোক না কেন, চলন্ত অবস্থায় বস্তুটি হবে কতকগুলি তরঙ্গের সমষ্টি। তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গগুলির মত এই বস্তুতরঙ্গগুলিও সম্পূর্ণ শূন্যস্থান দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে, এতে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। তবে এগুলি কোন সাধারণ যান্ত্রিক তরঙ্গ [Mechanical Waves] বা মাধ্যমে উৎপন্ন তরঙ্গ নয়। এই তরঙ্গের কোনও আধান নেই। বস্তুটি গতিতে থাকলেই এই তরঙ্গ উৎপন্ন হবে। তাঁর সূত্র হল, $\lambda = \frac{h}{m\upsilon}$, যেখানে, λ হল বস্তুটির তরঙ্গের দৈর্ঘ্য, h হল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, m হল বস্তুটির ভর এবং υ হল তার বেগ। সুতরাং m ও υ যত বেশি হবে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও তত কম বা ছোট হবে। ব্রগলি তার এই নিবন্ধে বললেন, বস্তু ও শক্তির পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি ভালভাবে উপলব্ধি করা যাবে যদি ইলেকট্রনকে কণিকা হিসাবে না ভেবে তাকে তরঙ্গরূপে কল্পনা করা হয়।

দ্য ব্রগলির এই নিবন্ধ প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই শ্রোয়েডিঙ্গার প্রকাশ করলেন তাঁর অতি বিখ্যাত গাণিতিক তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানে যা 'তরঙ্গ বলবিজ্ঞান' [Wave Mechanics] নামে বিখ্যাত। দ্য ব্রগলির 'বস্তু-তরঙ্গ' মতবাদের অনুরূপে বস্তু-তরঙ্গের ধারণার সুসঙ্গত গাণিতিক রূপ দিলেন তিনি। এতে এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল, যা দিয়ে প্রোটন ও ইলেকট্রনের উপর তরঙ্গধর্ম আরোপ করে কণাঘটিত ব্যাপারের উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। 1927 সালে পরীক্ষাগারে ডেভিসন-জারমার ইলেকট্রনের তরঙ্গরূপ প্রমাণ করলেন। তাঁরা আরো দেখালেন, বাস্তবে ইলেকট্রনের যে তরঙ্গ পাওয়া গেল তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দ্য ব্রগলির সূত্রানুযায়ী পাওয়া তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় এক। সুতরাং বস্তুর কঠিনত্ব আর রইল না, বস্তু থেকে পদার্থ গেল খসে। বিশ্বের রূপ দাঁড়াল তরঙ্গ সমষ্টি। সারা বিশ্বে আলাদা আলাদা পদার্থ বলে আর কিছুই রইল না। সবই এক ধরনের তরঙ্গ সমষ্টি। জগৎ হল তরঙ্গময়। তরঙ্গ ঘনত্ব যেখানে বেশি সেখানে পদার্থ, তরঙ্গ ঘনত্ব যেখানে কম সেখানে শক্তি।

পদার্থবিজ্ঞানে এই সময় দুটি অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি হল। এর একটি কণিকার তরঙ্গ [Waves of Particles] এবং অন্যটি তরঙ্গের কণিকা [Particles of Waves]। এই দুই ধারণার সমন্বয় সাধনে এগিয়ে এলেন হাইজেনবার্গ [Heisenberg] এবং ম্যাক্স বর্ন [Max

Born]। তাঁরা বললেন, "কোন পদার্থবিজ্ঞানীর পক্ষে একটি স্বতন্ত্র ইলেকট্রনের গুণাগুণ নিয়ে চিন্তা করবার কোন সার্থকতা নেই; গবেষণাগারে তাঁকে কাজ কবতে হয় ইলেকট্রন রশ্মি নিয়ে, যে সব রশ্মিতে থাকে কোটি কোটি ইলেকট্রন, তা সে কণিকা বা তরঙ্গ যেরূপেই থাকুক না কেন, বিজ্ঞানীর কোন অসুবিধা নেই, তাঁকে কাজ করতে হবে বহু সংখ্যক ইলেকট্রন নিয়ে কখনও একটি কিংবা অল্প কয়েকটি নিয়ে নয়, সে জন্য পরিসংখ্যানের তথা সংখ্যায়নের [Statistics] এবং সম্ভাব্যতার [Probablity] নিয়মাবলী মানতে হবে, যা করা হয় গ্যাসের অণুদের ক্ষেত্রে।

"আমাদের অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করতেই হবে। কারণ কোন যন্ত্র দিয়ে, সেটি বাস্তবে সম্ভবপর যত উচ্চশক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র হোক না কেন, কোন একটি ইলেকট্রনের মত ক্ষুদ্র কণিকাকে প্রত্যক্ষ কবা যাবে না।"

1927 সালে হাইজেনবার্গ দিলেন তাঁর বিখ্যাত 'অনিশ্চয়তা নীতি' [Uncertainty Principle]। তিনি বললেন, কোন একটি কণিকার গতি, অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে তার অবস্থান এবং তার বেগের পরিমাণ বা ভরবেগ একই সঙ্গে সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। পরিমাপ করা যেতে পাবে কেবল অবস্থানের এবং বেগের মানেব সম্ভাব্যতা। কোন কণিকার অবস্থান যত বেশি সঠিকভাবে নির্ণয় করা যাবে, তার বেগের মানের পরিমাপও তত বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। তেমনি, কণিকাটির বেগের মান যত বেশি সঠিকভাবে নির্ণয় করা যাবে, তার অবস্থানের বিষয়টিও তত বেশি অনিশ্চিত হবে। ফলে, কণাজগতের সব পরিমাপেই আমাদের সম্ভাব্যতা এবং অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করতে হবে। শ্রোয়েডিঙ্গারের গাণিতিকরূপ ব্যবহার করে ম্যাক্স বর্ন্ দেখালেন কণাজগতের এই তরঙ্গ 'সম্ভাব্যতার তরঙ্গ' [Waves of Prabability]। সুতরাং 'বস্তুর তরঙ্গ' হল 'সম্ভাব্যতার তরঙ্গ'। ইলেকট্রন কিংবা পরমাণুকে আমরা কণাও বলতে পারি আবার সম্ভাব্যতার তরঙ্গও বলতে পারি।

আইনস্টাইন কণা-জগতের এই সব আবিষ্কারকে অবহেলা করতেন না, কিন্তু তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন কণা-জগতের চিন্তাধারায় নিশ্চয় কোথাও গলদ রয়ে গেছে যার জন্য সত্যকে জানা যাচ্ছে না। তিনি মনে করতেন আসল সত্য একদিন জানা যাবেই। যতদিন না সে সত্য জানা যাচ্ছে ততদিন এই অনিশ্চয়তা, এই বিশৃঙ্খলা থাকবেই। বোর কয়েকবার কণাবাদ নিয়ে তথা এই নতুন মতবাদ নিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে নানা আলোচনা করেছেন। কিন্তু আইনস্টাইন তাঁর বিশ্বাস থেকে একচুলও সরেন নি। তিনি কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের কঠোর সমালোচনা করতেন। এইসব সমালোচনায় তিনি চাইতেন কণাবাদ নীতির একটা সীমা নির্দেশ করতে এবং এই সীমার বাইরে অধিকতর বৈপ্লবিক তত্ত্বাদিব আবিষ্কারের ধারণা পোষণ করতে। তাঁর সমালোচনায় কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের যে সব ভুলের কথা থাকতো, এই মতবাদের স্রষ্টারা চেষ্টা করতেন সেই ভুলগুলি শোধরাতে। ফলে, এই মতবাদ আরও উন্নততর হয়ে উঠল আইনস্টাইনের এই সমালোচনায়। আইনস্টাইন কিন্তু এই মতবাদ কখনও মেনে নেন নি। আমৃত্যু তিনি বিজ্ঞান জগতে বিচবণ

করলেন সঙ্গীহীন একাকী হয়ে। আপেক্ষিকতাবাদের আবিষ্কারের সময় তিনি যেমন সঙ্গীহীন ছিলেন, কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের রমরমার কালেও তেমনি একাকী রইলেন তিনি। তাঁর শেষ জীবনে সমকালীন তরুণ বিজ্ঞানীরা তাঁকে পথ-হারানো এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে না পারা এক বিজ্ঞানী বলেই ভাবতেন।

আইনস্টাইন জীবনের শেষ পর্যায়ে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কণাবাদ-ভিত্তিক মতবাদে কিসের অভাবে এই বিশৃঙ্খলা তার কারণ খুঁজতে লাগলেন। জীবনের শেষ 30 বছর তিনি একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে লেগে রইলেন। সাফল্য পান নি। কিন্তু সত্যের সন্ধানে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। আংশিক সাফল্য এসেছে সালামদের হাত ধরে। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান এবং আপেক্ষিকতাবাদকে মিলিয়ে ফেলতে। সাফল্য আজও আসেনি। পদার্থবিজ্ঞান আজও দ্বৈত-সত্তায়। কণাজগতে সে প্রতিষ্ঠা করেছে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান আর বহির্জগতে সে প্রতিষ্ঠা করেছে আপেক্ষিকতাবাদ।

তরুণ-বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনকে প্রবল শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর ওই একাকীত্বে বিজ্ঞানীরা ধারণা করলেন, তিনি বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না। "আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কারের সময় তাঁর যে একাকীত্বকে মনে করা হত তাঁর সমকালীন চিন্তাজগৎ থেকে অনেক দূর অগ্রগামী এক চিন্তাশীলের মনোভাব, সেই একাকীত্বকে মনে করা হতে লাগলো পথ হারিয়ে ফেলা এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অসমর্থ এক বিজ্ঞানীর বিচ্ছিন্নতা।" তিনি একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব নিয়ে একাকীই চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর সংগ্রাম। তাঁর কার্য-কারণ বিশ্বাসের সংগ্রাম। তাঁর মৃত্যুর পর বোর আরও বলেছিলেন, "আইনস্টাইন আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। আমি এই কথা আজ বলতে চাই যে, তিনি তাঁর পূর্ণতার আদর্শের জন্য অদম্য আগ্রহ, ঘটনা-তত্ত্বাবলীতে সনাতন বিজ্ঞানের নিয়মাদির প্রযুক্তি এবং সমস্ত বাস্তব বিশ্বকে জানবার একীভূত পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়াসের ভিতর দিয়ে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের অশেষ কল্যাণ করেছেন।"

চিন্তন ও মননের অপূর্ব সমন্বয়ে অনবদ্য এই মানুষটি বিংশ শতাব্দীর 'সেরা মানুষ' হিসাবে ঘোষিত হয়েছেন। তাঁর মত এক বিশাল হৃদয় এবং বিশাল মস্তিষ্কের মহাবিজ্ঞানীকে এই সম্মান জানাতে পেরে মানব জাতি ধন্য হয়েছে। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের আবিষ্কারের 100 বছর পূর্তিকে সম্মান জানাতে আন্তর্জাতিকভাবে 2005 খ্রিস্টাব্দকে ঘোষণা করা হয়েছে 'পদার্থবিজ্ঞান বর্ষ' হিসাবে। সভ্যতা যতদিন থাকবে, আইনস্টাইনও ততদিন অমর হয়ে থাকবেন।



যৌবনে নীল্‌স্‌ বোর [1885-1962]



ভাই হ্যারাল্ডের সঙ্গে বোর [1885-1962]

নীল্‌স্ বোর

[1885–1962]

বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীদের অন্যতম হলেন নীল্‌স্ বোর। কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অসামান্য। তিনিই পরমাণু গঠনের সর্বাধুনিক ব্যাখ্যা দেন প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে। বোরের এই পরমাণু-মডেল যদিও পরবর্তীকালে বহু পরিবর্তিত হয়ে অন্য রূপ নেয়, তবু তাঁর ওই মডেল পরমাণুর অভ্যন্তরের নানা ঘটনার অনেকগুলির যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়। এছাড়া মন্দগামী নিউট্রনের [Neutron] সাহায্যে ইউরেনিয়াম–235 [Uranium· 235]-এর কেন্দ্রকের [Nucleus] বিভাজন যে সম্ভব সে কথা তিনিই প্রথম বলেন। বোরের এইমত অনুসরণ করে কিছুদিন পরে অধ্যাপিকা লিজে মাইটনার [Lise Meitner], অটো হান [Otto Han] প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়াম-235 পরমাণু বিভাজনে সমর্থ হন। ফলে, বিশ্বজুড়ে প্রবল আলোড়ন শুরু হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই পরমাণুর দুটি রূপ মানুষের সামনে প্রতিভাত হয়। একটি পরমাণুর ধ্বংসাত্মক রূপ এবং অন্যটি তার কল্যাণকারী রূপ। পরমাণুর এই দুই রূপে আবির্ভূত হওয়ার পিছনে যাঁদের অবদান আছে নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী নীল্‌স্ বোর তাঁদের অন্যতম।

তাঁর পুরো নাম নীল্‌স্ হেনরিক ডেভিড বোর [Niels Henrik David Bohr]। ডেনমার্কের এই পদার্থবিজ্ঞানী বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের অন্যতম। পদার্থবিজ্ঞানে দশজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের নাম করলে তাঁর নাম সে তালিকায় অবশ্যই আসে। পরমাণুর গঠনতত্ত্বের আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর তত্ত্ব বা বোরের তত্ত্ব [Bohr's Theory] থেকে পারমাণবিক গঠন ও বিক্রিয়া বোঝাতে বা ব্যাখ্যা করতে পারা যায়। এছাড়া পরমাণু বিভাজনের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। এই সব আলোচনায় একটু পরেই আসছি।

1885 খ্রিস্টাব্দের 7ই অক্টোবর কোপেনহেগেন শহরে বোর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ক্রীশ্চিয়ান বোর [Christian Bohr] ছিলেন কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং নামকরা শারীরতত্ত্ববিদ। তাঁর মা এলেন অ্যাডলার [Ellen Adler] ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা। অ্যাডলারের পিতার পরিবারের শিক্ষা-ক্ষেত্রে অবদান ছিল অসামান্য। ক্রীশ্চিয়ান বোর 1880 সালে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীরতত্ত্ব বিদ্যায় ডক্টরেট লাভ করেন। 1881 সালে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Privatdozent' পদে যোগ দেন। এই বছরের শেষের দিকে তিনি এলেন অ্যাডলারকে বিয়ে করেন। এলেনের পিতা ডেভিড অ্যাডলার [David Adler] ছিলেন ইহুদী রাজনীতিবিদ। ডেনমার্কের রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক মহলে ডেভিড ছিলেন খুবই নামকরা লোক। তাঁর বিশাল অট্টালিকা ছিল ক্রীশ্চিয়ানসবর্গ দুর্গের [Christiansborg Castle] বিপরীত দিকে। এই দুর্গের মধ্যেই বসত ডেনমার্কের

পার্লামেন্ট। ডেভিডের ওই প্রাসাদোপম গৃহেই এলেন 1883 সালে জন্ম দেন জেনি-কে [Jenny]। এই জেনি হলেন নীল্‌স্ বোরের দিদি। এলেনের মা তাঁদের ওই বিশাল বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। এলেন সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় বাপের বাড়িতে এসে কিছুদিন থাকেন। এখানেই 1883 সালে জন্মান জেনি। এরপর 1885 সালের 7 ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন নীল্‌স্ বোর। ওই দিনটি আবার এলেনের জন্মদিনও। অর্থাৎ নীল্‌স্ বোর এবং তাঁর মায়ের উভয়েরই জন্মদিন ছিল 7 ই অক্টোবর। এলেনের 25-তম জন্মদিনে নীল্‌স্ বোর জন্মগ্রহণ করেন ডেভিড অ্যাডলারের ওই প্রাসাদোপম বাড়িটিতে। নীল্‌স্ বোরের ভাই হ্যারল্ডের জন্মও তাঁর দাদামশায়ের ওই অট্টালিকায়।

সুতরাং নীল্‌স্ বোরেরা ছিলেন দু'ভাই এবং এক বোন। বোন ছিলেন সবার বড়, নীল্‌স্ মধ্যম এবং হ্যারল্ড ছোট। ভাইবোনদের প্রত্যেকেরই লেখাপড়া সম্পন্ন হয়েছিল মা এলেনের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু ছেলেবেলায় নীল্‌স্-এর তেমন প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়নি। ছোট ভাই হ্যারল্ডই ছিলেন তাঁর চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান। তাই সেই বাল্যকাল থেকেই নীল্‌স্ বোর ভাইয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীর মর্যাদা লাভ করা সত্ত্বেও ভাইয়ের পরামর্শ তিনি সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করতেন। ভায়ে ভায়ে এমন সম্প্রীতি কদাচিৎ দেখা যায়।

যাইহোক, নীল্‌সের জন্মের কয়েক মাস পরেই তাঁর বাবা ক্রীশ্চিয়ান কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপক পিটার পানুম-এর [Peter Panum] মৃত্যুতে ওই পদটি খালি হয়। ওই পদে ক্রীশ্চিয়ান যোগ দেন। এর কয়েকদিন পরে এলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে অধ্যাপকদের জন্য নির্দিষ্ট কোয়ার্টারে চলে আসেন। এখানেই এলেনের তত্ত্বাবধানে ছেলেমেয়েরা বড় হতে থাকে। অধ্যাপক পিতাও তাতে সহযোগিতা করতে থাকেন।

ফলে, উচ্চ শিক্ষিত এই দম্পতির কোলে বোর তাঁর ভাই হ্যারল্ডের [Harald] সঙ্গে বড় হতে লাগলেন। এই বুদ্ধিজীবী ও উচ্চশিক্ষার আবহাওয়ায় এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধ সামাজিক পরিবেশে বোর এবং অনুকূল পরিবেশে বোরের প্রতিভা লালিত হতে থাকে সুচারুভাবেই। পরে তাঁর ভাই হ্যারল্ডও এককালে বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ হয়ে ওঠেন। প্রতিভাবান পিতামাতা এবং অনুকূল পরিবেশে বোরের প্রতিভা বিকশিত হয়ে ওঠে।

ছেলেবেলায় নীল্‌স্ বোর ও তাঁর ভাইবোনেদের লালন-পালন প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার কেনেডি [Kennedy] লিখেছেন ঃ

"Niels, Harald, and their older sister, Jenny, grew up in a cultured and stimulating home. From their earliest days they were exposed to a world of ideas and discussion, of conflicting views rationally and good-temperedly examined, and they developed a respect for all who seek deeper knowledge and understanding."

ছেলেবেলায় নীল্‌স্ বোরেব কারিগরি বিদ্যায় অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। বলা হয়, একবার ঘরের একটি সাইকেল হঠাৎ বিকল হয়ে যাওয়ায় বালক বোর সাইকেল মেরামতির কারখানায়

না পাঠিয়ে নিজেই মেরামত করে ফেলেছিলেন। ছোটখাট যন্ত্রপাতিগুলি তিনি নিজ হাতে তৈরি করতে পারতেন। এই কারণে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পর তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান পড়ার জন্য ভর্তি কবা হয়। ছাত্র জীবনে নীল্‌স্ বোর যদিও বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারেননি তবুও ছাত্র হিসাবে তিনি নিতান্ত মন্দ ছিলেন না।

1891 সালে নীল্‌স্‌কে ভর্তি করা হয় গ্রামেলহোলমস্ [Grammelholms] স্কুলে। এই স্কুলে তাঁর ভাই হ্যারল্ডকেও ভর্তি করা হয়। বোবের স্কুলের পড়াশুনা শেষ হয় 1905 সালে। স্কুলের পরীক্ষাগুলিতে তিনি মোটামুটি ভাল ফলই করেন। তবে কোন বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। ক্লাসের জনা কুড়ি ছাত্রের মধ্যে তিনি প্রায়শঃই তৃতীয় কিংবা চতুর্থ স্থান লাভ করতেন। কখনও প্রথম হননি। কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি স্কুলজীবনে সেরা ছিলেন, সেটা শারীর-শিক্ষা [Physical Education]। তিনি খুব ভালো ফুটবল খেলতে পারতেন, কিন্তু তাঁর ভাই হ্যারল্ড তাঁর চেয়েও ভালো ফুটবল খেলতেন। হ্যারল্ড ডেনমার্কের হয়ে ফুটবল খেলে একটা রৌপ্য পদকও পেয়েছিলেন। স্কুলজীবনে নীল্‌সের কয়েকজন ভালো বন্ধু হয়েছিল। তাঁর সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিল তাঁব ভাই হ্যারল্ড। সারা জীবন দুই ভাইয়ের এই বন্ধুত্ব বজায় ছিল।

স্কুলের শেষ দু'বছর তিনি অঙ্ক এবং পদার্থবিদ্যা নিয়ে বিশেষভাবে পড়াশুনা করেন। স্কুলের মাস্টারমশাইরা এই দুটি বিষয়ে নীল্‌স্‌কে ভয় পেতে শুরু করেন তাঁর নানা প্রশ্নের জন্য। এই সময় নীল্‌স্ তাঁর পাঠ্যসূচীর চেয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁব বাবার উৎসাহে। অনেকটা পরে 1922 সালে তিনি লিখেছিলেন ঃ

"My interest in the study of physics was awakened while I was still in school, largely owing to the influence of my father".

1903 খ্রিস্টাব্দে নীল্‌স্ বোর কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাঁর মুখ্য বিষয় ছিল পদার্থবিদ্যা। অন্যান্য বিষয় হল গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও রসায়ন।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনার সময় বোর দু'জন অধ্যাপকের প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন। এঁরা হলেন— ক্রীশ্চিয়ান ক্রীশ্চিয়ানসেন [Christian Christiansen] এবং হ্যারল্ড হফডিং [Harald Hoffding]। এঁরা দুজনেই ছিলেন বোরের বাবাব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ক্রীশ্চিয়ানসেন ছিলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এবং হফডিং ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক। উভয়েই ছিলেন উদারমনা, অনুসন্ধিৎসু এবং গভীব জ্ঞানের অধিকারী। এঁরা দু'জনেই নিজ নিজ বিষয়ে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে দিকপাল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ওই দুই অধ্যাপক বোরকে তাঁর পঠন-পাঠনে অকুণ্ঠ সাহায্য করেন। বোরের প্রতিভা বিকাশে এঁদের অবদান অসামান্য। বোরকে গণিত পড়াতেন অধ্যাপক থোরভ্যাল্ড থিয়েলে [Thorvald Thiele]। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরীক্ষাগার ছিল না পদার্থবিজ্ঞানের। নীল্‌স্ তাঁর ভাইকে নিয়ে তাঁদের বাবার শারীরবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন নীল্‌স্ স্বয়ং এবং তারপর ফলাফল বলে যেতেন। আর ভাই হ্যাবল্ড তা লিখতেন। তাঁদের এক বন্ধু এই সময়ের ঘটনার কথা লিখে মন্তব্য

করেছেন, "The two are inseparable. I have never known people to be as close as they are."

1907 সালে জলের পৃষ্ঠটান [Surface Tension] নিয়ে এককভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বোর ড্যানিশ অ্যাকডেমি অব সায়েন্সেস অ্যান্ড লেটার্স-এর [Danish Academy of Sciences and Letters] স্বর্ণপদক পান। এই পুরস্কারটি ছিল 1906 সালের জন্য নির্দিষ্ট পুরস্কার। 1909 সালে তিনি কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি পদার্থের ইলেকট্রন তত্ত্ব নিয়ে থিসিস তৈরি করেন 1911 সালে ডক্টরেটের জন্য। এরপর কিছুদিনের জন্য তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে ম্যানচেস্টারে যান। সে সময় ম্যানচেস্টারে ছিলেন আর্নেস্ট রাদারফোর্ড [Ernest Rutherford]। বোর তাঁর কাছে 1912 থেকে 1916 সাল অবধি এই পাঁচ বছর পড়াশুনা করেন। এই সময়ই পরমাণু মডেল সংক্রান্ত তাঁর নিজস্ব ধারণা দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। 1911 সালে রাদারফোর্ড পরমাণুর কেন্দ্রক আবিষ্কার করেন। এই কেন্দ্রককে রেখেই বোর তাঁর নিজস্ব ধারণার পরমাণু মডেল বানাতে শুরু করেন। এই ধারণাগুলি থেকে 1913 খ্রিস্টাব্দে এ সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত গবেষণাপত্রগুলি জন্ম নেয়। পরবর্তী গবেষণাপত্রগুলির মধ্যেও এইসব ধারণার প্রতিফলন দেখা যায়।

1911 সালের মে মাসে তিনি ডক্টরেট হন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ইলেকট্রন তত্ত্ব। তাঁর গবেষণাপত্রের নাম ছিল, "Studies on the electron theory of metals"। এই কাজটি তিনি করেছিলেন সনাতন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। ফলে, অনেক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারলেন না তাঁর ওই গবেষণাপত্রে। তবু বেশ কিছু ঘটনার নতুন সমাধান থাকায় তিনি ওই গবেষণাপত্রের জন্য ডক্টরেট পান। তিনি পরবর্তীকালে নিজেই এই কাজটি সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"It does not seem at the present stage of the development of the electron theory to explain the magnetic properties of bodies from this theory."

বোর এই গবেষণাপত্রটি উৎসর্গ করেন তাঁর পিতার উদ্দেশে। তাঁর বাবা হৃদরোগে মারা যান 1911 সালে ফেব্রুয়ারী মাসে।

1912 সালের 1 লা আগস্ট বোর বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী মার্গ্রেটে নোরলান্ড [Margrethe Norlund]। স্ত্রী হিসাবে তিনি ছিলেন বোরের অত্যন্ত উপযুক্ত। বোরকে তিনি নানাভাবে সাহায্য করতেন। এমনকি বোরের গবেষণার কাজেও তিনি সাধ্যমত সাহায্য করতেন। তাঁদের মোট ছয়টি সন্তান। দুটি সন্তান অকালেই মারা যায়। বাকী চারজনই আপন আপন কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতী হয়ে ওঠেন। তাঁর এক সন্তান ওই গবেষণা সংস্থার ডিরেক্টরও হন পরবর্তীকালে। বোরের স্ত্রীভাগ্যও অত্যন্ত ভালো ছিল। এ সম্পর্কে Richard Courant লিখেছেন ঃ

"Some people have speculated about the lucky circumstances which combined to make Niels so successful. I think the ingredients of his life were by no means matters of chance but deeply ingrained in the structure of his

personality....It was not luck, rather deep insight, which led him to find in young years his wife, who, as we all know, had such a decisive role in making his whole scientific and personal activity possible and harmonious."

1911 সালের মে মাসে বোর কার্লসবার্গ ফাউন্ডেশনের [Carlsberg Foundation] কাছে দেশের বাইরে গিয়ে পড়বার জন্য অনুদান চান। 1911 সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওই ফাউন্ডেশনের অনুদানেই তিনি ইংল্যান্ড যান জে. জে. থমসনের [J. J. Thomson] কাছে গবেষণার জন্য। থমসন থাকতেন কেম্‌ব্রিজে। বোর সেখানে গেলেন। কিন্তু থমসনের সঙ্গে কাজ করতে তাঁর ভালো লাগলো না। কেম্ব্রিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা হল আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের [Ernest Rutherford]। রাদারফোর্ডকে তাঁর খুব ভালো লাগলো। তিনি তাঁর গবেষণার পুরো সময়টাই রাদারফোর্ডের সঙ্গে কাটাতে চাইলেন। রাদারফোর্ড রাজী হলেন। বোর চলে গেলেন ম্যাঞ্চেস্টারের ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এখন ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়। 1912 সালের মার্চ মাসে বোর ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান রাদারফোর্ডের অধীনে গবেষণার জন্য। বোরের কাছে রাদারফোর্ড হয়ে উঠলেন আদর্শ অধ্যাপক তথা 'গুরু'।

বোরের কেম্ব্রিজ যাওয়া এবং ক্যাভেন্ডিস গবেষণাগার ছেড়ে ম্যাঞ্চেস্টারে উপস্থিত হওয়া নিয়ে বলা হয়েছে ঃ

"পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভের পর বোর উচ্চতর গবেষণার জন্য লন্ডন যাত্রা করেন। সেখানে তখন গবেষণায় রত ছিলেন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্যার জোসেফ জন থমসন। বোর তাঁর কাছে ক্যাভেন্ডিস গবেষণাগারে বেশ কিছুকাল গবেষণা করেন। তারপর তিনি সদ্য আবিষ্কৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থের দিকে আকর্ষণ বোধ করেন। তখনকার দিনে তেজস্ক্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে গবেষণা করে জগৎজোড়া সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন রাদারফোর্ড। কিন্তু রাদারফোর্ড সে সময় গবেষণা করতেন ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে। গাইগার, চ্যাডউইক, মোসলে, পউলি প্রভৃতি বিজ্ঞানীরাও এসে মিলিত হয়েছেন রাদারফোর্ডের কাছে। রাদারফোর্ডের জন্য ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় তখন একরকম বিজ্ঞানের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বোর সে সুযোগ পরিত্যাগ করলেন না। থমসনের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে পরমাণুবিজ্ঞানের জনক রাদারফোর্ডের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁর সুন্দর ব্যবহার, বিনয়নম্র বচন, অজানাকে জানার দুর্বার কৌতূহল, সর্বোপরি গবেষণার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা দুদিনেই গুরুদেবের চিত্তকে জয় করে নিল। নীল্‌স্ বোর হয়ে উঠলেন রাদারফোর্ডের সর্বাধিক প্রিয় শিষ্য।"

বোর 1912 সালের মার্চ মাসে রাদারফোর্ডের অধীনে গবেষণা শুরু করেন। 1912 সালের 12 ই জুন বোর তাঁর ভাই হ্যারল্ডকে লিখেছিলেন ঃ

"You can imagine it is fine to be here, where there are so many people to talk with...and this with those, who know most about these things and Professor Rutherford takes such a lively interest in all that he believes there is something in it. In the last years he has worked out a theory of the structure of atoms,

which seems to be quite a bit more firmly founded than anything which has existed upto now."

আবার ওই মাসেই অর্থাৎ জুন মাসের 19 তারিখে তিনি লেখেন ঃ

"Perhaps I have found out a little about the structure of atoms. Don't talk about it to anyone, for otherwise I couldn't write to you about it so soon. ... You understand that I may yet be wrong ; for it hasn't been worked out fully yet (but I don't think it's wrong). ...Believe me, I am eager to finish it in a hurry, and to do so I have taken a couple of days off from the laboratory (this is also a secret)."

আবার মাসখানেক পরে 13 ই জুলাই তিনি ভাইকে লিখেছিলেন ঃ

"Things are going rather well, for I beleive I have found out a few things; but, to be sure, I have not been so quick to work them out as I was stupitd to think. I hope to have a little paper ready and to show it to Rutherford before I leave, and I therefore am so busy, so busy."

বোরের সঙ্গে রাদারফোর্ডের সম্পর্ক ছিল শিষ্যের সঙ্গে গুরুর। রাদারফোর্ড এই গুরু শিষ্য সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন 1937 খ্রিস্টাব্দ অবধি অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুদিন অবধি।

1912 সালের 24 শে জুলাই। বোরের গবেষণা তখনও শেষ হয় নি। কিন্তু ম্যাঞ্চেস্টার ছেড়ে তিনি কোপেনহেগেন চলে এলেন তাঁর গবেষণা শেষ করার জন্য। 1913 খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর পরমাণু-তত্ত্ব সংক্রান্ত তিনটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। প্রথম পত্রটি ছিল হাইড্রোজেন পরমাণু সংক্রান্ত এবং অন্য দুটি গবেষণাপত্র ছিল অন্যান্য ভারী পরমাণুদের নিয়ে। প্ল্যাঙ্কের কণাবাদ ও আইনস্টাইনের আলোকবৈদ্যুৎ ক্রিয়া তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে বোর তাঁর এই তিনটি গবেষণাপত্রে প্রকাশ করলেন নতুন পরমাণু মডেল। বোরের এই পরমাণু মডেল সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"...set out his startling attempt to combine aspects of classical physics with the concept of Planck's quantum of action. ...The three famous papers .. formed the foundation of Bohr's early reputaton. His work, although not immediately accepted by everyone, intrigued his contemporaries and made them aware of the need for a new way of describing events at atomic level. The Bohr atom, although it has been superseded scientifically, persists even today in the minds of many people as a vivid image of what atoms look like and a symbol of physics."

1913 সালের জুলাই মাসে বোর কোপেনহেগেনের 'Docent' নিযুক্ত হন। 1914 সালের 10 ই মার্চ বোর ডেনমার্কের শিক্ষাদপ্তরকে অনুরোধ করেন কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের একটা পদ সৃষ্টি করতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি রাজী হলেও শিক্ষাদপ্তর এই নিয়ে টালবাহানা করতে থাকে। কিন্তু বোরের প্রস্তাবকে তাঁরা একেবারে নাকচ করে দিতে পারলো না। ফলে ব্যাপারটা ঝুলে রইল। ইতিমধ্যে, রাদারফোর্ড আবার বোরকে ডেকে পাঠালেন এক বছরের জন্য। বোর যখন টাইরোল-এ [Tyrol] ছুটি কাটাচ্ছিলেন সেই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ম্যাঞ্চেস্টারে যাওয়ার ব্যাপারটা খুবই

দুরূহ হয়ে পড়ে। তবুও বোর স্কটল্যান্ডের উত্তর দিক দিয়ে বহু কষ্টে, ঝড়-ঝাপ্টা সহ্য করে সস্ত্রীক রাদারফোর্ডের কাছে উপস্থিত হন 1914 সালের অক্টোবর মাসে।

ম্যাঞ্চেস্টারে বোর দেড় বছরেরও বেশি সময় কাটান। 1916 সালের এপ্রিল মাস অবধি কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি না হওয়ায় বোর রাদারফোর্ডের কাছেই থেকে যান। এরপর 1916 সালে বোর ম্যানচেস্টার ছেড়ে কোপেনহেগেনে ফিরে আসেন। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। পরবর্তীকালে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর জন্য একটা বিশেষ বিভাগ খোলা হয় কেবলমাত্র তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য। এই বিভাগ বা সংস্থার ডিরেক্টর হিসাবে বোর তাঁর সমস্ত গবেষক জীবনটাই অতিবাহিত করেন।

1912 সালে বোর গবেষণা সমাপ্ত করার জন্য কোপেনহেগেন ফিরে এসেছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার ছেড়ে। তখন তিনি এতোটা খ্যাত হন নি। কিন্তু 1916 সালে যখন তিনি কোপেনহেগেনে আবার ফিরে এলেন তখন তিনি খ্যাতিমান। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "In the early summer of 1916 the Bohrs returned to Denmark. Four years earlier Bohr had left Manchester full of exciting but undigested ideas about the atom Now he departed as the master of that field, professor in Copenhagen, his wife who was expecting their first child at his side"

1917 সালে বোর ড্যানিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের [Danish Academy of Sciences] সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি কোপেনহেগেনে 'Institute of Theoretical Physics' করার উদ্যোগ নিলেন। তাঁর জন্য তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের ওই ইনস্টিটিউট খোলা হয়। তিনি তাঁর ডিরেক্টার হন এবং সারাজীবন ওই পদে আসীন থাকেন।

"That Institute soon became a Mecca for theorical physicists from all over the world, and after 1933 a refuge for a good many scientists who had fled from Hitler's Germany. Their social centre was the mansion "Gamle Carlsberg", given to the nation by the founder of the well-known brewery and placed at Niels Bohr's disposal in 1932. Here, under the motherly care of Bohr's beautiful wife, Margrethe .. students and scholars of all nations gathered to eat and talk and listen to music, and often to sit quite literally at the feet of Bohr, trying to catch his challenging remarks, subtle comments and gentle jokes, spoken in his soft Danish voice."

এই সময় হল্যান্ডের তরুণ বিজ্ঞানী ক্র্যামারস [H. A. Kramers] বোরের কাছে আসেন গবেষণা করার জন্য। তিনি বোরকে ওই গবেষণাগারটিকে উন্নত করতে নানাভাবে সাহায্য করেন। ক্র্যামারসের সহযোগিতায় বোর তাঁর নিজের গবেষণাগারটির প্রভূত উন্নতি ঘটান। বোর ও ক্র্যামারস্ মিলে একটা গবেষণাপত্রও প্রকাশ করেন 'অন দি কোয়ান্টাম থিওরি অফ লাইন স্পেকট্রা' [On the Quantum Theory of Line Spectra] শিরোনামে।

পরমাণু গঠন সংক্রান্ত আবিষ্কার 1922 খ্রিস্টাব্দে বোরকে নোবেল পুরস্কারের সম্মান এনে দেয়। ফলে ওই সময় থেকে তাঁর কাজকর্ম ভীষণভাবে বেড়ে যায়। তা সত্ত্বেও তিনি

সব কাজই যথেষ্ট দক্ষতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গেই করতে থাকেন। সমস্ত কাজেই ছিল তাঁর প্রবল আন্তরিকতা। তাঁর মননশীলতা ও জ্ঞান তাঁকে যেমন বিজ্ঞানের সেরা সম্মানে এনে দেয়, তেমনি নিজের দেশে তিনি হয়ে ওঠেন নেতৃস্থানীয়। 1917 সালে তিনি ড্যানিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস অ্যান্ড লেটারসের সদস্য নির্বাচিত হন। 1939 সালে তিনি এর প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। সারাজীবন তিনি ওই পদে বৃত ছিলেন। 1962 সালের 18 নভেম্বর অবধি অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি ওই পদ অলঙ্কৃত করেন। 1955 সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Danish Atomic Energy Commission এবং 1957 খ্রীস্টাব্দে Nordic Institute for Theoretical Atomic Physis-এর প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশেষ উদ্যোগ নেন। শেষোক্ত এই সংস্থাটিতে পাঁচটি Nordic দেশেরই যুগ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা রাখা হয়। এই দুটি সংস্থারই ডিরেক্টর ছিলেন বোর। পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বীয় গবেষণায় পাঁচটি দেশের যৌথ উদ্যোগ এবং পাঁচটি দেশেরই একসঙ্গে গবেষণার ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং উদার মানসিকতার ফলেই।

সে যাইহোক, বোরের ওই নব-নির্মিত ইনস্টিটিউটের নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিলো তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এরপর ওখানে খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদের ভিড় জমতে থাকে। 1923 খ্রিস্টাব্দে এখানে হাইজেনবার্গ [Heisenberg] আসেন বোরের অধীনে কাজ করতে। এরপর 1926 সালে আসেন শ্রোয়েডিঙ্গার। হাইজেনবার্গ এবং শ্রোয়েডিঙ্গার উভয়েই পরে নোবেল পুরস্কার পান। হাইজেনবার্গ নোবেল পুরস্কার পান তাঁর 'অনিশ্চয়তা নীতি'-র জন্য এবং শ্রোয়েডিঙ্গার নোবেল পুরস্কার পান তাঁর 'তরঙ্গ বলবিজ্ঞান'-এর জন্য। কোয়ান্টামতত্ত্বের কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে রূপান্তরণ ঘটেছিল এই সব বিজ্ঞানীদের হাতেই।

1923 সালে বোর তাঁর 'Quantum Theory of Line Spectra' গবেষণাপত্রের তৃতীয় সংখ্যাটি প্রকাশ করে লিখেছিলেন ঃ

"Notwithstanding the fundamental departure form the ideas of the classical theories of mechanics and electrodynamics involved in these postulates, it has been possible to trace a connection between the radiation emitted by the atom and the motion of the particles which exhibits a far-reaching analogy to that claimed by the classical ideas of the origin of radiation."

1924 সালে বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন আবিষ্কৃত হওয়া থেকে চলমানতা পায় কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। ওই বছরই প্রকাশিত হয় ব্রগলির 'বস্তুতরঙ্গ তত্ত্ব'। 1925 সালে হাইজেনবার্গ দিলেন 'ম্যাট্রিকস বলবিজ্ঞান' বা 'কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান'। 1926 সালে শ্রোয়েডিঙ্গার বললেন 'তরঙ্গ বলবিজ্ঞান'-এর সমীকরণসমূহের কথা। 1927 সালে হাইজেনবার্গ প্রকাশ করলেন তাঁর 'অনিশ্চয়তা নীতি'। এইভাবে গড়ে উঠলো কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। 1927 সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর ইতালির কোমো [Como] শহরে এক সভায় বোর হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির ভৌতিক ব্যাখ্যা [Physical Interpretation] দেন। এই নীতির পরিপূরকতার নানান কথা বলেন তিনি। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান পরিপূর্ণতা

পেতে থাকে তাঁর 'অনুপূরকতা নীতি'-তে [Principle of Complementarity]। তিনি এরপর আমৃত্যু এই অনুপূরকতা নীতিতে বিশ্বাস করতেন। 1962 সাল অবধি তাঁর বাকী 35 বছরের জীবনে তিনি এই অনুপূরকতা নীতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। শুধু কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে নয়, তিনি মনে করতেন এই নীতি জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা এবং জ্ঞানতত্ত্বেও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। অনেকে মনে করেন, বোরের এই ধরনের ধারণার পিছনে প্রভাব ছিল তাঁর বাবার এবং কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক হ্যারল্ড হফডিং-এর। বোরের অজান্তেই সম্ভবত হফডিং-এর দার্শনিকতা তাঁর চিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর বোরের এই ধারণা আইনস্টাইন কখনই মেনে নিতে পারেন নি। তিনি সারাজীবন কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতার বিরোধী ছিলেন। বলতেন, 'ঈশ্বর পাশা খেলেন না।' বোরের সঙ্গে আইনস্টাইন ও এহ্‌রেনফেস্টের কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান নিয়ে বহুবার আলোচনা হয়েছে। বোরের মতবাদ যুক্তির দিক থেকে সে সময় অনেকটাই সত্য বলে প্রতিপন্ন হলেও আইনস্টাইন তা মেনে নিতে পারেন নি, কারণ আইনস্টাইন কার্য-কারণ সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন সারাটা জীবন—অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না।

বোর তাঁর মতবাদ হিসাবে বলতেন ঃ

"Evident obtained under different experimental conditions cannot be comprehended within a single picture, but must be regarded as complementary in the sense that only the totality of the phenomena exhausts the possible information about the objects."

1920 সালে বোর পর্যায়-সারণির [Periodic Table] তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা দিলেন কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসরণ করে। 1936 সালে তিনি পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের নতুন তত্ত্বে বললেন, নিউক্লিয়াসের যৌগ গঠনের কথা। 1939 সালে ইউরেনিয়াম-235 -এর বিভাজন সম্ভব হয়েছিলো বোরের পরমাণুকেন্দ্রকগুলির সম্পর্কে এই নতুন ব্যাখ্যায়। 1935 সালেই বোর পরমাণুর কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস নিয়ে গবেষণা শুরু করেন কোপেনহেগেনে। তরুণ বিজ্ঞানীদের তিনি উৎসাহিত করতে থাকেন পরমাণুর কেন্দ্রক নিয়ে গবেষণা করার জন্য। অনেক বিজ্ঞানী এই সময় বোরের অধীনে পরমাণুর কেন্দ্রক নিয়ে কাজ করতে থাকেন। এরপর 1936 সালে তাঁর দেওয়া 'Liquid Drop Nuclear Model' পরমাণুর নিউক্লীয় বিভাজনের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছিল।

1937 সালে বোর স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আমেরিকা, জাপান, চিন, সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ করেন। ওই বছর রাদারফোর্ড মারা যান। বোর লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে-তে গুরুর শোকসভায় যোগ দিয়ে বলেছিলেন ঃ

"When I first had the privilege of working under his personal inspiration he was already a physicist of the greatest renown, but nevertheless he was then, and always remained, open to listen to what a young man had on his mind. ...

The thought of him will always be to us an invaluable source of encouragement and fortitude."

বোর ছিলেন খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী। কিন্তু তাঁর মায়ের দিক থেকে তিনি ছিলেন ইহুদী। তাই 1940 সালে হিটলার ডেনমার্ক অধিকার করার পর থেকেই কোপেনহেগেনে বোরের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। 1943 সালে হিটলার বোরের গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারী করে। আগেভাগেই তা জানতে পেরে 1943 সালেই বোর ডেনমার্ক ত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গে যান রসায়ন বিজ্ঞানী জর্জ হেভিসি, স্ত্রী মার্গ্রেটে, ছোট ভাই হ্যারল্ড ও তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ের বিরাট দল।

রাত্রির অন্ধকারেই বোররা সপরিবারে ডেনমার্কের সীমানা পেরিয়ে প্রবেশ করলেন সুইডেনে। তারপর সেখান তেকে তাঁরা যাত্রা করলেন লন্ডনে। অবশেষে সাগর পেরিয়ে উপস্থিত হলেন আমেরিকায়। শোনা যায়, জার্মানরা নীল্‌স্ বোরের পলায়ন বন্ধ করার জন্য চেষ্টার কোন ক্রুটি করেন নি। তবুও সবার চোখে ধুলো দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর ডেনমার্ক পরিত্যাগের পর জার্মানরা কোপেনহেগেনের তাঁর নিজস্ব গবেষণাগার "ইন্‌স্টিটিউট ফর থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স"-এ এসে হানা দেয় এবং নীল্‌স্ বোরের সহকর্মী ডঃ বোয়েগিল্ডকে একটা ঘরে সাতদিন তালাচাবি বন্ধ করে আটক করে রাখে। পরে বোরের গবেষণাগারটিকে কোন একজন বিশিষ্ট জার্মান বিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোন বিজ্ঞানীই তাতে সম্মত হন নি।

এরপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে ডেকে পাঠায় পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র যাঁরা তৈরি করছিলেন সে দেশে তাঁদের সঙ্গে আলোচনার জন্য। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র মানবসভ্যতার কী ভীষণ বিপদ ডেকে আনবে। তিনি একদিকে যেমন সর্বাত্মক ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতায় ভীত হয়ে পড়েন তেমনি তিনি ঘোষণা করেন, এই সব পারমাণবিক অস্ত্রের আবিষ্কার ভবিষ্যৎ যুদ্ধগুলিকে অসম্ভবের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি যুদ্ধবিরোধী ছিলেন মনেপ্রাণে। সর্বোপরি তিনি ছিলেন মুক্ত-বিশ্বে বিশ্বাসী।

1950 সালে কোরিয়ার যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে যে আবেদন পাঠান তার মূল বক্তব্যই ছিল, দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস অটুট রাখতে তাদের মধ্যে সংবাদ ও তথ্যের আদান-প্রদান খোলাখুলিভাবে করতে হবে। কোনও প্রকার বিধিনিষেধ যেন না থাকে পারস্পরিক তথ্য ও সংবাদ আদান-প্রদানে। এছাড়া দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও বাড়াতে হবে। তাঁর এই উদার মনোভাব এবং বিজ্ঞান জগতে তাঁর অগাধ অবদান, বিশ্বজোড়া খ্যাতি, সম্মান ও ভালোবাসার আসনে তাঁকে বসিয়েছে।

1944 সাল থেকেই তিনি যুদ্ধ বন্ধের জন্য চার্চিল এবং রুজভেল্টকে অনেকবারই অনুরোধ করেন। তাঁদের তিনি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিবেশে তৈরি করার আবেদন জানান। 1950 সালে তিনি রাষ্ট্রসংঘকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে ছিল ঃ

"Humanity will be confronted with dangers of unprecedented character unless, in due time, measures can be taken to forestall a disastrous competition

in such formidable armaments and to establish an international control of the manufacture and use of powerful materials "

1957 সালে তাঁকে প্রথম 'U. S. Atoms for Peace' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। 1962 সালের 18ই নভেম্বর তিনি ডেনমার্কের কোপেনহেগেনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সারা পৃথিবীর বিদগ্ধজনেরা তাঁব মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। সে সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জন. এফ. কেনেডি। তিনি বোরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে লিখেছিলেন ঃ

"American scientists, indeed all American citizens who knew Doctor Bohr's name and his great contributions, have respected and venerated him for more than two generations "

1911 খ্রীষ্টাব্দে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড [Earnest Rutherford] তাঁব পরমাণু-মডেল উপস্থাপিত করলেন। তাতে দেখা গেল, পবমাণুর কেন্দ্রে একটি ধনাত্মক তড়িতাহিত কেন্দ্রক [Positively charged nucleus] আছে, আর তার চতুর্দিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে কিছু ইলেকট্রন ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রচণ্ড গতিতে। এই ঘুরে বেড়ানোটা হচ্ছে কেন্দ্রকের কেন্দ্রাভিমুখী বলের ক্রিয়ায়। ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে রাদাবফোর্ড ও তার সহকর্মীবা তেজস্ক্রিয় পদার্থ রেডিযাম থেকে নির্গত আলফা কণাকে [Alpha Particles] পাতলা ধাতব পাতের উপর নিক্ষেপ করে ধাতব পাতটি থেকে অলফা কণাগুলিব বিচ্ছুরণ পরীক্ষা করছিলেন। এই পরীক্ষা-নিবীক্ষার ফলাফল থেকে রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের ওই যুগান্তকারী প্রস্তাবটি রাখলেন। তিনি বললেন, পরমাণুব গঠন অনেকাংশে আমাদেব পরিচিত সৌব জগতেব মত। আমাদের সৌর জগতের কেন্দ্রস্থলে যেমন রয়েছে সূর্য এবং তাকে দূর থেকে প্রদক্ষিণ করছে কয়েকটি গ্রহ; তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রে রযেছে একটি কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস [Nucleus], আর তাকে দূর থেকে প্রদক্ষিণ করছে এক বা একাধিক ইলেকট্রন। কোনও পরমাণুর ভরের অধিকাংশটাই হল তার নিউক্লিয়াসের ভর। তবে এর আয়তন পরমাণুর আয়তনের তুলনায় খুবই কম। নিউক্লিয়াসের ব্যাস হল পরমাণুর ব্যাসের এক লক্ষ ভাগের প্রায় এক ভাগ মাত্র। পরমাণুর ভেতরটা হল একেবারে ফাঁপা। তার ভেতরের অধিকাংশটাই ফাঁকা বা শূন্য স্থান। ধনাত্মক আধান-সম্পন্ন নিউক্লিয়াস যতটা পরিমাণ আধানযুক্ত তার চতুর্দিকের ইলেকট্রনদের মোট ঋণাত্মক আধান ততটাই। সৌরজগতে যেমন সূর্যের মহাকর্ষ বলের টানে গ্রহগুলি তার চারিদিকে ঘুরছে, পবমাণুতেও সেভাবে ধনাত্মক আধান-যুক্ত নিউক্লিয়াসের বৈদ্যুতিক বলের টানে ঋণাত্মক ইলেকট্রনগুলি তার চতুর্দিকে আবর্তিত হচ্ছে।

বোর দেখলেন, রাদারফোর্ডের এই পরমাণু মডেল দিযে পদার্থের ভৌত এবং রাসায়নিক গুণগুলি সহজেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব, কিন্তু বলবিদ্যার পুরানো বা সনাতন নিয়ম এবং তড়িচ্চুম্বকীয় বলের সনাতন নীতি দিয়ে ওই পরমাণুর স্থায়িত্বই অব্যাখ্যাত রয়ে যায়। দেখা গেল, ওই সব নিয়মানুসারেই রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল টিকে থাকতে পারে না। সনাতনী পদার্থবিদ্যা থেকে জানা গেছে যে, বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত কোন কণার গতিতে যদি ত্বরণ থাকে, তবে তা থেকে বিকিরণ নির্গত হয়। দুরন্ত গতিতে ছুটন্ত ওই সব ইলেকট্রন তাই শক্তি বিকিরণ করে পরমাণুর ওই মডেলের স্থায়িত্বটাই বানচাল করে দেবে। তাই বোর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পরমাণু কোনও শক্তি বিকিরণ না করেই বিভিন্ন ধরনের অসম্বদ্ধ স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে পারে। এটা স্থির হয় কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক 'কোয়ান্টা'-র [Quanta] ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলাফলের দ্বারা। 1900 সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক [Max Planck] প্রস্তাবিত কোয়ান্টাম তত্ত্বকে [Quantum Theory] আরো বিস্তাবিতভাবে কাজে লাগিয়ে বোর তাঁর নতুন পরমাণু-মডেল সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন। তিনি আরও সিদ্ধান্ত নিলেন

যে, পবমাণু তখনই শক্তি বিকিরণ করে, যখন সে একটি স্থিতিশীল অবস্থা [Stationary State] থেকে আরেকটা স্থিতিশীল অবস্থায় যায়, কিছু পরিমাণ শক্তি উদ্‌গীরণ করে দিয়ে। এই শক্তি তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তি হিসাবেই প্রকাশ পায়। পরমাণু শক্তি বিকিরণ করে আবার একটা স্থিতিশীল অবস্থায় আসে। শক্তি শোষণের সময়ও অনুরূপ প্রক্রিয়া ঘটে।

ব্যাপারটা একটু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা যাক। রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল অনেকটা সৌর জগতের মত। পরমাণুর কেন্দ্রে আছে কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস। তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এক বা একাধিক ইলেকট্রন এক একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে। নিউক্লিয়াস ধনাত্মক তড়িৎ-সম্পন্ন। ইলেকট্রনের তড়িতাধান ঋণাত্মক। পরমাণুর ভিতরটা ফাঁপা এবং শূন্য। সে শূন্যস্থানে দূরে-দূরে আছে কিছু ইলেকট্রন। তারা নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রবলবেগে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরছে সৌরজগতের গ্রহেরা যেমন ঘুরে সূর্যের চারপাশে, অনেকটা সেরকমভাবেই। ধনাত্মক আধানযুক্ত নিউক্লিয়াসের আকর্ষণেই তাদের এই ঘূর্ণন। ম্যাক্সওয়েলের [Maxwell] তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্বানুসারে তড়িতাধান ত্বরণযুক্ত হলে তা তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তি বিকিবণ করে। সুতরাং ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরতে থাকলে কেন্দ্রক অভিমুখী ত্বরণের ফলে এরা ক্রমাগত শক্তি ক্ষয় করবে। ফলে, ইলেকট্রনগুলির কক্ষপথের ব্যাসার্ধ ক্রমশঃ কমে আসবে। এই বিকিরণ করতে করতে শক্তিক্ষয়ের ফলেই ইলেকট্রন এক সময় নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রকে গিয়ে পড়বে। তখন পরমাণুর ওই মডেল আর থাকে না। অর্থাৎ রাদারফোর্ডের পরমাণু-মডেল সনাতন পদার্থ বিজ্ঞানের নীতিতে বিচার করলে টিকে থাকে না।

1913 সালে বোর ওই সমস্যার সমাধান করলেন তিনটি স্বীকার্য মেনে নিয়ে। এই তিনটি স্বীকার্য 'বোরের স্বীকার্য' [Bohr's Postulates] নামে খ্যাত। তিনটি স্বীকার্যের প্রথমটি হল, পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রন শক্তি বিকিরণ না করেও বদ্ধ কক্ষপথে আবর্তন করতে পারে, যদিও ওর গতিবেগ সনাতন বলবিদ্যা এবং স্থির-তড়িৎ বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হবে। তাঁর দ্বিতীয় স্বীকার্য হল, পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি কতকগুলি মঞ্জুরীকৃত [Permissible] কক্ষপথে বিচরণ করবে। অর্থাৎ সমগ্র পরমাণু কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় থাকবে, যেগুলিকে বলা হবে 'স্থিতিশীল অবস্থা' [Stationary State]। এই সব কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলি শক্তি বিকিরণ না করেই পরিক্রমা করতে পারে। এই কক্ষপথগুলিতে ইলেকট্রনের 'কৌণিক ভরবেগ' [Angular Momentum] $h/2\pi$ সংখ্যাটির পূর্ণ গুণিতক হবে, যেখানে 'h' হল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক [Planck's Constant]। তাঁর তৃতীয় স্বীকার্য হল, যদি পরমাণুর কোনও ইলেকট্রন কোন স্থায়ী কক্ষপথ থেকে অন্য একটি স্থায়ী কক্ষপথে সংক্রমণ [Transition] করে, তবেই পরমাণুটি শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করবে।

প্রথম স্বীকার্য অনুসারে ইলেকট্রন কতকগুলি নির্দিষ্ট কক্ষপথে অবস্থান করে কেন্দ্রক পরিক্রমা করলেও কোনও শক্তিক্ষয় হবে না। সুতরাং ইচ্ছামত যে কোনও কক্ষপথে ইলেকট্রন আবর্তন করতে পারে না। সহজতম গঠনযুক্ত পরমাণু হল হাইড্রোজেন পরমাণু। সেই হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে বোর তাঁর দ্বিতীয় স্বীকার্য প্রয়োগ করে দেখালেন যে, এই সব নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তনকালীন ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ একটি ধ্রুবক সংখ্যার পূর্ণ

গুণিতক হবে। কোনও একটি কক্ষপথের ব্যাসার্ধ r, ইলেকট্রনটির ভর m ও গতিবেগ v হলে, বোরের মতে

$$mvr = n\frac{h}{2\pi}$$

যেখানে, h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক = 6.62×10^{-27} আর্গ-সেকেন্ড। n=1, 2, 3 ইত্যাদি = প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি কক্ষপথগুলির নির্দেশক।

'n' হল কক্ষপথের কোয়াণ্টাম সংখ্যা [Quantum Number]। ফলে, একটি কক্ষপথে একটি ইলেকট্রনের মোট শক্তিও নির্দিষ্ট হল বোরের দ্বিতীয় স্বীকার্য অনুসারে। বোর বললেন, তাঁর এই কক্ষপথগুলি বৃত্তাকার। একটি পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা z হলে তার নিউক্লিয়াসের বৈদ্যুতিক আধান হয় +ze, যেখানে –e হল ইলেকট্রনের বৈদ্যুতিক আধান। আর একটি ইলেকট্রন যদি r ব্যাসার্ধের বৃত্তাকাব কক্ষপথে নিউক্লিয়াসটিকে প্রদক্ষিণ করবে, তাহলে নিউক্লিয়াস থেকে ওই ইলেকট্রনের দূরত্ব সব সময় সমান থাকবে। যেহেতু এখানে কেন্দ্রাতিগ বল কাজ করে, কুলম্বের সূত্র [Coulomb's Law] অনুসারে সেই বল $\frac{ze^2}{r^2}$, যেখানে '–e' হল ইলেকট্রনের তড়িতাধান। অতএব,

$$\frac{ze^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

বা, $$v^2 = \frac{ze^2}{mr}$$

আবার, $$mvr = nh / 2\pi$$

$$v^2 = \frac{n^2h^2}{4\pi^2m^2r^2}$$

অর্থাৎ $$\frac{ze^2}{mr} = \frac{n^2h^2}{4\pi^2m^2r^2}$$

বা, $$r = \frac{n^2h^2}{4\pi^2mze^2}$$

কক্ষপথের এই ব্যাসার্ধকে বলা হয় 'বোর ব্যাসার্ধ' [Bohr Radius]। হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে z = 1 এবং তার ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ বা বোর-ব্যাসার্ধ হল ঃ $r = 0.529\times10^{-8}$ সেন্টিমিটার। যখন n = 1, তখন নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে কাছের কক্ষপথটি নির্দিষ্ট হয়। n = 2, 3 ইত্যাদি হলে নিউক্লিয়াস থেকে ক্রমশ দূরের কক্ষপথগুলির ব্যাসার্ধ পর পর জানতে পারা যায়। r ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত v গতিবেগ-সম্পন্ন ইলেকট্রনের মোট শক্তি হল,

$$E = -\frac{2\pi^2 mz^2 e^4}{n^2 h^2}$$

এই শক্তি ঋণাত্মক হওয়ার মানে হল এই ইলেকট্রনটির শক্তি মুক্ত ইলেকট্রনের শক্তির চেয়ে কম। কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রনটিকে E পরিমাণ শক্তির যোগান দিলেই তবে তা মুক্ত ইলেকট্রন হতে পারবে। হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে $z = 1$। অএব হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রনের শক্তি E হল

$$E = -\frac{2\pi^2 m e^4}{n^2 h^2}$$

$$= -\frac{2.18\times10^{-11}}{n^2} \text{ আর্গ} = -2.18 \times 10^{-11} \text{ আর্গ।}$$

যখন $n = 1$, অর্থাৎ ইলেকট্রনটি যখন প্রথম কক্ষপথে অবস্থান করে।

পরমাণুর ইলেকট্রনের সম্ভাব্য সব শক্তিকে শক্তিস্তরের মাধ্যমে পাঁচটি শ্রেণীতে সাধারণত প্রকাশ করা হয়। এগুলি হল লাইম্যান শ্রেণী, বামার শ্রেণী, প্যাসেন শ্রেণী, ব্র্যাকেট শ্রেণী ও ফুন্ড শ্রেণী। এক-একটি শক্তি-স্তর [Energy Level] এক-একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তিকে সূচিত করে। ইলেকট্রনের শক্তি অনুযায়ী পরমাণুটি একটি নির্দিষ্ট স্তরে আছে বলে মনে করা হয়। ইলেকট্রনটি নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে কাছের কক্ষপথে থাকলে পরমাণু থাকে সবচেয়ে নিচের শক্তিস্তরে। একে 'প্রথম স্তর' বা 'ভূমিস্তর' [Ground Level] বলা হয়। ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস থেকে ক্রমশঃ দূরের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি কক্ষপথে থাকলে পরমাণুটিও যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয, চতুর্থ ইত্যাদি শক্তিস্তরে রয়েছে বলে ধরা হয়ে থাকে। বোর প্রস্তাবিত মডেল অনুসারে সবচেয়ে সরল পরমাণু, হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনটি পরমাণুটির শক্তিস্তর অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত হতে পারে।

বোরের তৃতীয় স্বীকার্য বলছে, বাইরের শক্তি পরমাণুর ইলেকট্রনকে উদ্দীপিত [Excite] করতে পারে। তাতে ইলেকট্রন কোনও নিম্ন শক্তি বিশিষ্ট কক্ষপথ থেকে অপেক্ষাকৃত উচ্চশক্তি বিশিষ্ট কক্ষপথে চলে যাবে। এইভাবে ওই পরমাণুটি বাইরের শক্তি-উৎস থেকে ওই অতিরিক্ত পরিমাণ শক্তি শোষণ [Absorption] করে। পরমাণুটির শক্তি স্তর বেড়ে যায়। আবার এর বিপরীত প্রক্রিয়ায় একটি উদ্দীপিত ইলেকট্রন কোনও অধিকতর শক্তিসম্পন্ন কক্ষপথ থেকে কোন কম শক্তিসম্পন্ন কক্ষপথে ঝাঁপ দিতে [Jump] পারে। তখন অতিরিক্ত শক্তি ওই পরমাণু থেকে তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তির আকারে বিকিরিত হয়। বোরের প্রস্তাব অনুসারে,

$$E_2 - E_1 = h\nu$$

যেখানে, E_1= কমশক্তি-সম্পন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রনের মোট শক্তির পরিমাণ; E_2=

উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রনের মোট শক্তির পরিমাণ, h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক; υ = শোষিত বা বিকীর্ণ শক্তির কম্পাঙ্ক [Frequency]।

হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে বোর হিসাব করে দেখালেন যে, ইলেকট্রন যদি n_2 থেকে n_1 কোয়ান্টাম সংখ্যার কক্ষপথে লাফ দেয়, তবে যে রশ্মি বিকিরিত হয় তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হবে

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{2\pi^2 me^4}{ch^3}\left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right]$$

হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে পারমাণবিক সংখ্যা z = 1, কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে এই সূত্রটি হবে

$$\eta = \frac{1}{\lambda} = \frac{2\pi^2 mz^2e^4}{ch^3}\left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right],$$

যেখানে η = আলোচ্য তরঙ্গে তরঙ্গ-সংখ্যা; λ = তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য; m = ইলেকট্রনের ভর; z = পারমাণবিক সংখ্যা; e = ইলেকট্রনের আধান; c = আলোর গতিবেগ; h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক; n_1 = কক্ষপথের কোয়ান্টাম সংখ্যা; n_2 = কক্ষপথের কোয়াণ্টাম সংখ্যা।

উপরের সূত্রের $\frac{2\pi^2 mc^4}{ch^3}$ হল একটি ধ্রুবক। এর নাম 'রিডবার্গ ধ্রুবক' [Rydberg Constant]।

$$\text{সুতরাং, } R = \frac{2\pi^2 me^4}{ch^3} \text{ এবং } \eta = Rz^2.\left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right]$$

হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে z = 1, তাই,

$$\eta = R\left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right]$$

$n_1 = 2$ ও $n_2 = 3, 4, 5$............. ধরলে পাওয়া যায় বামার শ্রেণীর বর্ণালি। $n_1 = 1$ ও $n_2 = 2, 3, 4, ...$ ধরলে পাওয়া যায় লাইম্যান শ্রেণী। এইভাবে অন্যান্য শ্রেণীর শক্তিস্তরগুলি পাওয়া যায়।

কোনও পরমাণুতে যে কয়েকটি ইলেকট্রন থাকে তারা বোরের নির্দেশিত যে সব কক্ষপথে আবর্তন করে, সেই সব কক্ষপথকে বলা 'ইলেকট্রন খোলক' [Electron Cell]। এক বা একাধিক ইলেকট্রন খোলক থাকে পরমাণুতে। বোর এই খোলকগুলির নাম দিয়েছেন K, L, M, N ইত্যাদি। কোনও খোলকে কতগুলি ইলেকট্রন থাকবে তাও নির্দিষ্ট। এই সংখ্যা নির্ণীত হয় $2n^2$ সূত্র দিয়ে, যেখানে 'n' হল খোলক-নম্বর [Cell Number]। এক নম্বর খোলকে অর্থাৎ K-cell-এ যেমন দুটির বেশি ইলেকট্রন থাকবে না, তেমনি N-খোলকে

অর্থাৎ চার নম্বর খোলকে 2×4^2 বা 32টি পর্যন্ত ইলেকট্রন থাকতে পারে। পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম সাধারণত অপূর্ণ খোলকে ইলেকট্রনের সংখ্যা দিয়ে স্থির করা হয়। এদের বলা হয় 'ভ্যালেন্স ইলেকট্রন' [Valence Electron]। হিলিয়াম, আর্গন, নিয়ন প্রভৃতি মৌলের পরমাণুতে কোনও অপূর্ণ খোলক বা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন নেই। অর্থাৎ এদের নির্দিষ্ট খোলকে যতগুলি ইলেকট্রন থাকার কথা ততগুলি করেই রয়েছে। এদের পরমাণুর খোলকগুলি অপূর্ণ নয়। ফলে এগুলি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। আবার সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি মৌলের একটি করে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন পাওয়া যায়। এদের রাসায়নিক ধর্মের তাই বহুল সাদৃশ্য।

1930 সাল নাগাদ 'বোর ইনস্টিটিউট'-এর গবেষণা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের উপর জোরদার হতে থাকে। কোপেনহেগেনে এই সম্পর্কে নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপায় উদ্ভাবিত হতে থাকে। আবিষ্কৃত হয় নানা যন্ত্রপাতি। 1936 সালে বোর আবার আলোড়ন তুললেন তাঁর আরেকটি আবিষ্কারে। এই সময় তিনি পরমাণু কেন্দ্রকগুলির গঠন সম্পর্কে নতুন তথ্য দেন এবং তাদের বিভাজন ও রূপান্তর কী ভাবে ঘটে বা ঘটানো যায় সে সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর এই তথ্য পারমাণবিক বিক্রিয়া বিশ্লেষণের ভিত্তিস্বরূপ। তিনি তাঁর এই তত্ত্বে আবারও নিয়মশৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করলেন পারমাণবিক বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়ায়, যখন বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে নানা ভিন্নমত পোষণ করছিলেন এবং তাঁদের আবিষ্কৃত স্থূল তথ্যগুলি পরস্পর বিরোধী বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। তিনি এগুলির সমাধান করলেন স্বকীয় তত্ত্বে।

বোর দেখালেন, যদিও নিউক্লীয় প্রক্রিয়াগুলি [Nuclear Processes] পরমাণুদের মতই কোয়ান্টাম স্বীকার্যগুলির [Quantum Postulates] দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, তবু এতো ছোটো জায়গায় এমন ধরনের শক্তিসম্পন্ন মিথস্ক্রিয়া [Interaction] কার্যকর থাকে যে, নিউক্লীয় পরিবর্তনের প্রক্রিয়ারা কোয়ান্টাম স্বীকার্যগুলির চাইতে সনাতন নিয়মাবলীর বেশি কাছাকাছি হয়ে যায়। তাই পরমাণুরা যতটা সনাতনপন্থী হওয়ার কথা তার চেয়ে অনেকটা বেশিই সনাতনপন্থী হয়ে পড়ে। অর্থাৎ এমতাবস্থায় পরমাণুরা অনেকটা বেশি সনাতন নিয়ম মেনে চলে।

বোরের মতে নিউক্লীয় প্রক্রিয়া দুটো স্তরে সম্পন্ন হয়। প্রথম দশায় পরমাণু সেই কণাটিকে আত্মসাৎ করে, যেটি দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়। এর ফলে পরমাণুটির শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। আবার তুলনামূলকভাবে এর স্থায়িত্ব বা জীবনকালও বেড়ে যায়। এটাকে অত্যন্ত উচ্চ উষ্ণতাসম্পন্ন এক ফোঁটা তরল পদার্থের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। দ্বিতীয় অবস্থায়, পরমাণু ওই অতিরিক্ত শক্তির কিছুটা কিছু সংখ্যক বিকিরণ কণা [Radiation Particles] নিঃসরণ করে কমিয়ে ফেলে, ঠিক যেমন করে তরলের ওই উচ্চ উষ্ণতাসম্পন্ন ফোঁটাটি বাষ্পীভবনের ফলে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলে। বোরই প্রথম বললেন, এমন অবস্থায় এই সম্ভাবনাই প্রবল যে নিউক্লিয়াসটি প্রায় সমান সমান দুটি ভাগে বিভাজিত হবে। বোরের এই তথ্য কাজে লাগিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই বিজ্ঞানী অটো হান এবং বিজ্ঞানী স্ট্রাসমান নিউক্লীয় বিভাজন সম্পন্ন করেন। 1939 সালে তাঁরা দেখলেন ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের উপর নিউট্রন কণা দিয়ে আঘাত করার ফলে নিউক্লিয়াসটি ভেঙ্গে দু'টি সমান টুকরো হয়ে

যচ্ছে। এই নিউক্লিয়াস ভাঙ্গনের নামই 'নিউক্লীয় বিভাজন' [Nuclear Fission]। বোর নিউক্লিয়াসের যে মডেল দিয়েছিলেন তরল পদার্থের ফোঁটার সঙ্গে তুলনা করে, তিনি তার নাম রেখেছিলেন 'Liquid Drop Nuclear Model'। নিউক্লীয় বিভাজনের ক্ষেত্রে বোরের এই মডেলের অবদান অসামান্য।

বোরের এই বিভাজন তত্ত্ব অনুসরণ করে শুরু হল পরমাণু বিভাজনের আরও প্রবল তোড়জোড়। 1938 সালের শেষের দিকে বার্লিনের রসায়নবিদ অটো হান [Otto Hahn] এবং তাঁর সহকর্মী স্ট্রাসমান [Strassmann] গবেষণাগারে ইউরেনিয়াম-U^{235}- কে নিউট্রন কণা দিয়ে আঘাত করে প্রায় দুটি সমান অংশে বিভক্ত করতে সমর্থ হলেন। ইউরেনিয়াম U^{235} -পরমাণু দ্বিধা বিভক্ত হয়ে হল বেরিয়াম আইসোটোপ এবং ক্রীপটন [Krypton] আইসোটোপ। এর উপর উৎপন্ন হল দু'টি নিউট্রন কণা এবং প্রবল উত্তাপ। ওঁদের আবিষ্কার এক কথায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায় ঃ

$$_{92}U^{235} + {}_0n^1 \rightarrow {}_{56}Ba + {}_{36}Kr + 2{}_0n^1 + 200MeV$$

এই আবিষ্কারে অটো হানের মুখ্যসহায়িকা ছিলেন শ্রীমতী লীজে মাইটনার [Lise Mitner]। এই মহিলা বিজ্ঞানী জাতিতে ইহুদী। দীর্ঘ 25 বছর অটো হানের সঙ্গে কাজ করার পর 1938 সালের গ্রীষ্মকালে প্রাণ বাঁচাতে তিনি বার্লিন ছেড়ে স্টকহোমে চলে যান। প্ল্যাঙ্ক ও হান তাঁকে বার্লিনে থাকবার অনুমতি দিতে হিটলারকে অনুরোধ করেছিলেন। হিটলার শোনেন নি। যখন খবর পাওয়া গেল তাঁকে বন্দী করা হচ্ছেই, তখন হান এবং প্ল্যাঙ্কই তাঁকে স্টকহোম পাঠিয়ে দেন। এরই কিছুদিন পরে U^{235} পরমাণু বিভাজন সম্ভব হল হানের গবেষণাগারে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 1939 সালের গোড়ার দিকে হান এই আবিষ্কার সবিস্তারে মাইটনারকে জানালেন তাঁর মূল্যবান অভিমতের জন্য। মাইটনার এবং ফ্রিসক [O. R Frisch] কয়েকদিন পরে ওই ঘটনার তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা দিলেন। মাইটনার এই ঘটনার নাম দিলেন পারমাণবিক বিভাজন [Atomic Fission] বা কেন্দ্রকীয় বিভাজন [Nuclear Fission]।

1931 সালে 'কৃত্রিম বিশরণ' [Artificial Disintegration] ঘটাতে গিয়ে রাদারফোর্ডের ছাত্র ও সহকর্মী কক্‌ক্রোফ্‌ট [Cockcroft] ও ওয়ালটন [Walton] উচ্চশক্তিসম্পন্ন প্রোটন দিয়ে লিথিয়ামকে আঘাত করলেন। ফলে, আওয়াজ করে বিস্ফোরণ হয়ে আলোর ঝলক দেখা গেল। প্রবল তাপ উৎপন্ন হল। পারমাণবিক বিক্রিয়াটি হল ঃ

$$_3Li^7 + {}_1H^1 \rightarrow {}_2He^4 + {}_2He^4 + 17.3MeV$$

উৎপন্ন তাপের পরিমাণ আইনস্টাইনের $E = mc^2$ সূত্র মেনেই পাওয়া গেল। একটি লিথিয়াম পরমাণুর প্রকৃত ভর হল $7{\cdot}01822 \times 1{\cdot}66 \times 10^{-24}$ গ্রাম এবং একটি প্রোটনের ভর $1{\cdot}00812 \times 1{\cdot}66 \times 10^{-24}$ গ্রাম। সুতরাং সংঘর্ষের আগে মোট ভর হল $8\ 02634 \times 1{\cdot}66 \times 10^{-24}$ গ্রাম। একটি হিলিয়াম কেন্দ্রকের ভর হল $4{\cdot}00390 \times 1{\cdot}66 \times 10^{-24}$। সুতরাং উৎপন্ন দুটি হিলিয়াম পরমাণুর মোট ভর $8{\cdot}00780 \times 1{\cdot}66 \times 10^{-24}$ গ্রাম। সংঘর্ষেব পরে ভরের ঘাটতি হল $(8{\cdot}02634 - 8{\cdot}00780) \times 1\ 66 \times 10^{-24}$ গ্রাম বা

0 0307764 × 10^{-24}গ্রাম। শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে এই ভরটুকু $E = mc^2$ সূত্র অনুসরণ করে। এই শক্তির পরিমাণ হল 0'0307764 × 10^{-24} × $(3\times10^{10})^2$ আর্গ বা 0'2769476×10^{-4} আর্গ, যা অঙ্ক কষে দাঁড়ায় 17.3 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট [Me V]। এইভাবে 1905 সালে আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত $E = mc^2$ প্রযুক্তিগতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হল। বিজ্ঞানীরা এই সূত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগে ক্রমশঃ পরমাণু থেকে শক্তি পাবার উপায়ে সাফল্য লাভ করতে লাগলেন।

1932 সালে চ্যাডউইক [Chadwick] নিউট্রন আবিষ্কার করলেন। আধান নিরপেক্ষ এই কণিকাটি দিয়ে আঘাত করে পরমাণু বিভাজন আরও সহজ হবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা হল। 1933 সালে বিজ্ঞানী মাদাম কুরীর মেয়ে আইরিন কুরী ও তার স্বামী ফ্রেডরিক জোলিও কেন্দ্রককে আলফা কণিকার আঘাতে ভেঙে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় [Artificial Radiactive] পদার্থ সৃষ্টি করলেন, যা আজকাল চিকিৎসা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত। এই আবিষ্কারের জন্য তাঁরা 1935 সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন। 1935 সালে জোলিও দম্পতি এবং ইতালির এনরিকো ফের্মি [Enrico Fermi] নিউট্রন দিয়ে U^{235} পরমাণুর কেন্দ্রককে আঘাত করলেন। কেন্দ্রকীয় বিভাজন হল। 1938 সালে হানের গবেষণার ফলে U^{235} -এর কেন্দ্রকের বিভাজন সংক্রান্ত যে সব তথ্যাদি পাওযা গেল সেগুলি ভালো করে বিচার করে দেখলেন মাইটনার। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে বিজ্ঞানীরা এতোদিন যা চাইছিলেন হানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাই পাওয়া গেছে। মাইটনার বোরের গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হানের মত একই ফল পেলেন। তিনি আরও জানালেন, একটি নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকটি প্রায় সমান দুটি ভাগে বিভক্ত হওয়া ছাড়াও দুটি নিউট্রনের সৃষ্টি হচ্ছে, যার অর্থই হল ধারাবাহিকভাবে পারমাণবিক বিক্রিয়ার সম্ভাবনা। কেননা, প্রথম একটি নিউট্রন কেন্দ্রককে আঘাত করার পর বিভাজন শেষে দুটো নিউট্রন বেরিয়ে আসছে, আবার ওই দুটো নিউট্রন অন্য দুটো কেন্দ্রককে আঘাত করে বিভাজন শেষে চারটি নিউট্রন উৎপন্ন করছে। এইভাবে চার থেকে আট, আট থেকে ষোল এবং ধারাবাহিকভাবে উৎপন্ন হবে অজস্র নিউট্রন। প্রতিটি পরমাণু বিভাজনে উৎপন্ন শক্তি হবে 20 কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট। মাইটনার বোরকে এসব জানালেন। বোর আবার জানালেন ফের্মি ও স্ৎসিলার্ড বা ৎসিলার্ড [Szilard] প্রমুখ বিজ্ঞানীদের, যাঁরা তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছিলেন। গবেষণায় জানা গেল ইউরেনিয়ামের পরিমাণ যদি একটি বিশেষ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, যা বিজ্ঞানের ভাষায় 'সঙ্কট ভর' [Critical Mass], তবে মুহূর্তের মধ্যে ধারাবাহিক বিক্রিয়ায় ঘটবে প্রবল বিস্ফোরণ। সব কিছু ধ্বংস করে দেবে। ফের্মি চেষ্টা করলেন কী করে এই ধারাবাহিক বিক্রিয়াকে আয়ত্তাধীনে রাখা যায়। তিনি 1942 সালের 2রা ডিসেম্বর বানিয়ে ফেললেন পারমাণবিক চুল্লী [Atomic Reactor], যাতে ধারাবাহিক পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটতে থাকবে, কিন্তু তাকে আয়ত্তাধীন রাখা যাবে। ফলে, পরমাণু শক্তিকে মানুষের ব্যবহারে লাগানোর অসুবিধা থাকলো না আর।

1939 সালে অটো হানের পারমাণবিক বিভাজনের খবর বোরের মাধ্যমে পেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা। ফের্মি ও ৎসিলার্ড নিশ্চিতভাবে বুঝলেন পারমাণবিক বোমা

[Atom Bomb] এখন সম্ভবপর। এরপর পারমাণবিক বোমা তৈরি হয়। হিরোশিমা ও নাগসাকি ধ্বংস হয়। এখন বহুদেশই পারমাণবিক বোমা বানিয়েছে। আবার পারমাণবিক চুল্লীও বহুদেশ বানিয়ে ফেলেছে, যার থেকে উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ। পরমাণু বোমা উৎপাদনের সম্ভাবনা দেখে বোর ভীত হয়ে পড়েছিলেন। আইনস্টাইনও এমনি ভীত হয়েছিলেন তাঁর $E = mc^2$ আবিষ্কারের কিছুদিন পরে, যখন এক অজানা অপরিচিত যুবক তাঁর কাছে ওই সূত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটিয়ে বোমা তৈরির প্রস্তাব রেখেছিলেন।

পরমাণু বোমা আবিষ্কারের প্রবল সম্ভাবনা দেখে বোর বিভিন্ন মিত্র শক্তিকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন মানব সভ্যতার এই বিপদটির কথা। তাঁর আবেদনগুলিতে তিনি পরমাণু বোমার কথা উহ্যই রেখেছিলেন। ফলে, রাষ্ট্রনায়করা তাঁর বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে পারলেন না। তাই তাঁর এইসব অনুরোধপত্র পেয়ে মিত্রশক্তির রাষ্ট্রনায়করা খুবই বিরক্ত হতে থাকেন। এর ফলে, সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তৎকালীন ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল। নীল্‌স্ বোরের কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে তিনি তাঁকে আটক করে রাখারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যদিও সে প্রস্তাব কার্যকর করা হয়নি। একবার চার্চিল ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, "ঐ এন. বোর লোকটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। বিজ্ঞানী হয়েও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে চায়!

নীল্‌স্ বোরের আশঙ্কা একদিন সত্যে পরিণত হল। অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীর বুকে নেমে এল দুটি ভয়ঙ্কর দিন যে দিন দুটিতে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি নামক দুটি সমৃদ্ধ জনপদের উপর আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটান হল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই কলঙ্কময় দিন দুটি হল 1945 খ্রিস্টাব্দের 6ই ও 9ই আগস্ট। হাজার হাজার মানুষ সেদিন মারা গেল পারমাণবিক বোমায়। আইনস্টাইনের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গেল শোকে-দুঃখে। তীব্র প্রতিবাদ জানালেন নীল্‌স্ বোর। আইনস্টাইন, অটোহান, লিজে মাইটনার, এনরিকো ফের্মি, রবার্ট ওপেনহাইমার প্রমুখ বিজ্ঞানীরাও তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন। 1945 সালের 11ই আগস্ট তারিখে নীল্‌স্ বোর বিখ্যাত টাইমস পত্রিকায় প্রকাশ করলেন "বিজ্ঞান ও সভ্যতা" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ। ঐ প্রবন্ধটিতে তিনি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করলেন, বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের সদ্‌গুণাবলীর যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রেম, প্রীতি, ক্ষমা, তিতিক্ষা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলীর সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বিভেদ নেই। বরং একটি অপরটির সম্পূর্ণ পরিপূরক। তিনি আরও উল্লেখ করেন, পৃথিবীর আবহাওয়াকে দূষিত করা বিজ্ঞানের অভিপ্রেত নয়। যুদ্ধ ও মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতাকে তিনি তীব্রভাবে নিন্দা করেন।

টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত ওই 'বিজ্ঞান ও সভ্যতা' প্রবন্ধটি বিজ্ঞান ও সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। 1945 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে তিনি সপরিবারে ফিরে আসেন কোপেনহেগেনে। এখানে তিনি কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউটেই কাজে যোগ দেন। এরপর তাঁর চেষ্টা চলতে থাকে পরমাণু শক্তিকে মানুষের কাজে লাগানোর। শুধু তাই নয় পারমাণবিক বোমা নিষিদ্ধ করার জন্য তিনি গড়ে তুললেন আন্দোলন। 1950

সালে তিনি এ নিয়েই রাষ্ট্রসংঘকে চিঠি লিখেছিলেন। তবে রাষ্ট্রসংঘ এই চিঠিকে কোনও গুরুত্ব দেয় নি।

নীল্‌স্ বোর অতঃপর কোপেনহেগেনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউটটিকে সারা পৃথিবীর পদার্থবিজ্ঞানীদের মিলনস্থল হিসাবে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আমন্ত্রণ জানান পৃথিবীর নামকরা পদার্থবিজ্ঞানীদের এবং রিসোতে গড়ে তোলেন অ্যাটমিক প্রোজেক্ট। বোরের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে ডেনমার্কের তরুণ বিজ্ঞানীরা এখানে গবেষণা আরম্ভ করেন। তারপর পরমাণুর ভাঙ্গনের ফলে যে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হয়, সেই শক্তিকে মানব কল্যাণে নিয়োগ করতে প্রয়াসী হন। তাঁর এই প্রচেষ্টা তাঁর জীবদ্দশায় অনেকটা সাফল্যমণ্ডিতও হয়েছিল। এসব কথা আগেই বলেছি।

বোর ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। এখানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তাঁর খুব ভালো লাগে। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে ভারতের কী কী করা প্রয়োজন তার জন্য পরামর্শও দেন তিনি। মানবদরদী এই বিজ্ঞানীটির ছিল নানা গুণ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই সোচ্চার ছিলেন। শেষ জীবনেও তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি মৃত্যু অবধি কর্মক্ষম ছিলেন। ছেলেবেলার বন্ধুদেরও তিনি শেষ জীবনে মনে রেখেছিলেন। একবার তিনি যা শুনতেন তা যেমন ভুলতেন না কোনও দিন, তেমনি একবার যাকে দেখতেন তাকে মনে রাখতে পারতেন সারা জীবন। অধ্যাপক হিসাবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। আগেই বলেছি, হাইজেনবার্গ, শ্রোয়েডিঙ্গার প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা তাঁর অধীনেই গবেষণা করেছেন। এইসব বিজ্ঞানীরা অনেকেই পরে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তখন মনে করা হত বোরের অধীনে গবেষণা করলেই নোবেল পুরস্কার পাওয়া যাবে। আবার তাঁর নিজের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন রাদারফোর্ড।

পদার্থবিজ্ঞানে বোরের দান অতুলনীয়। তিনি ছিলেন নিউক্লীয় বিভাজনের পথিকৃৎ। পরমাণু মডেলও তাঁর আবিষ্কার। তবে, এই মডেলের এখন অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

1939 সালে যে নিউক্লীয় বিভাজন প্রত্যক্ষ করা গেল অটো হান ও স্ট্রাসমানের আবিষ্কার হিসাবে, তার কথা বোর অনেকদিন আগেই ভেবে রেখেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর পাঁচজন সেরা পদার্থবিজ্ঞানীর নাম করলে সে তালিকায় তাঁর নাম আসবেই। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর নাম বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির পিছনে যে কয়েকজনের মুখ্য অবদান রয়েছে নীল্‌স্ বোর তাঁদের অন্যতম।

সতেন্দ্রনাথ বসু

[1894–1974]

পরাধীন ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বেরিয়ে এলেন বিজ্ঞান জগতের তিনটি দিকপাল—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং রামানুজন। এঁরাই ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চাব ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জগদীশচন্দ্র জন্মেছিলেন 1859 সালে, প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম 1861 সালে এবং রামানুজন জন্মেছিলেন এঁদের অনেকটা পরে 1887 খ্রীষ্টাব্দে। আচার্য বসু এবং আচার্য রায় উভয়েই উচ্চশিক্ষা লাভ করেন বিলাতে। জগদীশচন্দ্র মূলতঃ পদার্থবিজ্ঞানী। তিনিই এদেশে পরীক্ষা-ভিত্তিক বিজ্ঞান-চর্চার জনক। নোবেল কমিটির ভুলের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হন এবং বেতার যন্ত্র আবিষ্কারের কৃতিত্ব পেয়ে যান ইতালির মার্কনি। বিজ্ঞানী মার্কনি এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন 1909 সালে। অথচ এখন এটা প্রমাণিত সত্য যে, জগদীশচন্দ্রই বেতার-যন্ত্রের প্রথম আবিষ্কর্তা এবং এতে নোবেল পুরস্কার তাঁরই পাওয়ার কথা মার্কনির নয়। নোবেল কমিটি ভুল না করলে তিনিই হতেন ভারতের প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এবং প্রথম নোবেল-জয়ী বিজ্ঞানী।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন বিশ্বখ্যাত রসায়নবিদ। বিজ্ঞান সাধনা এবং সাধারণ মানুষের জন্য তিনি তাঁর সারাটা জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত বই 'History of Hındu Chemisty'-তে তিনি দেখালেন প্রাচীন ভারতে রসায়ন চর্চার ইতিহাস। শ্রীনিবাস রামানুজন জন্মেছিলেন দক্ষিণ ভারতের এক অখ্যাত গ্রামের প্রায় অশিক্ষিত এক পরিবারে। গণিতশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ইউরোপীয় গণিতবিদদের বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। এটা খুবই আশ্চর্যের যে, এই গ্রাম্য বালকটি কেমন করে যেন তাঁর ওই অল্প বয়সেই অঙ্কশাস্ত্রের আধুনিক এবং দুরূহ তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন অতি সহজেই। মাত্র তিরিশ বছর বেঁচেছিলেন তিনি। গণিতের জগতে আজও তিনি অমর হয়ে আছেন।

বাংলার তথা ভারতেব বিজ্ঞানচর্চার এই রকম প্রেক্ষাপটে সত্যেন্দ্রনাথের আবির্ভাব। সতেন্দ্রনাথ ছিলেন অসামান্য প্রতিভাধর। বসু পরিবারে না জন্মে তিনি যদি অন্য কোনও নিকৃষ্ট পরিবারেও জন্মাতেন তাহলেও তিনি বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী হতে পারতেন বলে অনেকে মনে করেন। তাঁর প্রতিভাই তাঁকে তেমন খ্যাতি এনে দিত। যাইহোক, তিনি যে পরিবারে জন্মেছিলেন, তার শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি-সংস্কৃতি তাঁর গড়ে ওঠার পক্ষে বেশ সহায়কই হয়েছিল। তাঁর পিতা সুরেন্দ্রনাথ যে শুধু কর্মযোগী ছিলেন তা নয়, তিনি যথেষ্ট শিক্ষিতও ছিলেন। নানা বিষয়ে তিনি পড়াশুনা করতেন। মার্কস-এঙ্গেলসের লেখাও তিনি পড়তেন বেশ

আগ্রহ নিয়ে। তিনি ছিলেন উদার-হৃদয়, দৃঢ়চেতা এবং নীতিনিষ্ঠ এক যুগোপযোগী পুরুষ। এমনি এক মানুষের ঘরে এলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

1894 সালের 1লা জানুয়ারী উত্তর কলকাতার গোয়াবাগানে 22 নম্বর ঈশ্বর মিল লেনে জন্মেছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তাঁর পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন রেলওয়ের হিসাবরক্ষক। মাতা আমোদিনী দেবী ছিলেন আলিপুরের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আইনজীবী মতিলাল রায়চৌধুরীর কন্যা। কলকাতা থেকে 48 কিলোমিটার দূরে নদীয়া জেলার বড় জাগুলি গ্রাম। সেই গ্রামেরই বনেদী কায়স্থ পরিবারের সন্তান ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর পিতৃ-পিতামহের আদি নিবাস ছিল এই বড় জাগুলি গ্রামে। ঈশ্বর মিল লেনের যে বাড়ীটিতে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম সেটিও তাঁর পৈতৃক বাড়ী। এটি বানিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ। কলকাতা শহর গ'ড়ে ওঠার আগে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নদীয়া ছিল বাংলার সংস্কৃতির পীঠস্থান। সারা ভারতে নদীয়ার পণ্ডিতদের খ্যাতি ছিল তখন। চৈতন্যদেবের উত্তরাধিকার নিয়ে বাংলা-সংস্কৃতির জগতে নদীয়া ওই সময়ও উজ্জ্বল হয়ে বিরাজমান। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও বড় জাগুলি ছিল বেশ সমৃদ্ধ। মন্দির, অট্টালিকায় জম-জমাট। সেই গ্রামেরই বনেদী বসু পরিবারের লোকজনের মধ্যে সংস্কৃতি তো ছিলই, উপরন্তু তাঁদের অনেকেই শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজী শিক্ষায়। সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ অম্বিকাচরণ এবং পিতা সুরেন্দ্রনাথ উভয়েই সেকালের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তাঁরা দুজনেই ছিলেন সরকারী চাকুরে। সংস্কৃতিবান এবং শিক্ষিত এই পরিবারেই সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর পিতামাতার একমাত্র পুত্র সন্তান এবং তাঁর ভগ্নী ছিলেন ছয় জন।

ছেলেবেলায় সত্যেন্দ্রনাথ বেশ দুষ্টু ছিলেন। তাঁর দুষ্টুমি বন্ধ করার জন্য বাবা সুরেন্দ্রনাথ ঘরের মেঝেতে অনেক অঙ্ক লিখে দিয়ে যেতেন এবং সতেন্দ্রনাথকে সেগুলি কষে রাখতে বলতেন। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের কষা অঙ্কগুলি দেখতেন। একদিন একজন সতেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করলেন, 'সত্যেন, তিন × তিন কত? উত্তর হল 'নয়'। আবার প্রশ্ন হল, 'নয়× নয় কত?' সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, 'একাশি'। এবার প্রশ্ন করা হল, 'নয়× একাশি কত?' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, 'সাতশো উনত্রিশ'। তখন তাঁর বয়স পাঁচ বছরও হয় নি।

ছেলেবেলায় সত্যেন্দ্রনাথ খেলাধূলা ইত্যাদিতে অনেক সময় ব্যয় করলেও পড়াশুনায় তাঁর কোনও ঘাটতি ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় বাবার থেকে মায়ের বেশী অনুগত ছিলেন। তিনি মাকে বলতেন 'তুই', বাবাকে বলতেন 'আপনি'। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মানসিক গঠন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। একবার তিনি যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, তখন একখানি পাঠ্যপুস্তক নিজেই পুরোপুরি ছিঁড়ে ফেলেন কোনওভাবে। ছেঁড়া বই দেখে মা বকাঝকা করলেন সত্যেন্দ্রনাথকে। সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু বললেন, 'বই নাই তো হয়েছে কি? যেখান থেকে খুশি আমাকে জিগ্যেস কর, আমি উত্তর দেব।' মা পুত্রের কথা মত পাশের বাড়ীর একটি ছেলের কাছ থেকে বই নিয়ে এসে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। সত্যেন্দ্রনাথ হুবহু

মুখস্থ বলে গেলেন। এমনি অসাধারণ প্রখর ছিল ওঁর স্মৃতিশক্তি। ছেলেবেলা থেকেই ওঁর মস্তিষ্ক কাজ করতো কম্পিউটারের মত।

ছেলেবেলায় তিনি খুব ক্যারম খেলতেন। এই খেলাটা তিনি প্রৌঢ় বয়স অবধিও খেলেছেন। দাবাও খুব ভালো খেলতে পারতেন। কলকাতায় এবং ঢাকায় থাকার সময় তিনি টেনিসও খেলতেন। ছেলেবেলায় সব রকমের ছেলেদের সঙ্গেই তিনি খেলাধূলা করতেন। গরীব, দুঃস্থ, নিরক্ষর ছেলেরাও ছিল তাঁর খেলার সঙ্গী। খেলার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাদের সংখ্যার হিসাব, বাংলা, ইংরেজী ইত্যাদি অনেক কিছুই শিখিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। এগুলি তিনি শেখাতেন খেলার অঙ্গ করে নিয়ে, একেবারে খেলাচ্ছলে। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি নানাভাবে জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল ওই ছোটবেলা থেকেই। তাঁর সমস্ত চিন্তাধারা এবং কর্মজীবন এই জাতীয়তাবোধের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। জাতিকে সাক্ষর করে তোলা, শিক্ষিত করে তোলার চিন্তা ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল এবং আমৃত্যু তিনি ছিলেন এই চিন্তাধারার ধারক এবং বাহক। দেশকে ঠিকমত গড়ে তুলতে হলে তার মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং সে শিক্ষাটাও হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে—এই চিন্তার লালন-পালন তিনি শৈশবকাল থেকে সারাজীবনই করেছিলেন। ইউরোপ ভ্রমণকালে সে সব দেশের অনেক বিজ্ঞানী মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের তাঁর এই মতকে সমর্থন করেন। তিনি বলতেন, "দেশটা তো পরাধীন, ইংরেজের বুট আমাদের মাথার উপর পাতা রয়েছে। এটা ছেলেবয়সে আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জের মতো এসেছিল। আমরা পরাধীন, ওরা স্বাধীন। বিজ্ঞানকে করতলগত করেই ওরা আমাদের দেশ শুধু নয়, এই গ্রহের অজস্র দেশকে দখল করে রেখেছে। ওরা চায় না পরাধীন দেশের মানুষ বিজ্ঞানচর্চা করুক। সেখানে তাদের একটা ভয় আছে। বিশেষ করে ভারতীয়রা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান জাতি। তারা যদি একবার বিজ্ঞানের মুখ নিজেদের দিকে ফেরাতে পারে, তাহলে ওরা বিপদে পড়বে। বুঝলি, জগদীশচন্দ্র আমাদের পথপ্রদর্শক। তারপর আমরা কিছু কিছু ছাত্র এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেছিলুম।' জগদীশচন্দ্রের প্রতি ইউরোপের বহু বিজ্ঞানী অশ্রদ্ধাই দেখিয়েছিলেন। বারে বারে একই ঘটনা সত্যেন্দ্রনাথের মনে বেশ দাগ কেটেছিল। তাই তিনি বলতেন ঃ "জগদীশচন্দ্র যদি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক হতেন, তাহলে কি ওঁকে এতো লাঞ্ছনার মুখোমুখি হতে হত? এই সব ঘটনা আমাদের মনে যথেষ্ট রেখাপাত করেছিল। আর ছেলেবয়স থেকেই আমরা ভাবতুম, বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে লেখাপড়ায় ওদের সমকক্ষ হয়ে ওদেরই সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হবে। এছাড়া আমাদের সামনে আর কোন দ্বিতীয় পন্থা ছিল না। বলা যায়, পরাধীনতার গ্লানিই আমার বিজ্ঞান-চর্চার বোধন।"

তাঁর ছাত্রজীবনের তিনটি কাহিনী সত্য হলেও কিংবদন্তীই মনে হয়। টেস্ট পরীক্ষায় অঙ্কে তিনি 100 নম্বরের মধ্যে 110 পেয়েছিলেন। হিন্দু স্কুলের মাস্টারমশাই উপেন্দ্রনাথ বক্সী সতেন্দ্রনাথকে অঙ্কে 100-র মধ্যে 110 দিয়েছিলেন এবং পূর্ণসংখ্যার চেয়ে তাঁকে 10 নম্বর বেশি দেওয়ার যুক্তি হিসাবে উপেনবাবু বলেছিলেন, 'গণিতের প্রশ্নপত্রে এগারোটা প্রশ্ন ছিল, তার মধ্যে দশটির উত্তর দিতে হবে। সত্যেন কিন্তু এগারোটির উত্তর দিয়েছে।

শুধু তাই নয়, জ্যামিতির একস্ট্রাগুলি দু-তিনটি বিভিন্ন উপায়ে সমাধান করে কষে দেখিয়েছে। এই সব কারণে সত্যেনকে 100-র মধ্যে আমি 110 নম্বর দিয়েছি।

ইন্টারমিডিয়েটের টেস্ট পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ ইংরেজীতে পূর্ণসংখ্যার চেয়ে 10 নম্বর বেশি পেয়েছিলেন। অধ্যাপক পার্সিভ্যাল সাহেব তাঁকে পূর্ণসংখ্যা 60-র মধ্যে 70 দেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের এই বিদেশী অধ্যাপকটি সত্যেন্দ্রনাথকে 70 নম্বর দিয়ে বলেছিলেন, 'ছেলেটি অসাধারণ, এর স্বকীয়তা ভুলবার নয়'। এই ঘটনাটি এখন কিংবদন্তী মনে হয়। ইন্টারমিডিয়েটের শেষ পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয় শারীরবিদ্যায় তাঁর 100-র মধ্যে 100 পাওয়াটা কিংবদন্তী না হতেও পারে, কিন্তু 100-র মধ্যে 110 কিংবা 60-এর মধ্যে 70 পাওয়াটা নিশ্চয়ই কিংবদন্তীর পর্যায়ে পড়ে। এমনই মেধাবী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর মেধা যেন কোন কিংবদন্তীয় মেধা।

এম এস সি পরীক্ষায় মোট ৪00-র মধ্যে সতেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন 736। এও এক কিংবদন্তী নম্বর। প্রথম পত্রে তিনি পান 98, দ্বিতীয়পত্রে ৪5, তৃতীয় পত্রে 100, চতুর্থ পত্রে 89, পঞ্চমপত্রে ৪৪, ষষ্ঠ পত্রে 94, সপ্তম পত্রে 98 এবং অষ্টম পত্রে ৪4। মোট প্রাপ্ত নম্বর 736। মোট পূর্ণ সংখ্যা ৪00। এ এক অতুলনীয় রেকর্ড, যা অবশ্যই কিংবদন্তীর তালিকাভূক্ত হতে পারে।

1909 সালে সত্যেন্দ্রনাথ পঞ্চম স্থান অধিকার করে এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাশ করেন। বিজ্ঞানকে তিনি বেছে নেন উচ্চশিক্ষার জন্য, যদিও তাঁর পিতা চেয়েছিলেন তিনি আইনজীবী হোন। 1911 সালে ইনটারমিডিয়েট সায়েন্স ক্লাসের শেষ পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম স্থান অধিকার করেন। সেবার ঢাকা কলেজের মেঘনাদ সাহা হন দ্বিতীয়। নিখিল রঞ্জন সেন হলেন তৃতীয়। মেঘনাদ এসে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি এস সি ক্লাসে। 1913 সালে সত্যেন্দ্রনাথ বি এস সি [অনার্স] পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন তিনি, দ্বিতীয় হলেন মেঘনাদ এবং এবারেও তৃতীয় হলেন নিখিলরঞ্জন সেন। 1915 সালে মিশ্র গণিতে এম এস সি [M. Sc.] পরীক্ষার ফলাফলও একই রকম। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, মেঘনাদ প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয়। নিখিলরঞ্জন সেবার পরীক্ষা দেন নি। এই এম এস সি পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ রেকর্ড নম্বর পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন। তাঁর পাওয়া সেই রেকর্ড নম্বরের তালিকা একটু আগেই দেওয়া হয়েছে।

1914 সালে ছাত্রাবস্থায় সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তখন তিনি এম.এস.সি পড়ছেন। বয়স তাঁর মাত্র 20 বছর। শ্যামবাজারের নিকটবর্তী কম্বুলিয়াটোলার নামকরা চিকিৎসক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁর একমাত্র সন্তান ঊষাবতী। এই ঊষাবতীর সঙ্গেই সত্যেন্দ্রনাথের বিয়ে হয় 1914 সালে। কনের বয়স তখন মাত্র 11 বৎসর। তাঁর মা পছন্দ করেন এই মেয়েটিকে পুত্রবধূ হিসাবে। সত্যেন্দ্রনাথ মায়ের পছন্দ করা মেয়েটিকে বিবাহ করেন। ঊষাবতী প্রথমে নিবেদিতা স্কুলে পড়তেন। বিয়ের সময় পড়তেন মহাকালী পাঠশালায়। বিয়ের পর সতেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে ইংরেজী পড়াতেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম দুই

মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আগে তাদের গ্র্যাজুয়েট করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হওয়ার পরই তাদেব বিয়ের বন্দোবস্ত করেছিলেন।

1915 খ্রীস্টাব্দে একদল ছাত্র এম এস সি পাশ করে স্যার আশুতোষকে ধরলেন গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ক্লাস খোলার জন্য। তাঁরা বললেন, রসায়ন ছাড়া গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানের ক্লাস খুললে তাঁরা আশুতোষকে সাধ্যমত পরিশ্রম করে তাঁর চেষ্টা সফল করে তুলবেন। নতুনদের উপর প্রবল বিশ্বাস ছিল আশুতোষের। তাই তিনি রসায়নের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতেরও স্নাতকোত্তর ক্লাস খোলাতে রাজী করালেন বিশ্ববিদ্যালয়েকে। আশুতোষের চেষ্টায় সব বাধা দূর হল। 1917 সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের ফলিত গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন পডানো শুরু হল। প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদের ডাক পড়লো বিজ্ঞান কলেজে পড়ানোর জন্য। আশুতোষের আহ্বানে সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ প্রমুখ নবীনেরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ক্লাসে পড়ানোর জন্য নিযুক্ত হলেন। 1916 সাল থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদদের তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন স্যার আশুতোষ। সে দিক দিয়ে বিচার কবলে এঁরা দুজনেই 1916 সালে ফলিত গণিত [Applied Mathematıcs] বিভাগে নিযুক্ত হয়েছিলেন অধ্যাপনার জন্য। কিন্তু এই বিভাগের 'ঘোষ প্রফেসর' ডঃ গণেশ প্রসাদের সঙ্গে এঁদের তেমন বনিবনা না হওয়ায় আশুতোষের অনুমতিতে এঁরা দুজনেই বদলি হলেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে।

1921 সালে সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের রীডার পদে যোগ দেন। অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অন্তরীণ থাকার পর জার্মানী থেকে 1918 সালে কলকাতায় ফিরে আসেন। ফিরে এসে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে উপহার দেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের [Max Planck] 'Thermodynamik and Warmestrahlung' বইটির একটি কপি। এই প্ল্যাঙ্কই পদার্থবিজ্ঞানে কোয়ান্টাম-তত্ত্বের [Quantum Theory] জনক। তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন E = hυ সূত্র। যেখানে, কোন কোয়ান্টাম কম্পাঙ্ক υ হলে তার শক্তি E হবে hυ এবং এই h হল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক [Planck's Constant]। কিন্তু প্ল্যাঙ্ক যেভাবে এই সূত্রে উপনীত হযেছেন সে পদ্ধতি সত্যেন্দ্রনাথের ভাল লাগে নি। বিশেষতঃ ওই সূত্রে আসতে প্ল্যাঙ্ক অনেকগুলি তদর্থক অনুমিতি [Ad-hoc Assumption] মেনে নিয়েছিলেন যা সত্যেন্দ্রনাথের পছন্দ হচ্ছিল না। তিনি চাইছিলেন আরও নিখুঁতভাবে প্ল্যাঙ্কের ওই সূত্রটি কষে বের করতে। 1924 সালে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ঢাকায় পরীক্ষা নিতে গেলেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে জার্মান বিজ্ঞানী পউলির [Wolfgang Pauli] একটি গবেষণা-পত্র দেখান এবং সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে বলেন। মেঘনাদ ফিরে গেলেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। কয়েকদিনের চেষ্টায় তৈরি হয়ে গেল তাঁর সেই অতি বিখ্যাত নিবন্ধ, যেটি পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন সৃষ্টি। ধ্রুপদী পদার্থবিজ্ঞানকে আধুনিকরূপ দিতে ওই গবেষণা নিবন্ধটি ছিল এক নতুন পদক্ষেপ। তিনি নিবন্ধটি প্রকাশের জন্য পাঠালেন বিখ্যাত 'ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন' কর্তৃপক্ষের কাছে। তাঁরা এর আগে সত্যেন্দ্রনাথের তিনটি গবেষণাপত্র ছাপলেও

এই নিবন্ধটি তাঁরা প্রকাশ করলেন না। এটির একটি কপি তিনি আইনস্টাইনের কাছে পাঠালেন। নিবন্ধটি চার পৃষ্ঠার। তার সঙ্গে তিনি পাঠালেন তাঁর বিখ্যাত সেই চিঠি। আইনস্টাইনকে লেখা তাঁর চিঠিটি ছিল এই রকম ঃ

Physics Department
Dacca University
4th June, 1924

Respected Sir

I have ventured to send to you the accompanying article for your perusal and opinion. I am anxious to know what you think of it. You will see that I have tried to deduce the coefficient $8\pi v^2/c^3$ in Planck's law independent of the classical electrodynamics, only assuming that the ultimate elementary regions in the phase-space has the content h^3. I do not know sufficient German to translate the paper. If you think the paper worth publication I shall be grateful if you arrange for its publication in **Zeitschrift fur Physik**. Though a complete stranger to you, I do not feel any hesitation in making such a request. Because we are all your pupils though profiting only by your teachings through your writings. I do not know whether you still remember that somebody from Calcutta asked you permission to translate your papers on Relativity in English. You acceded to my request. The book has since been published. I was the one who translated your paper on Generalised Relativity.

Yours faithfully,
S. N. Bose

পরবর্তীকালে এক শনিবারের বৈঠকে সতেন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ 'নিজের কাজে আস্থা না থাকলে কর্তার কাছে পাঠান কেন? ডি. এন. বোস তো 'কিচ্ছু না' বলে উড়িয়ে দেন'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য হল, আইনস্টাইনকে 'কর্তা' কিংবা 'গুরু' বলে অভিহিত করতেন সতেন্দ্রনাথ। আর আইনস্টাইনের কাছে তিনি তাঁর এই নিবন্ধটি পাঠিয়েছিলেন 'কর্তা' তথা আইনস্টাইনের অভিমত জানবার জন্য। সত্যেন্দ্রনাথের এই কাজের অভিনবত্ব আইনস্টাইনকে এতোটাই অভিভূত করেছিল যে, আইনস্টাইন তাঁর এই গবেষণাপত্রটি নিজেই জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে সুপ্রসিদ্ধ Zeitschrift fur Physik পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এর আগে আইনস্টাইন কখনও কারো গবেষণাপত্র অনুবাদ করেন নি।

সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এরপর কিছুদিনের মধ্যেই আইনস্টাইন দ্রুত কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এই লেখাগুলির ভিতর দিয়ে তিনি দেখালেন যে, বসুর এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী কত সুদূরপ্রসারী। তিনি বসুর নতুন পন্থা প্রয়োগ করলেন পারমাণবিক কণার দ্বারা সংগঠিত বস্তুসমূহের উপর। বসুর পরিসাংখ্যিক নিয়ম প্রয়োগ করে তিনি সৃষ্টি করলেন এক-পরমাণু সম্পন্ন গ্যাসের কোয়ান্টাম-তত্ত্ব। এই কাজটিকে তিনি গ্যাসের গতিতত্ত্বে প্রয়োগ করে অতি অল্পমাত্রার গ্যাসের আচরণাদির ব্যাখ্যা করলেন। এই জন্যই এই নতুন গণনা প্রণালী, যা বসুর সম্পূর্ণ নিজস্ব আবিষ্কার, খ্যাতি লাভ করলো 'বোস-আইনস্টাইন-সংখ্যায়ন' [Bose-Einstein Statistics] হিসাবে। এখন অবশ্য এটি 'বোস সংখ্যায়ন' [Bose

Statistics] নামেই খ্যাত। সত্যেন্দ্রনাথের ওই নিবন্ধ পত্রিকাটি ছেপেছিল 1924 সালের 2রা জুলাই। আর সত্যেন্দ্রনাথ আইনস্টাইনকে ওই বিখ্যাত চিঠিটি লিখেছিলেন 4 ঠা জুন, 1924 খ্রিস্টাব্দে।

ম্যাক্সওয়েলের তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গতত্ত্বের আবিষ্কারের পর জানা গেল আলো, তাপ ইত্যাদি বিকীর্ণ শক্তি তরঙ্গের আকারে আলোর বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। প্ল্যাঙ্ক এই শক্তিকে কণারূপে কল্পনা করে তাঁর সূত্রে ব্যবহার করেছিলেন। এই কণাকেই পরে আইনস্টাইন 'ফোটন' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন তার আলোক-বৈদ্যুৎ-ক্রিয়া তত্ত্বে [Photo-electric Effect Theory]। সত্যেন্দ্রনাথ অগ্রসর হলেন ফোটনকে বস্তুকণার তুল্যরূপে বিবেচনা করে, কারণ আইনস্টাইনের আবিষ্কার শক্তি ও বস্তুর তুল্যতা প্রমাণিত করেছে। প্ল্যাঙ্কের সূত্রটিকে অন্যভাবে আবিষ্কার করতে গিয়ে বসুর এটাকে পরিসংখ্যানের সমস্যা হিসাবে সমাধান করলেন। তিনি দেখালেন যে প্ল্যাঙ্কের সূত্র পেতে ম্যাক্সওয়েলের তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গবাদ গ্রহণ করবার দরকার নেই। শক্তিকে শুধুমাত্র বস্তুকণার তুল্যরূপ হিসাবে ধরেই এই সূত্রে আসা যায়। তাই এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, শুধুমাত্র কণাধর্ম নিয়েই তিনি প্ল্যাঙ্কের সূত্রের পুনরাবিষ্কার করেন। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যদিও তিনি ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গবাদ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই প্ল্যাঙ্কের সূত্র পান, তবুও তরঙ্গের স্বভাব সমবর্তন [Polarisation] প্রত্যয়ের মাধ্যমে তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিলো ফেজ সেলের [Phase Cell] সংখ্যা নির্ণয় করতে। সুতরাং তাঁর অভিনব সংখ্যায়নের মূলে শুধুমাত্র কণাধর্ম আছে তা নয়, তরঙ্গধর্মও রয়েছে এবং এই তথ্যটি তাঁর প্রবন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে বলা না থাকলেও পরবর্তীকালে গবেষকরা তা প্রমাণ করেছেন। শক্তি প্রবাহের মধ্যে কণা ও তরঙ্গ ধর্ম যুগপৎ নিহিত আছে, এ তত্ত্ব দ্য ব্রগলি যেমন বলেছিলেন তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের ওই বিখ্যাত সংখ্যায়নেও শুধু কণাধর্ম নয়, তরঙ্গধর্মও যুগপৎ নিহিত আছে কিছুটা গৌণভাবে। আর উভয়েই এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন 1924 সালে। সত্যেন্দ্রনাথের নিবন্ধ প্রকাশিত হয় 1924-এর জুলাইয়ে, আর ব্রগলির ওই বছরেরই সেপ্টেম্বরে।

বসু ফোটনদের এক বস্তুকণার গ্যাস হিসাবে ধরে নিয়ে তাতে পরিসাংখ্যিক গতিবিদ্যার নিয়মাবলী প্রয়োগ করেন। তাঁর কাজে নতুনত্ব হলো ফোটন সম্বন্ধে এই অভিনব প্রস্তাব এবং পরিসাংখ্যিক রীতি। ফোটনকে সমষ্টির মধ্য থেকে এককভাবে ভাবা সম্ভব নয়। বস্তুকণাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক অবস্থার [States] মধ্যে বণ্টন না করে তিনি বের করলেন অবস্থাসমূহের সংখ্যা। এও দেখালেন, কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কণা যেন এক একটি অবস্থার পরিচায়ক হিসাবে থাকতে পারে। এই গণনাবলীর সঙ্গে তিনি প্রয়োজনীয় ভৌত শর্তাবলী জুড়ে দিলেন। এগুলি হল সামগ্রিক শক্তি ও অবস্থার সংখ্যার নির্দিষ্টতা। এই দুটির সাহায্যে তিনি নতুন করে প্ল্যাঙ্কের সূত্র আবিষ্কার করলেন। আইনস্টাইন এই কাজটি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য জুড়ে দেন মূল প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করার শেষে। তিনি বলেন, 'আমার মতে বোসের প্ল্যাঙ্কের সূত্র প্রমাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখানে ব্যবহৃত পদ্ধতির দ্বারা আদর্শ গ্যাসের কোয়াণ্টাম তত্ত্বও পাওয়া যায়, যা আমি অন্যত্র করে

দেখাবো।' [Bose's derivation of Planck's formula signifies, in my opinion, an important step forward. The method used here yields also the quantum theory of an ideal gas, which I shall discuss elsewhere.]

এমনি করে আইনস্টাইনের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান জগতে এক নতুন জ্যোতিষ্কের উদয় হল। পদার্থবিজ্ঞান নতুন মোড় নিল। এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের। যদিও এর আগে সত্যেন্দ্রনাথের তিনটি গবেষণাপত্র ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়, সেগুলি মূল্যবান হলেও তেমন বিশাল, গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না। কিন্তু এই গবেষণাপত্রটি ছিল ভুবন কাঁপানো। সত্যেন্দ্রনাথের নতুন সংখ্যায়ন নাম পেয়েছিল 'বোস সংখ্যায়ন' [Bose Statistics]। আইনস্টাইন একে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এর যে সমৃদ্ধি ঘটালেন তা নাম পেল 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' [Bose-Einstein Statistics] হিসাবে। এখন অবশ্য এর নাম 'বোস-সংখ্যায়ন' [Bose Statistics]—একথা আগেই বলা হয়েছে।

সংখ্যায়নের প্রথম গবেষণা-পত্র তৈরি করার পর সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পরের গবেষণাপত্রটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বানিয়ে ফেললেন এবং এটিকেও তিনি পাঠিয়ে দিলেন আইনস্টাইনের কাছে। অনুরোধ জানালেন, এটি অনুবাদ করে আগেরটির মত Zeitschrift fur Physik পত্রিকায় ছাপার ব্যবস্থা করতে।

অধ্যাপক বসুর দ্বিতীয় এই প্রবন্ধটিও আইনস্টাইন নিজে অনুবাদ করেন এবং এটি Zeitschrift fur Physik পত্রিকার 1924 সালেরই Bd-27 তম সংখ্যার 384 পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত হয় তাঁরই সাহায্যে। এই নিবন্ধটির শিরোনাম হলো, 'পদার্থের উপস্থিতিতে বিকিরণ ক্ষেত্রে তাপগতিবিদ্যাসম্মত সাম্য' [Thermal Equilibrium in Radiation Field in the presence of Matter]। গাণিতিক আলোচনা ও প্রমাণের দিক থেকে এই গবেষণাপত্রটি অসামান্য। কিন্তু আইনস্টাইন এই নিবন্ধের একটা পাদটীকা সংযোজন করে তিনি সে পাদটীকায় মন্তব্য করলেন যে, কয়েকটি বিষয়ে তিনি লেখকের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। যদিও প্রথম নিবন্ধের পাদটীকায় তিনি লিখেছিলেন যে, তাঁর মতে বোসের প্ল্যাঙ্কের সূত্রের প্রমাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এখানে ব্যবহৃত পদ্ধতির দ্বারা আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টাম-তত্ত্বও পাওয়া যায়, যা তিনি অন্যত্র করে দেখাবেন। আইনস্টাইনের এই মন্তব্যের ফলে প্রথম নিবন্ধটি যেমন বিশ্ব-বিখ্যাত হল; তেমনি তাঁর বিরূপ মন্তব্যের ফলে দ্বিতীয় নিবন্ধটি বিজ্ঞানী মহলে তেমন আমল পেল না। আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় উভয়েব মধ্যে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছিলো, কিন্তু কেউই যথোপযুক্ত বিচার দিয়ে অপর পক্ষের মনে দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদনে সমর্থ হন নি। ফলে, দ্বিতীয় নিবন্ধ ওই রকমই রয়ে যায়। অধ্যাপক বসু কিন্তু প্রথম নিবন্ধটির চেয়ে দ্বিতীয় নিবন্ধটিকে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আরও বেশি মূল্যবান মনে করতেন। তিনি মনে করতেন এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অবদান এবং আশা রাখতেন, ভবিষ্যতে হয়তো কোনও বৈজ্ঞানিক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্যক উপলব্ধি করে নিবন্ধটির প্রাপ্য মর্যাদা দেবেন।

দ্বিতীয় নিবন্ধটির মূল্যায়ন করে সুবোধনাথ বাগচী 1975-এর ফেব্রুয়ারীর 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় যা লিখেছিলেন তা একটু তুলে ধরছি। 1974 সালের 16ই ডিসেম্বর কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইনস্টিটিউট'-এ এই নিবন্ধটির উপর একটি সেমিনার হয়। এই নিবন্ধটির বিশেষ মূল্য হল পরমাণু বিকিরণের সাম্যাবস্থা কোন্ বিশেষ প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সে সম্পর্কে কোন বিশেষ প্রকল্পের অবতারণা না করেই, সাম্যাবস্থায় পরমাণু ও বিকিরণের মধ্যে কী সম্পর্ক থাকবে, তা স্থির করা যায়। এই সাধারণ সম্পর্ক থেকে বিশেষ বিশেষ কার্যকারণ প্রণালী মেনে নিয়ে যেসব সমীকরণ আসে, তাও পাওয়া যায়। সুতরাং বসুর পদ্ধতিতে পাওয়া ফল সত্য হওয়া উচিত। আইনস্টাইন একথা মেনে নিয়েছিলেন। আইনস্টাইনের প্রধান আপত্তি ছিল বসুর প্রকল্পে যে, পবমাণুর উপরের শক্তিস্তর থেকে নিম্নস্তরে আসবার সম্ভাবনায় বিকিরণের প্রভাব নেই। বর্তমানে এটা প্রমাণিত যে, আইনস্টাইনের মতই সত্য। অধ্যাপক বসুও আইনস্টাইনের এই আপত্তি মেনে নিয়েছিলেন। 1924 সালের 3রা নভেম্বর আইনস্টাইন তাঁকে যে পত্র লিখেছিলেন, সেটি পাওয়ার পর তিনি মত পরিবর্তন করেন। আইনস্টাইনের তৃতীয় পত্র থেকে, যা 27 শে জানুয়ারী 1925 সালে লেখা, তা বেশ ভালোভবে বোঝা যায়। তবু প্রশ্ন থেকে যায় যে, খুব সাধারণ একটি প্রকল্প থেকে যে সমীকরণ তিনি পেলেন তার সঙ্গে পরীক্ষিত ফলের সামঞ্জস্য কিভাবে জানা সম্ভব? সেটা সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না মেনে নেওয়া হয় যে, তাঁর প্রকল্পটাই অসম্পূর্ণ। বিকিরণ বন্টন ব্যবস্থা [Distribution) পরমাণু বন্টনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয়। পরমাণু ও বিকিরণের সাম্যাবস্থা নির্ভর করবে উভয়ের মিথস্ক্রিয়ার (Interaction) উপর। অধ্যাপক বাগচীর মতে সত্যেন্দ্রনাথের মূল পদ্ধতির অনুকরণে একটা সমীকরণ পাওয়া যাবে, যা পরীক্ষিত ফলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হবে। তবে এই দ্বিতীয় নিবন্ধটির উপর আরও সেমিনার, আরও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন, এর উপযোগিতার সঠিক মূল্যায়নের জন্য।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, 2001 সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনজন বিজ্ঞানী একসঙ্গে। এঁরা হলেন ঃ ব্রিক. এ. কর্নেল [Bric A Cornell], উলফগ্যাং কেটেরি [Wolfgang Katterie] এবং কার্ল. ই. ভিয়েম্যান [Carl E. Wieman]। 1924 খ্রিস্টাব্দে 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সময় আইনস্টাইন তড়িঘড়ি দুটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। ওই সংখ্যায়নের ব্যাখ্যা করেই আইনস্টাইন্ বলেছিলেন, যখন নির্দিষ্ট সংখ্যক কণাসমূহ পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসে এবং তাদের গতিবেগও যথেষ্ট ধীর হয়, তখন তারা সবচেয়ে কম শক্তি স্তরে [Lowest Energy State] অবস্থান করে। এর ফলে যে ঘনীভবন বা তরলন [Condensation] হয়, তাকে এখন আমরা বলি 'বোস-আইনস্টাইন ঘনীভবন' [Bose-Einstein Condensation বা BEC]। এই BEC তত্ত্বগতভাবে প্রমাণিত হলেও পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হচ্ছিল না। 1995 সালে উপরেব ওই তিন বিজ্ঞানী পরীক্ষাগারে প্রমাণ করেন বোস-আইনস্টাইন ঘনীভবন বা তরলন [BEC]। এই আবিষ্কারের জন্য ওই তিন বিজ্ঞানীকে একসঙ্গে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় 2001 খ্রিস্টাব্দে।

'বোস সংখ্যায়ন' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় 70 বছর পরে এই আবিষ্কার তরুণ বিজ্ঞানী ও

গবেষক মহলে প্রবল আলোড়ন এনেছে। সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটিতে এমনই অনেক বিষয় আছে যা আবিষ্কার তথা ব্যাখ্যার অপেক্ষায়। সারা পৃথিবী জুড়ে প্রায় 20টি বৈজ্ঞানিক দল এখন BEC নিয়ে গবেষণা করছেন। এই সব গবেষণার ফল সুদূর প্রসারী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পদার্থের এই অভিনব ঘনীভবন অবস্থার সম্পর্কে 9ই অক্টোবর 2001-এ নোবেল কমিটি বলেছেন, "The state was achieved in alkali atom gases, in which the phenomenon can be studied in a very pure manner. Nowhere else in the universe can one find extreme conditions which BEC in dilute gases represents."

বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন প্রকাশিত হওয়ার কিছুকাল পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সাহায্য নিয়ে দু-বছর গবেষণার জন্য তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। জার্মানীর পথে তিনি ভেনিস হয়ে প্যারিস পৌঁছালেন 1924 সালের অক্টোবর মাসে। তাঁকে ইউরোপ পাঠানোর ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে মন স্থির করতে পারছিলেন না। তখনও ওঁরা ঠিক করে উঠতে পারেন নি ওঁকে ইউরোপ পাঠাবেন কিনা, কেন না ওঁর খ্যাতি তখনও ছড়িয়ে পড়ে নি। সত্যেন্দ্রনাথ তখন তাঁদের আইনস্টাইনের লেখা ছোট্ট সেই পোস্টকার্ডটি দেখালেন যাতে তিনি অধ্যাপক বসুকে লিখেছিলেন যে, যদিও কয়েকটি বিষয়ে তাঁর নিজে মতের সঙ্গে অমিল আছে, তবুও তাঁর ধারণা এটি একটি বিশেষ মূল্যবান কাজ হয়েছে এবং তিনি নিজে এর জার্মান অনুবাদ করে প্রকাশ করছেন। আইনস্টাইন এই পোস্টকার্ডটি লিখেছিলেন অধ্যাপক বসুর ওই দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পাওয়ার পর যারা কথা একটু আগেই বলা হয়েছে। এই পোস্টকার্ড দেখেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আর দ্বিধা করেন নি। ফলে তিনি ইউরোপ যান। এই সময় জার্মানীতে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পান ও নানান আলোচনা করেন। ফ্রান্সে মাদাম কুরীর ও দ্য ব্রগলিদের গবেষণাগারেও তিনি কিছুদিন কাজ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় বার পাঠানো গবেষণাপত্রের সঙ্গে আইনস্টাইনকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার বয়ান ছিল এইরকম ঃ

Physics Laboratory
Dacca University
Dacca, India
15th June, 1924

Respected Master,

I send herewith another paper of mine for your kind perusal and opinion. I hope my first paper has reached your hands. The result to which I have arrived seems rather important (to me at any rate). You will see that I have dealt with the problem of thermal equilibrium between Radiation and Matter in a different way, and have arrived at a different law for the probability for elementary particles. which seems to have simplicity in its favour. I have ventured to send you the type-written paper in English. It being beyond me to express myself in German (which will be intelligible to you), I shall be glad if its publication in Zeitschrift fur Phyasik or any other German Journal can be

managed. I myself know not how to manage it. In any case. I shall be grateful if you express your opinion on the papers and send it to me at the above address.

Yours truly,

S. N. Bose

আইনস্টাইনকে প্রথম চিঠিটি সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 4ঠা জুন, 1924 খ্রীষ্টাব্দ। আর দ্বিতীয়টি তিনি আইনস্টাইনকে লিখলেন 15ই জুন, 1924 খ্রীস্টাব্দ। অর্থাৎ এগারো দিনের মধ্যে তিনি ঢাকা থেকে দু'বার পত্রাঘাত করলেন বিশ্বখ্যাত আইনস্টাইনকে।

এটা খুবই আশ্চর্যজনক এবং দুঃখের ঘটনা যে সত্যেন্দ্রনাথের এই দুই বিখ্যাত গবেষণা-পত্রের জার্মান থেকে ইংরেজী অনুবাদ অনেক পরে 1974 সালে একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় এপ্রিল মাসের 'ফিজিক্স টীচার' পত্রিকায় এবং জুন মাসের 'ফিজিক্স নিউজ' পত্রিকায়। ফিজিক্স টীচার পত্রিকাটি হল 'Indian Physical Society'-র মুখপত্র এবং অন্যটি 'Indian Physics Association'-এর। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এগুলি ভারতবর্ষের কোনও পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হল—এটাই সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়।

অধ্যাপক বসু তাঁর বিদেশ ভ্রমণকালে বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। অধিকাংশের সঙ্গেই তাঁর সুগভীর বন্ধুত্ব হয়। প্যারিসে যেমন সিলভাঁ লেভি, জ্যাকেলিন, দ্য ব্রগলি ভ্রাতৃদ্বয়, লাজভাঁ, মাদাম কুরী প্রমুখের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়েছিল, তেমনি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল জার্মানীতে বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে ছিলেন ঃ আইনস্টাইন, ফ্রিজ হ্যাবার [Fritz Haber], অটো হান [Otto Hahn], লিজে মেইটনার [Lise Meitner], ওয়াল্টার বোথে [Walter Bothe], হ্যানস গাইগার [Hans Geiger], পিটার ডিবাই [Peter Debye], লাও [Von Laue], পউলি [Wolfgang Pauli], হাইজেনবার্গ [Werner Heisenberg] প্রভৃতি।

প্যারিসে পৌঁছানোর কয়েকদিন পরে সত্যেন্দ্রনাথ আইনস্টাইনকে তাঁর দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটির ভবিষ্যৎ জানতে চেয়ে চিঠি লিখেন। এতে তিনি আইনস্টাইনের অধীনের গবেষণার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। তাঁর অনুমতিও চান।

এই সময় সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম পাঠানো নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়ে গেছে বিখ্যাত 'ৎসাইটশ্রিফট ফুয়ের ফিজিক' [Zeitschrift fur Physik] পত্রিকায়। দ্বিতীয়টি প্রকাশের অপেক্ষায়।

ওই চিঠির উত্তরে আইনস্টাইন লিখেছিলেন ঃ

Dr. S. Bose
17, Rue du Sommerard
Paris.

Berlin W 30
3 November, 1924

Dear Colleague,

Thank you sincerely for your letter of 26 October. I am glad that I shall have the opportunity soon of making your personal acquaintance Your papers have already appeared sometime ago Unfortunately the reprints have

been sent to me instead of you. You may have them at any time. I am not in agreement with your basic principle concerning the probability of interaction between radiation and matter, and have given the reason in a remark which has appeared together with your paper. Your principle is not compatible with the following two conditions.

1] The absorption coefficient is independent of the radiation density.

2] The behaviour of a resonator in a radiation field should follow from the statistical laws as a limiting case.

We may discuss this together in detail when you come here.

With kind regards,

Yours

A. Einstein

আইনস্টাইনের নজরে না এলে সত্যেন্দ্রনাথের এই সব মৌলিক আবিষ্কার কোনও স্বীকৃতি পেতো কি না সন্দেহ। বিজ্ঞান বঞ্চিত হত এই সব আবিষ্কার থেকে। সত্যেন্দ্রনাথ আইনস্টাইনকে 'গুরু' বলে মানতেন। তিনি ছিলেন দ্রোণশিষ্য একলব্যের মত। গুরু শিষ্যে দেখা নেই। পত্রের মাধ্যমেই তাঁদের যোগাযোগ। সত্যেন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের নাম মুখে বলতেন না। ভারতীয় গুরুবাদের নিয়মে গুরুর নাম উচ্চারণ করতে নেই। তাই আইনস্টাইন সম্পর্কে বলতে হলে তিনি বলতেন, 'গুরু' বা 'কর্তা' বা 'সাহেব'। সত্যেন্দ্রনাথ তিন জনকে 'কর্তা' সম্বোধন করতেন তাঁদের কথা বলার সময়। একজন তাঁর পিতা সুরেন্দ্রনাথ, অন্যজন হলেন স্যার আশুতোষ এবং তৃতীয় জন হলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

অনেকে মনে করেন গুরু আইনস্টাইন শিষ্য সত্যেন্দ্রনাথকে যথাযথ স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন নি। প্রথম. গবেষণাপত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেছিলেন আইনস্টাইন। সেটির থেকে প্রতিষ্ঠিত হল 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন'। দ্বিতীয় গবেষণা নিবন্ধটি আইনস্টাইন নিজে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে ছাপার ব্যবস্থা করলেও নিবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেন নি। দুটি বিরূপ মন্তব্য জুড়ে দিয়েছিলেন তিনি, যাদের কথা আইনস্টাইন বলেছেন তাঁর 3 নভেম্বর, 1924-এর চিঠিতে। অথচ সত্যেন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, তাঁর দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটি প্রথমটির চেয়ে উৎকৃষ্টতর ছিল। যেহেতু 'কর্তা'-র বিরূপ মন্তব্য ছিল প্রাকশিত নিবন্ধটির সঙ্গে তাই বিশ্বের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীরা আর দ্বিতীয় নিবন্ধটি নিয়ে মাথা ঘামান নি। দ্বিতীয় নিবন্ধের সমালোচনার উত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ তৃতীয় একটি নিবন্ধ পাঠান আইনস্টাইনের কাছে প্যারিস থেকেই। পাঠানোর আগে তিনি নিবন্ধটি লাজভাঁকে দেখান। লাজভাঁ জানালেন এটি অতি মূল্যবান এবং প্রকাশের উপযোগী। কিন্তু আইনস্টাইন তা প্রকাশ করলেন না।

পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীদের অভিমত হল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নিবন্ধের বিশ্লেষণে গুরু-শিষ্য উভয়েই সঠিক ছিলেন না। অনেকেই প্রশ্ন করেন, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর তৃতীয় নিবন্ধটি অন্যত্র প্রকাশের জন্য দিলেন না কেন? এটা সম্ভবতঃ তাঁর লাজুক স্বভাব ও গুরুভক্তির জন্য সম্ভব হয় নি। এ ব্যাপারে তাঁর গুরুভক্তি কেবল একলব্যের সঙ্গেই তুলনীয়।



পরিণত বয়সে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ [1894-1974]



বার্ধক্যে সত্যেন্দ্রনাথ [1894-1974]

সত্যেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, 'দুঃখ পেয়েছিলুম'। অর্থাৎ তৃতীয় নিবন্ধটির সঙ্গে গুরু আইনস্টাইন একমত না হওয়ায় তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন। কিন্তু এটা অন্যত্র প্রকাশের চিন্তা কখনও তাঁর মাথায় আসে নি। তিনি হয়তো ভাবতেন নিবন্ধটি অন্যত্র প্রকাশ করলে গুরুকে অর্থাৎ আইনস্টাইনকে অসম্মান করা হবে। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তো তখন বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানীর পরিচয় হয়ে গেছে। তিনি ইচ্ছা করলে ওঁদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারতো। কিন্তু তিনি তা করেন নি। পুরোপুরি গুরু নির্ভরতার কারণেই তিনি গুরুর মতের বিরুদ্ধাচরণ করতে প্রবৃত্ত হন নি। সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রের এটি এক মহান প্রাচ্য-বৈশিষ্ট্য।

প্যারিসে প্রায় এক বছর কাটানোর পর সত্যেন্দ্রনাথ বার্লিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। 14ই অক্টোবর, 1925 খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইনস্টাইনের কাছে খবর পাঠান তাঁকে দর্শনের ইচ্ছা জানিয়ে। আইনস্টাইন তখন বার্লিনে ছিলেন না। বার্লিনে ফেরার পর তাঁর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। ইতিমধ্যে বার্লিনে সত্যেন্দ্রনাথ বেশ কয়েকজন বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানীর সঙ্গে পরিচিত হন।

এরপর নির্দিষ্ট দিনে গুরু-শিষ্যের সাক্ষাৎ ঘটল। আইনস্টাইনের 5 নং হাবেরল্যান্ড স্ত্রাসের ছোট্ট ফ্ল্যাটে সত্যেন্দ্রনাথ হাজির হলেন নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে। ছোট্ট চিরকুটে আগমন সংবাদ পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন। ছোট ঘর। দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর দেখা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ দেখলেন মহাবিজ্ঞানী পায়চারি করতে করতে কথা বলছেন অন্য এক অতিথির সঙ্গে। আইনস্টাইন সাধারণত পায়চারি করতে করতে কথা বলতেন, আলোচনা করতেন। এলসা এসে সত্যেন্দ্রনাথকে জানিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে থাকা অতিথির সঙ্গে আলোচনা শেষ হলেই তাঁর ডাক পড়বে। এলসা আবার সত্যেন্দ্রনাথকে শুনিয়ে গেলেন জার্মানীতে আসা এক বাঙালী গবেষকের কাহিনী, যিনি এক জার্মান তরুণীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তখন। মেয়েদের পেটে কথা যে চাপা থাকে না তারই প্রমাণ যেন দিলেন শ্রীমতী আইনস্টাইন।

এক সময় সত্যেন্দ্রনাথকে ডাকলেন আইনস্টাইন। ইংরেজীতে তিনি আলাপ করলেন সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে। সেই থেকে তাঁর বাড়িতে নিয়মিত যাওয়ার ও নানা বিষয়ে আলোচনার বিরল সুযোগ হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের। আইনস্টাইন বিজ্ঞানের অনেক দুরূহ বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন ও তাঁর মতামত জেনে নিতেন। এই সময় সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিবন্ধ দুটি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। কিন্তু গুরু কিংবা শিষ্য কেউই সম্ভবতঃ তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্য সঠিকভাবে একে অপরের কাছে তুলে ধরতে পারেন নি। ফলে, প্রবন্ধ দুটি ওই অবস্থাতেই থেকে যায়। সে সময় ওদের বিস্তারিত মূল্যায়ন আর সম্ভব হয় নি।

আইনস্টাইন তখন তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র এবং মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রকে একীভূত করার গবেষণায় নিমগ্ন হয়েছেন। ফলে, পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত গবেষণা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই সত্যেন্দ্রনাথ সে সময় আইনস্টাইনের অধীনে গবেষণার সুযোগ পেলেন না। তা না হলেও,

তাঁদের মধ্যে বহু আলোচনা হয়েছিল পদার্থবিজ্ঞানের নানা দুরূহ বিষয়ে। আইনস্টাইন তাঁকে একটা পরিচয়-পত্র লিখে দিয়েছিলেন, যার ফলে সত্যেন্দ্রনাথের অবাধ গতি সম্ভব হয়েছিল সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার। সরকারী গ্রন্থাগার থেকে তিনি এক সঙ্গে ছ'খানা বই বাড়ি নিয়ে যেতে পারতেন কোনো টাকা জমা না দিয়েই। বার্লিনের বহু গবেষণাগারেও ছিল তাঁর অবাধ গতি। বহু বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানীর সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয় এই সময়। এ সবেরই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন স্বয়ং আইনস্টাইন। এই সময় হাইজেনবার্গ তাঁর কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান [Quantum Mechanics] সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করেন। আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই হাইজেনবার্গের এই গবেষণাপত্রটি নিয়ে আলোচনা করতেন সে সময়। সত্যেন্দ্রনাথ জার্মানীতে থাকাকালীন 1926 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকের পদ বিজ্ঞাপিত হয়। ঢাকা থেকে সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধুরা অনুরোধ পাঠালেন, যেহেতু সত্যেন্দ্রনাথের পি এইচ ডি নেই সে কারণে তিনি দরখাস্তের সঙ্গে যেভাবেই হোক আইনস্টাইনের একটা প্রশংসাপত্র যেন জুড়ে দেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে তেমন গা করেন নি। পরে তিনি আইনস্টাইনকে সব কথা বললেন এবং চাইলেন তাঁর সুপারিশপত্র। আইনস্টাইন বিস্মিত হয়ে বললেন, "তুমি যে গবেষণা করেছ তাই যথেষ্ট নয়? তুমি কি জানো তোমার গবেষণা থেকে ক'ঝুড়ি পি এইচ ডি হয়? তোমার দেশের নিয়মকানুন আমি কিছুই বুঝি না। আমারও তো পি এইচ ডি নেই।" আইনস্টাইন প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকের ওই পদে মনোনীত করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসুকে। অবশ্য দ্বিতীয় স্থানে তাঁরা রেখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথকে। দেবেন্দ্রমোহন নানা কারণে ঢাকা যেতে চাইলেন না। ফলে সত্যেন্দ্রনাথই অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। সত্যেন্দ্রনাথ দু'বছর ইউরোপে কাটানোর পর ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হলেন।

ঢাকায় থাকাকালীন সত্যেন্দ্রনাথ যে সব গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছে ঃ 'D2 Statistics', Total Reflection of Eelectromagnetic Waves in the Ionosphere,' 'On Lorentz Group' [আপেক্ষিকতা সম্পর্কিত], 'On an Integral Equation of the Hydrogen Atom Problem' ইত্যাদি। কিন্তু তিনি আর কখনও বিকিরণ [Radiation] নিয়ে কোনও গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন নি। অনেকে মনে করেন, বিকিরণ নিয়ে প্রকাশ করা তাঁর গবেষণাপত্র তিনটির শেষের দুটি আইনস্টাইনের কাছে যথোপযুক্ত সমাদর না পাওয়ায় সত্যেন্দ্র সম্ভবতঃ কিছুটা অভিমানেই বিকিরণ সম্পর্কে আর গবেষণা করেন নি। আগেই বলেছি, সত্যেন্দ্রনাথ আইনস্টাইনকে 'গুরু' বলেই মানতেন। 'গুরু' কিন্তু শিষ্যকে সঠিক উচ্চতায় উঠতে সাহায্য করেন নি বলে অনেকের ধারণা। এ ব্যাপারে সত্যেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন, 'আমার যা পাবার আমি পেয়েছি'। তবুও তিনি তাঁর জীবনের শেষ সময়ে, তাঁর অশীতিতম জন্মদিনের সম্বর্ধনাকালীন কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেম, আইনস্টাইনের কাছে পাঠানো তাঁর দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটি বিজ্ঞানীদের কাছে যথাযথ সমাদর পায় নি, যদিও তা পাওয়া উচিত ছিল।

সবাই আশা করেছিলেন, রমেশচন্দ্র মজুমদারের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হবেন সত্যেন্দ্রনাথ। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাঁর উপাচার্য হওয়া নিয়ে নানা বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি তাঁর কাছে ক্রমশঃ অসম্মানজনক হয়ে উঠে। তাই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে 1945 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের 'খয়রা অধ্যাপক' হয়ে। তবু বলা যায়, ঢাকাতে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের সেরা এবং সবচেয়ে সুখী সময় কাটিয়েছেন।

1945 সালে সত্যেন্দ্রনাথ কলাকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। কলকাতা আসার পর 1948 সালে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামের বাংলা বিজ্ঞান মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। 1949-50 সাল তিনি হন ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের সভাপতি। 1951 সালে UNESCO-র আহ্বানে আন্তর্জাতিক পরিগণন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনার জন্য ভারতের বিশেষ প্রতিনিধিরূপে প্যারিসে যান এবং আর একবার ঘুরে আসেন ইংল্যান্ড ও জার্মানী। 1952 সালে সত্যেন্দ্রনাথ রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। 1958 সাল অবধি তিনি ওই পদে থাকেন। 1954 সালে তাঁকে সম্মানিত করা হয় 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে।

1955 সালে সত্যেন্দ্রনাথ যোগ দেন 'আপেক্ষিকতাবাদের 50 বছর' পূর্তি উপলক্ষে সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। 1956 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর নেন। ওই বছরই তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে যোগ দেন।

বিশ্বভারতীতে উপাচার্য হিসাবে তাঁর দিনগুলি নানা অসাফল্যের কথাই বলে। অথচ শান্তিনিকেতনে তাঁর অসফল হওয়ার কথাই নয়। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার আন্দোলন তিনিই শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও চাইতেন শিক্ষার বাহন হোক মাতৃভাষা। মাতৃভাষাই এক্ষেত্রে মাতৃদুগ্ধ। আশুতোষের বিরুদ্ধে সত্যেন্দ্রনাথের একটাই অভিযোগ ছিল যে, বাংলা ভাষাকে তিনি কলাকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযথ মর্যাদা দেন নি। আর আশুতোষ চাইতেন ইংরেজী ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হোক। রবীন্দ্রনাথ চাইতেন বাংলাই আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হোক। সত্যেন্দ্রনাথ চাইতেন বাংলা তথা মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা করাই আমাদের ব্রত হোক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিজ্ঞানগ্রন্থ 'বিশ্ব পরিচয়' সত্যেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন একথা আগেই বলা হয়েছে। তবু শান্তিনিকেতনে থাকার সময়টা তাঁর কাছে সুখকর ছিল না মোটেই।

1957 সালে কলকাতা, যাদবপুর এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে। 1958 সালে তিনি FRS হন। ওই বছরই তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদ থেকে ইস্তফা দেন। 1959 সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ভারতের অধ্যাপকদের সেরা সম্মান হলো এই জাতীয় অধ্যাপকের [National Professor] পদ। 1961 সালে বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' সম্মানে ভূষিত করে।

সত্যেন্দ্রনাথ বলতেন ঃ "যাঁরা বলেন, ইংরেজি যদি কম শেখানো হয় তাহলে আমাদের দেশের জানালা বন্ধ করে দেওয়া হবে যার মধ্য দিয়ে আসে জ্ঞানের আলো ও স্বাধীনতার

বাতাস, তাঁরা ভুল ধারণা করেছেন যে, চিরকাল ভারতবর্ষের চতুর্দিকে কারাগারের উঁচু পাঁচিল থাকবে এবং আলো আসবে উপর থেকে যেটা কেবলমাত্র উপরতলার শিক্ষিত লোকের কাছেই পৌঁছাবে এবং সেটা তাঁরা যেমন বুঝবেন সেই রকম নিচের লোকদের কাছে পৌঁছে দেবেন। এইভাবে দেশের উন্নতি করা কষ্টদায়ক। তাছাড়া সকলের দায়িত্ব অল্পসংখ্যক লোকের একটি শ্রেণীর উপর চিরকালের জন্য চাপানো উচিত নয়।"

তিনি বলেছেন ঃ "শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা...। বিচ্ছিন্ন মনোভাব দূর করে সংহতি সৃষ্টির কাজ মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজেই হতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন একটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে তাঁর জীবনের বিশ্বভারতী-পর্ব শেষ করা যাক। বিশ্বভারতীতে তাঁর অবস্থান খুবই সংক্ষিপ্ত। দু'বছরের সামান্য কিছুটা বেশি। 1959 সালে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। ফিরে এলেন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে। রেহাই পেলেন প্রশাসনিক ভাবনা-চিন্তা, উদ্বেগের হাত থেকে। বন্ধু দিলীপ কুমার রায়কে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদ থেকে রেহাই পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। কারণ বিশ্বভারতীর প্রশাসনিক কাজকর্ম তাঁর কাছে ক্রমশঃই বোঝা হয়ে উঠছিল। যাই হোক, একবার অন্নদাশঙ্কর রায় শান্তিনিকেতনে এলেন সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। অন্নদাশঙ্কর এসে দেখলেন সত্যেন্দ্রনাথ বিছানায় বসে আছেন মশারির মধ্যে। অন্নদাশঙ্কর ভাবলেন সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থ। উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা। উত্তরে জানলেন যে, মশা তাঁর মন-সংযোগের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। তাই সত্যেন্দ্রনাথ মশারির মধ্যে বসেছেন। অন্নদাশঙ্কর দেখলেন সত্যেন্দ্রনাথ মন দিয়ে পাঠ করছিলেন একটি প্রাচীন শিলালিপির অনুলিপি। জিজ্ঞাসু অন্নদাশঙ্করের কৌতুহল মেটাতে সত্যেন্দ্রনাথ জানালেন যে, সেটি সম্রাট অশোকের একটি শিলালিপির অনুলিপি। সিরিয়া-দেশীয় বা আরাম-দেশীয় [Aramaic] লিপিতে লেখা। সত্যেন্দ্রনাথ অ্যারামেইক লিপি পাঠ করার চেষ্টা করছিলেন। আরও বড় কথা ওই অনুলিপি তখন সদ্য আবিষ্কৃত হয়েছিল আফগানিস্তানে এবং অন্নদাশঙ্কর রায় সে আবিষ্কারের কথাই তখনও শোনেন নি। অথচ সেই লিপি পাঠের চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে মশারির মধ্যে বসে, যাতে মশা তাঁর মনসংযোগ নষ্ট না করতে পারে। আরেক দিন অন্নদাশঙ্কর শান্তি নিকেতনে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে দেখলেন তিনি মন দিয়ে সংস্কৃত নাটক 'চারুদত্ত' পড়ছেন এবং তাও দেবনাগরী হরফে লেখা বই থেকে। নানা ভাষা জানতেন এই বিজ্ঞানী। তাই তাঁর পক্ষেই সঠিকভাবে বলা সম্ভব ছিল কোন্ ভাষা বিজ্ঞান-চর্চার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। আর তিনিই বলেছিলেন যে, সে ভাষা হ'ল মাতৃভাষা।

1961 সালে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে। ওই বছর মে মাসে সুইডেনের এস্‌কিলস্টুনা শহরে বিশ্বশান্তি সংসদের প্রস্তুতি কমিটির সম্মেলনে যোগ দেন সত্যেন্দ্রনাথ এবং সেপ্টেম্বরে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনেও যোগ দেন তিনি। আগস্ট মাসে টোকিওতে যোগ দেন 'বিজ্ঞান ও দর্শন' সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে। আবার অক্টোবরে হায়দ্রাবাদে 'আংরেজি হঠাও' সম্মেলনেও যোগ দেন

তিনি। 1963 সালের মার্চ মাসে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়েব সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেন তিনি। জুলাই মাসে ভারতীয় বিজ্ঞানীদলের প্রতিনিধি হয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের আমন্ত্রণে কায়রো যান সত্যেন্দ্রনাথ। 1964 সালে সত্যেন্দ্রনাথের বয়স সত্তর বছর পূর্ণ হয়। মহাজাতি সদনে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নিজস্ব ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ওই বছর তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি দেন। সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় তাঁকে ভূষিত করে 'বিজ্ঞান ভাস্করম্' উপাধিতে ওই 1961 সালেই। 1973 সালে এশিয়াটিক সোসাইটি তার 190 বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁকে 'ফেলো' নির্বাচিত করে।

বোস-সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব প্রথম দেন অধ্যাপক ই সি জি সুদর্শন। প্রস্তাব দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে। ইন্দিরা গান্ধী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং সর্বভাবতীয় কমিটির তিনিই ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। কলকাতা, দিল্লী ও ব্যাঙ্গালোরে বোস-সংখ্যায়ন ভিত্তিক আলোচনা সভা বা সেমিনার আয়োজিত হয়। 1974 সালের 1লা জানুয়ারী বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে সত্যেন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই ভবনটির নাম এখন 'সত্যেন্দ্র ভবন'। এখানে তিনি বলেছিলেন, 'এবার যাবার পালা, তাব ডাক কানে শুনছি।' সত্যেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন পৃথিবীতে তাঁর বেশি দিন নেই। সাত দিন পরে ৪ই জানুয়ারীর সভায়ও তিনি বলেছিলেন, 'বিদায়ের ধ্বনি কানে বাজে'। অর্থাৎ তিনি যেন আসন্ন মৃত্যুর আভাস পাচ্ছিলেন। এই সময়ের চিঠিপত্রেও তিনি বলেছেন 'আর সময় নেই।'

এই সময় তিনি প্রায় প্রতিদিন কোনও না কোন সভায় গেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ এই সময় তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। বিজ্ঞান কলেজে উনি প্রায় 45 মিনিট ধরে এক দীর্ঘ এবং মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। জানুয়ারি মাসেই এক সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ জন্মোৎসব উপলক্ষে হেদুয়ার কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে দু'ঘণ্টা বসে সভা করার ফলে তাঁর ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া হল। সারা জীবন উনি ডাক্তারদের উপদেশ মেনে চলতেন। কিন্তু জীবনের শেষে এসে অশক্ত শরীর নিয়েও সভা-সমিতিতে গেলেন প্রায় বেপরোয়াভাবেই। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'মানুষ যে আমাকে চাইছে।' তাঁর গুরু আইনস্টাইনও এমনি মানব দরদী ছিলেন। 22 শে জানুয়ারী, 1974 খ্রীস্টাব্দ। হাওড়ার এক ছাত্রগোষ্ঠীর সভায় তিনি তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ রাখলেন।

24শে জানুয়ারী, 1974 খ্রীস্টাব্দ তিনি অসুস্থ হলেন। রোগেব মাত্রা বাড়ছে কমছে। সবাই ধরে নিয়েছিল বিজ্ঞানী নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবেন। ওঁর বাবা বেঁচেছিলেন 95 বছর। সবাই ভেবেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ অন্ততঃ 90 বছর বাঁচবেন। ডাক্তারেরাও বললেন, ভয়ের কারণ নেই। 1লা ফেব্রুয়ারি 1974 সাল। ওঁর ছোট বোন এলেন দাদাকে দেখতে। বোন দাদার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, "দাদা, আজ কেমন আছ"? অদ্ভুত একটা উত্তর দিয়েছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এই বিজ্ঞানী। বললেন, 'দাদা, কাকে দাদা বলছ, দাদা তোমার নেই'। এ যেন সব সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া অতীন্দ্রিয় অবস্থা। কিন্তু তাঁর

কণ্ঠস্বর ছিল বেশ স্বাভাবিক। বোন দেখলেন দাদা বেশ ভালো আছেন। তাই ওই অলক্ষুণে কথা নিয়ে মাথা ঘামালেন না।

2রা ফেব্রুয়ারী শনিবার। মজলিশের দিন। তাঁর ইচ্ছামত ঘরের চেয়ার সব সাজানো হল। কেউ এলেন, কেউ এলেন না। কেউ ফোনে খবর নিলেন আচার্য কেমন আছেন। ডাক্তারের নির্দেশ, আচার্যের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। দরজায় সে বিজ্ঞপ্তি লটকে দেওয়া হল। ফলে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা অন্য ঘরে চা-বিস্কুট খেয়ে চলে গেলেন। জেনে গেলেন বিজ্ঞানী ভালো আছেন। শনিবারের মজলিশ বসল না। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্বগতোক্তি করলেন, 'আজ আর কেউ এল না রে।' দুপুর বেলায় তিনি অঙ্ক নিয়ে বসলেন। তাতে বেশ কিছুটা সময় মনোনিবেশ করলেন। সংখ্যাতত্ত্বের এক মৌলিক সমাধান নিয়ে সেই সময় তিনি মাথা ঘামাচ্ছিলেন কিছুদিন। সেই অঙ্ক নিয়েই বসলেন। সেই তাঁর শেষ চেষ্টা।

3রা ফেব্রুয়ারী 1974 খ্রীস্টাব্দ। সকাল থেকেই তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকল। সারাদিন কাটল ঘোরের মধ্যে। রাত্রে কষ্ট, যন্ত্রণা, অস্থিরতা বাড়ল। 4ঠা ফেব্রুয়ারী ভোরের আলো ফুটল। সেই সময়ই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মহাপ্রয়াণ হল এই মহাবিজ্ঞানীর। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করলেন।

বিজ্ঞানী এম. জি মেনন সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বেতারে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে বলেছিলেন যে, দেশে এবং বিদেশে বহু আন্তর্জাতিক স্তরের বিজ্ঞানীকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—সত্যেন্দ্রনাথকে কেন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো না? এর কোনো সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেন নি। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ই সি জি সুদর্শনের মতে 'গুরু' আইনস্টাইন 'শিষ্য' সত্যেন্দ্রনাথকে যথার্থ জায়গায় উন্নীত করতে সাহায্য করেন নি। বিজ্ঞানী অধ্যাপক বীরেন্দ্র সিং মনে করেন : "If Einstein had been more generous, Bose's rank would have been higher. But then he never ran after accolades."

অধ্যাপক জি. ভেঙ্কটরমনের মতে নোবেল কমিটি সত্যেন্দ্রনাথের ব্যাপারটা সঠিকভাবে বিচার করেন নি। কোয়ান্টাম পরিসাংখ্যিক বলবিদ্যার [Quantum Statistical Mechanics] প্রাথমিক আবিষ্কারক চারজন বিজ্ঞানীর মধ্যে তিনজনই নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, কিন্তু চতুর্থজন সত্যেন্দ্রনাথ সে সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। জি ভেঙ্কটরমন লিখেছেন :

"I should perhaps add a little note here. Today one talks of Bose-Einstein (B-E) and Fermi-Dirac (F-D) statistics.

These labels give proper credit to the founding fathers of quantum statistical mechanics. It is interesting that three of the four people involved won the Nobel Prize ; only Bose failed to. Not that he was never nominated He was in fact nominated many times but the Nobel Comittee failed to honour him. This happens at times, and the classic case is that of Mahatma Gandhi who was consistently overlooked for the Nobel Peace prize Of course Gandhiji was far above the Prize but I cite this example just to show you how those who give awards are sometimes blind."

সত্যেন্দ্রনাথ 'বারোজনা' নামে সান্ধ্যসভার এক গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-ইতিহাসের অধ্যাপকরা বারোজনার আড্ডায় যেতেনই, কলকাতা থেকেও অনেকে ঢাকায় যেতেন ওই আড্ডায় যোগ দিতে। বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী দ্বিজেন্দ্র-পুত্র দিলীপকুমার রায় ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দিলীপকুমার বারোজনার সভায় এলে সংগীতের আসর বসত। সত্যেন্দ্রনাথ খুব ভালো এসরাজ বাজাতেন। এসরাজে নানা নতুন রাগ-রাগিনী সৃষ্টির চেষ্টাও তিনি করতেন। 'গুরু' আইনস্টাইনের বেহালা বাজানোর মত 'শিষ্য' সত্যেন্দ্রনাথ বাজাতেন এসরাজ।

একটা সময় ছিল যখন প্ল্যাঙ্ক-হাইজেনবার্গ -ডিরাক-ফের্মি-সোমারফিল্ড-লুই দ্য ব্রগলি-বোস প্রমুখ নামগুলি একসূত্রে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ যখন বোস-সংখ্যায়ন আবিষ্কার করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র তিরিশ বছর। এছাড়াও তিনি তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে কাজ করেছেন, যেমন, কণাবিদ্যা, বর্ণালি, আপেক্ষিকতাবাদ, একস-রে, জৈব রসায়ন, সংখ্যায়ন, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব, উচ্চ বায়ুমণ্ডল, বক্রেশ্বর গ্যাস প্রকল্প ইত্যাদি। এগুলিতে তিনি কাজ করেছেন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে। ফলিত গবেষণাও অনেকগুলি করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ। এগুলির মধ্যে জৈব রসায়নে তাঁর অবদানগুলিও স্মরণীয়।

ঢাকার 'বারোজনা'-র মতই কলকাতায় তাঁর বাড়ীতে বসত একটি সভা। এই সভার নাম দেওয়া হয়েছিল 'শনিবারের সম্মিলনী'। 'বারোজনা' নামটা দিয়েছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি তখন ছিলেন বারোজনার কনিষ্ঠতম সদস্য। কলকাতার শনিবারের সম্মিলনী সভায় আসতেন ঃ গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, হারীতকৃষ্ণ দেব, জীবনতারা হালদার, শচীন্দ্রনাথ সরকার, নীরেন্দ্রনাথ রায়—এঁরা সবাই সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু ; স্বামী শঙ্করানন্দ, হিরণ কুমার সান্যাল, সুবিমল লাহিড়ী, জ্ঞানেন্দ্র লাল ভাদুড়ী, বিষ্ণুপদ মুখার্জি, রাধারমণ মিত্র, সুহৃদ সিংহ, নন্দলাল মিত্র, মেজর সত্যেন বোস, জে এন মৈত্র, বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, মণি বাগচী, কবি বিষ্ণু দে, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, সুনীলকুমার চ্যাটার্জি এবং ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক। এই সভার ঋত্বিক ছিলেন অবশ্যই সত্যেন্দ্রনাথ। এই সভা চালু ছিল সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন অবধি।

কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে তিনি একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। যন্ত্রটির নামকরণ করেন সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্র হর্ষনারায়ণ বসু। তিনি নাম দেন 'Scanning Spectro-Photometer'। এই ধরনের ছোট বড়ো নানা যন্ত্র নানা প্রয়োজনে তিনি বানিয়েছিলেন নিজের হাতে। হর্ষনারায়ণ বসু সত্যেন্দ্রনাথ নির্মিত Scanning Spectro-Photometer ইংল্যান্ডে নিয়ে যান। সেখানকার কয়েকজন বিজ্ঞানী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন এই যন্ত্রটির উদ্ভাবক 'বোস' কে? উত্তর শুনে তাঁরা আশ্চর্য হন এইজন্য যে, বসু-সংখ্যায়নের 'বোস' এবং এই যন্ত্রের নির্মাতা 'বোস' একই ব্যক্তি। তাঁদের চমৎকৃত হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, একজন বিখ্যাত তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী এমন সুন্দর একটি যন্ত্রের নির্মাতাও।

অধ্যাপক বসু মূলতঃ তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী হলেও পরীক্ষামূলক পদার্থ বিদ্যা ও জৈব

রসায়নেও তাঁর অবদান কম নয়। বিশেষ করে জৈব রসায়নের গবেষণাগুলি তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। তিনি পিরিডিন [Pyridine]-এর সঙ্গে পি-অ্যাসিটাইল-অ্যামিনো-বেনজিন-সালফোনেজাইড [p-acytyle-amino-benzene-sulphonazide] এবং পি-টল্যুইন-সালফোনেজাইড [p-toluene-sulphonazide]-এর প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করেন। ফলে পিরিডিন থেকে একটি নব-ব্যবহৃত উপাদান এন-ইমিনো-পিরিডিন [n-imino-pyridine] আবিষ্কৃত হলো। তিনি পটুলিন [Patulin] গোষ্ঠীর ওয়াই-পাইরোন [y-pyrone] জাতীয় পদার্থের সংশ্লেষ সাধনও করেছিলেন। পটুলিন সর্দি-কাশির বিশেষ প্রতিষেধক। এছাড়া এমিটিন [Emitine] এবং কুইনাইন [Quinine] সংশ্লেষণের কাজও তিনি বহুদিন ধরে করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সংশ্লেষণ পাশ্চাত্যে আগেই যাচাই হয়ে যাওয়ায় অধ্যাপক বসু ওই গবেষণা মাঝপথে পরিত্যাগ করেন। এরপর ঝোঁকেন অজৈব রসায়নের দিকে। 1949 সালে ট্রানজিস্টার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই জার্মেনিয়াম [Germanium]-এর খোঁজ পড়ে যায় চতুর্দিকে। অধ্যাপক বসু ভারতের গন্ধক জাতীয় খনিজের মধ্যে জার্মেনিয়ামের অনুসন্ধান চালালেন ধারাবাহিকভাবে। অবশেষে নেপালের স্ফেলেরাইট [Sphalerite] খনিজের মধ্যে জার্মেনিয়ামের সন্ধান পেলেন। এই খনিজের চৌম্বকাংশ থেকে 0.29% এবং অচৌম্বক অংশ থেকে .0021% জার্মেনিয়াম নিষ্কাশিত করা সম্ভব হয়েছিলো এই গবেষণায়।

সত্যেন্দ্রনাথের বহু গবেষণাপত্র কোথায় যেন হারিয়ে গেছে তাঁর ছাত্রদের চোখের সামনেই। তাঁর এক ছাত্র গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, বিজ্ঞানের গবেষণায় মাস্টারমশাই যেখানে অন্ধকার দেখেছেন সেখানেই আলোকপাত করে সেখান থেকে সরে গেছেন। আবার অন্যদিকে তাকিয়েছেন। অন্য কোথাও অন্ধকার দেখলে সেইদিকে এগিয়ে গেছেন। নিজের গবেষণা নিয়ে হৈ চৈ করা, পাঁচজনকে বলে বেড়ানো তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। অথচ আমরা দেখি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা নিজেদের প্রচার সম্পর্কে যথেষ্ট সাজাগ ছিলেন ও আছেন। যা ছিল সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ঘৃণার ব্যাপার।

1900 খ্রীস্টব্দের ডিসেম্বরের শেষের দিকে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক [Max Planck] তাঁর বিখ্যাত কণাবাদ বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব [Quantum Theory] প্রকাশ করলেন। এই কোয়ান্টাম তত্ত্বকে ভিত্তি করে আজকের কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান [Quantum Mechanics] গড়ে উঠেছে। প্ল্যাঙ্ক তাঁর ওই তত্ত্ব যে গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন তাকেই বলা হয় 'প্ল্যাঙ্কের সূত্র' [Planck's Formula]। এই সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্ল্যাঙ্ক বিকিরণের শোষণ ও উৎসারণ [Emission] সম্পর্কে নতুন ধারণার কথা বললেন। তিনি বললেন যে, শক্তির দেওয়া-নেওয়া অর্থাৎ শোষণ-বিকিরণ অবিরত ও অবিচ্ছিন্নভাবে হয় না; হয় ঝাঁকে ঝাঁকে [By Jerks] অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড ভাবে [Discontinuously] বা কণা-ভাবে। তিনি বললেন, কোনও তরঙ্গের শক্তি কখনও ন্যূনতম একটি সংখ্যার চেয়ে কম হতে পারে না। এই ন্যূনতম সংখ্যাটিকে বলা হল বিকীর্ণ শক্তির কণাতম বা কোয়ান্টাম [Quantum]। প্ল্যাঙ্ক আরও বললেন, এই ন্যূনতম কণার শক্তি 'E' হলে, $E = h\upsilon$ হবে, যেখানে υ হল ওই

শক্তি তরঙ্গের কম্পাঙ্ক [Frequency] এবং h হল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক [Planck's Constant]। প্ল্যাঙ্কের ওই যুগান্তকারী মতবাদ থেকে 1905 সালে আইনস্টাইন আবিষ্কার করলেন তাঁর 'আলোকবৈদ্যুৎ তত্ত্ব' [Photoelectric Theory]। প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টামতত্ত্ব এর ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। আইনস্টাইন বললেন, শক্তির আসা-যাওয়াটাও হয় কোয়ান্টাম আকারে। আলোক শক্তি শুধু খণ্ড খণ্ড ভাবে নির্গত [Emitted] কিংবা শোষিত [Absorbed] হয় তাই নয়, নির্গমন ও শোষণ এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তীকালে অর্থাৎ প্রবহমান অবস্থায়ও আলো খণ্ড খণ্ড অবিভাজ্য শক্তি-টুকরোর সমষ্টি। কিছুদিন পরে তিনি এই টুকরোগুলির নাম দেন 'ফোটন' [Photon]। ফোটন হল শক্তির মূল কণা এবং আলো কিংবা যে কোন বিকীর্ণ শক্তি হল ঝাঁক ঝাঁক ফোটনের সমষ্টি।

1913 সালে নীল্‌স্ বোর কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। অণু-পরমাণুর গঠনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। সেখানেও তিনি কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিচ্ছিন্নতার ধারণার যে প্রয়োজন আছে তা প্রতিপন্ন করেন। এভাবে ধীরে ধীরে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সর্বজনীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। যেখানেই শক্তির আদান-প্রদান বা প্রবাহ সেখানেই বিচ্ছিন্নতা, অর্থাৎ কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা। এই ধারণা শেষ পর্যন্ত মূলত আইনস্টাইনের নেতৃত্বেই বিজ্ঞানীসমাজে স্বীকৃতি লাভ করে। তা সত্ত্বেও প্ল্যাঙ্কের সূত্রের মধ্যে অদ্ভুত একটা অসঙ্গতি বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন। ঐ সূত্রের কোন যুক্তিসঙ্গত, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তাঁরা পাচ্ছিলেন না। ডিবাই [1910], আইনস্টাইন [1917], পউলি [1923] ও আইনস্টাইন-এহ্‌রেনফেস্ট [1923]—এঁরা সকলেই প্ল্যাঙ্কের সূত্রের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নির্ধারণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এঁদের সকলের নির্ধারণ-পদ্ধতির মধ্যেই ধ্রুপদী ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের যুগপৎ ব্যবহার দেখা যায়—যেটা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই অবস্থায় মেঘনাদ সাহা বিশেষ করে পউলির [1923] পদ্ধতির প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কেন না, পউলির এই প্রবন্ধটিতে একটি অদ্ভুত ধারণার কথা ছিল— যেন, বর্তমান নির্ভর করছে ভবিষ্যতের উপর। সত্যেন্দ্রনাথ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

প্ল্যাঙ্কের সূত্র সংক্রান্ত যাবতীয় গবেষণাপত্র সত্যেন্দ্রনাথ খুব ভাল করে পড়ে নিলেন এবং 1924 সালের মে মাসে প্ল্যাঙ্কের সূত্রে একটি সম্পূর্ণ কোয়ান্টাম-তাত্ত্বিক ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিলেন। এই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি প্রথমেই আইনস্টাইনের আলোক-কণিকাবাদ মেনে নিলেন ও দেখালেন যে, তাঁদের কোয়ান্টাম তত্ত্বের যথাযথ ব্যবহার থেকেই প্ল্যাঙ্কের সূত্রের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্ল্যাঙ্কের সূত্রের এই নির্ধারণ পদ্ধতির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ আলোক-কণিকাদের যে বিশেষ গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন তাকেই বলা হয় 'বোস সংখ্যায়ন' [Bose Statistics]। এই সংখ্যায়নের বৈশিষ্ট্য হলো—একই শক্তির আলোক-কণিকাগুলি পরস্পর পার্থক্যহীন [Indistinguishable]। সাধারণ বস্তুকণিকারা একরূপী হলেও পার্থক্যহীন নয়। দুটি বাক্সের মধ্যে একটি করে সাধারণ বস্তুকণিকা রাখলে ও পরে তাদের বাক্স বদল করলে দুটি বিন্যাস [Arrangement] পাওয়া যায়—অর্থাৎ দুটি উপায়ে বস্তুকণিকা দুটিকে দুটি বাক্সে রাখা যায়। কিন্তু সেই কণিকাগুলি

পার্থক্যহীন হলে এই দুটি বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব নয়—বিন্যাস তখন একটাই হয়। এই হলো বোস-সংখ্যায়নের মূল কথা। সেই সময় আইনস্টাইন ছাড়া আর কেউ এই গবেষণাপত্র যথার্থ উপলব্ধি করতে পারতেন কিনা সন্দেহ আছে। নিউটনের ধ্রুপদী বলবিজ্ঞান অনুযায়ী এটা সম্ভবও নয়। লন্ডনের ফিলজফিক্যাল ম্যাগজিনও সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণাপত্র সম্পর্কে নিরুত্তর ছিল। ওখান থেকে কোন উত্তর না পেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ আইনস্টাইনকে তাঁর গবেষণাপত্রটি পাঠান। আইনস্টাইন রাতারাতি প্রবন্ধটিকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদ জার্মানির বিখ্যাত 'ৎসাইটস্রিফট ফুয়ের ফিজিক' [Zeitschrift fur Physik, Vol. 26, 178] পত্রিকায় প্রকাশিত হয় [জুলাই, 1924]। প্রবন্ধটির শেষে আইনস্টাইন একটি মন্তব্য জুড়ে দেন। মন্তব্যটি হলো 'আমার মতে প্ল্যাঙ্কের সূত্র নির্ধারণে বোস যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমি অন্যত্র দেখাব যে, এই পদ্ধতিতে আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টামতত্ত্ব পাওয়া যায়।' অর্থাৎ আইনস্টাইন দেখালেন যে, শুধু আলোক-কণিকাই নয় অন্য বস্তু-কণিকার ক্ষেত্রেও বসুর গণনা পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে। সত্যেন্দ্রনাথের কাজের এই সার্বিক চরিত্রের উদ্‌ঘাটনের জন্যই প্রথম যুগে এই সংখ্যায়নকে 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' বলা হতো। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ধারণার উপর ভিত্তি করেই যেহেতু এই সংখ্যায়ন গড়ে উঠেছে সেহেতু এই সংখ্যায়নকে ইদানীং শুধু 'বোস-সংখ্যায়ন' বলা হয়।

এরপর এনরিকো ফের্মি ও পি এ এম ডিরাক দুজনে পৃথকভাবে আর এক ধরনের কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের প্রস্তাব দেন। তাকে বলা হয় 'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন' বা 'ফের্মি-সংখ্যায়ন'। বোস সংখ্যায়ন ও ফের্মি সংখ্যায়নের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হলে আমাদের স্মরণ করতে হবে যে, আলোক-কণিকা বা বস্তুকণিকারা যে কোন শক্তিস্তরে থাকতে পারে না—তাদের শক্তিস্তরগুলি বিচ্ছিন্ন ও ধাপে ধাপে বাড়ে কমে। একটা উপমা দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। একটা বহুতল বাড়ির কথা ভাবা যাক। তার বাসিন্দারা বিভিন্ন তলায় বাস করে। দুটি তলার মাঝামাঝি জায়গায় কারও বাস করা সম্ভব নয়। এই বাসিন্দারা যদি 'ফের্মি-সংখ্যায়ন' মেনে চলে তবে কোন তলাতেই এক-একজনের বেশি থাকা সম্ভব নয়। যে সব মৌল কণিকা বোস-সংখ্যায়ন মেনে চলে তাদের বলা হয় 'বোসন'। আর যারা ফের্মি সংখ্যায়ন মেনে চলে তাদের বলা হয় 'ফের্মিয়ন'। এখনও পর্যন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের মৌল কণিকার কথা জানা গেছে সকলেই হয় 'বোসন' নয় 'ফের্মিয়ন'। যেমন, নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রন, কোয়ার্ক ইত্যাদি ফের্মিয়ন, আর ফোটন ও নানান ধরনের যে সমস্ত মেসন কণিকা পাওয়া গেছে তারা সকলেই 'বোসন'। অতি তারল্য ও অতি পরিবাহিতার মূলেও রয়েছে এই বোসন কণিকাদের ভূমিকা। কাজেই সহজেই অনুমেয় আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে বোস সংখ্যায়নের ভূমিকা কত গভীর ও সর্বজনীন।

এইভাবে সত্যেন্দ্রনাথের অবদান পদার্থবিজ্ঞানের জগতে একটা যুগান্তর ঘটিয়েছিল। বিজ্ঞানের ইতিহাস যাঁরা লিখবেন বা লিখেছেন তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণাপত্র পাওয়ার পরই কিভাবে আইনস্টাইন লুই দ্য ব্রগলির প্রস্তাবিত বস্তুর তরঙ্গ-কণিকা দ্বৈতবাদের তাৎপর্য বুঝতে পারেন ও তার দিকে অন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

শ্রোয়েডিঙ্গারের চিঠিপত্র থেকেও জানা গেছে কিভাবে তিনিও আইনস্টাইনের 'বোস-সংখ্যায়ন' সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি থেকেই তাঁর আবিষ্কৃত 'তরঙ্গ-বলবিদ্যা'র প্রেরণা পেয়েছিলেন।

ম্যাক্সওয়েল তাঁর তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ তত্ত্বে বলেছিলেন, আলো তাপ ইত্যাদি বিকীর্ণ শক্তি তরঙ্গের আকারে আলোর বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। প্ল্যাঙ্ক এই শক্তিকে কণিকারূপে কল্পনা করে তাঁর অতি বিখ্যাত শক্তি বন্টন সূত্রে ব্যবহার করেছিলেন। এই কণিকা বা কোয়ান্টামকেই আইস্টাইন 'ফোটন' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁর 'আলোক-বৈদ্যুৎ ক্রিয়া তত্ত্ব'-টিতে। সত্যেন্দ্রনাথ ফোটনকে বস্তুকণার তুল্যরূপ বিবেচনা করে প্ল্যাঙ্কের ওই বিখ্যাত সূত্রটিকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট হলেন। তিনি শক্তির তরঙ্গ চরিত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, কেবলমাত্র বস্তুরকণার তুল্যরূপ হিসাবে ধরে প্ল্যাঙ্কের সূত্র উপস্থাপিত করে ফেললেন। তিনি দেখালেন যে, প্ল্যাঙ্কের সূত্র পেতে ম্যাক্সওয়েলের তড়িচ্চুম্বকীয়-তরঙ্গবাদ গ্রহণ করবার দরকার নেই। শক্তিকে শুধুমাত্র বস্তুকণার তুল্যরূপ হিসাবে ধরেই প্ল্যাঙ্কের ওই সূত্রে আসা যায়। তাই এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, শুধুমাত্র কণা-ধর্ম দিয়েই তিনি প্ল্যাঙ্কের সূত্রের পুনরাবিষ্কার করেন। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে পরবর্তীকালে গবেষকরা বলেছেন যে, যদিও তিনি ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গবাদ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই প্ল্যাঙ্কের সূত্র পান, তবুও তরঙ্গের স্বভাব সমবর্তন [Polarization] প্রত্যয়ের মাধ্যমে তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল 'দশা-লোক' [Phase Space]-এর Cell-এর সংখ্যা নির্ণয়ে। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথের সংখ্যায়নের মূলে যে শুধুমাত্র কণাধর্ম আছে তা নয় তরঙ্গ ধর্মও রয়েছে। কিন্তু এই তথ্যটি তাঁর নিবন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে বলা না থাকলেও পরবর্তীকালের গবেষকরা তা প্রমাণ করেছেন। শক্তি প্রবাহের মধ্যে কণাধর্ম ও তরঙ্গ ধর্ম যুগপৎ নিহিত আছে এই তত্ত্ব লুই দ্য ব্রগলি যেমন বলেছিলেন, তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের ওই বিখ্যাত সংখ্যায়নেও শুধু কণাধর্ম নয় তরঙ্গ ধর্মও যুগপৎ নিহিত ছিল কিছুটা গৌণভাবে। আর উভয়েই এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন 1924 খ্রীস্টাব্দে। সত্যেন্দ্রনাথের নিবন্ধ প্রকাশিত হল জুলাই মাসে আইনস্টাইনের অনুবাদের পর এবং ওই বছরই সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় লুই দ্য ব্রগলির নিবন্ধটি।

সত্যেন্দ্রনাথ ফোটনদের এক বস্তুকণার গ্যাস হিসাবে কল্পনা করে তাতে প্রায়োগ করলেন পরিসাংখ্যিক গতিবিদ্যার [Statistical Dynamics] নিয়মাবলী। ফোটন সমষ্টির মধ্যে এক ফোটনকে অন্য ফোটন থেকে ভিন্ন ভাবা সম্ভব নয়। তিনি ফোটনদের নির্দিষ্ট সংখ্যক অবস্থার [States] মধ্যে বন্টন করার চেষ্টা করলেন না, বরং তিনি সন্ধান করলেন কি ভাবে অবস্থাসমূহের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। এই সব অবস্থার বৈশিষ্ট্য হল কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ফোটন যেন এক একটি অবস্থার পরিচায়ক হিসাবে থাকে। অবস্থাগুলির সংখ্যা নির্ণয়ের পর তিনি ফোটনগুলিকে বন্টন করলেন। অর্থাৎ দশা-লোকের [Phase Space] ক'টি কোষ [Cell] বিকীর্ণ শক্তির জন্য পাওয়া যাচ্ছে তা নির্ণয় করার পর তিনি ফোটনগুলিকে ওই সব কোষে বন্টন করলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন ঃ (1) ফোটনেরা পরস্পর পার্থক্যহীন [Indistinguishable] ; (2) প্রতিটি কোষে ফোটনদের

সংখ্যা অসংরক্ষিত [Not Conserved] এবং [3] ফোটনদের চক্রণ [Spin] হল 1 (এক)। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর গবেষণা পত্রে ফোটন সংক্রান্ত এই সব অনুসিদ্ধান্তগুলি একেবারে নির্দিষ্ট করে বলেন নি ঠিকই, কিন্তু তাঁর সংখ্যায়নে এগুলি ধরে নিয়েই তিনি প্ল্যাঙ্কের শক্তি-বন্টন সূত্রে উপস্থিত হন। তাঁর এই সংখ্যায়ন যুগান্তকারী কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের পথিকৃৎ এবং যা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন স্বয়ং আইনস্টাইন। সে সব কথা আগেই বলা হয়েছে।

শক্তিবন্টন সংক্রান্ত প্ল্যাঙ্কের সেই অতি বিখ্যাত সূত্রটি হল ঃ

$$dE = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \cdot \frac{d\lambda}{e^{hc/\lambda KT} - 1}$$

যেখানে, dE = শক্তির বন্টন, h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, c = আলোর গতিবেগ,

λ = শক্তির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, T = তাপমাত্রা [Absolute],

K = বোল্‌ৎজমান ধ্রুবক [Boltzmann's Constant]

সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণার কাজটির কথা আইনস্টাইন জেনেছিলেন ডাক মারফৎ। কাজটি দেখে আইনস্টাইন বলেছিলেন, "বোস যেভাবে প্ল্যাঙ্কের সূত্র উপস্থাপিত করেছেন, তা আমার মতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি এখানে যে পন্থা প্রয়োগ করেছেন, তার সাহায্যে একটি আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টাম তত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে।" আইনস্টাইন অধ্যাপক বসুর কাজে খুবই অভিভূত হয়েছিলেন। সময়টা ছিল 1924 খ্রীস্টাব্দ একথা আগেই বলা হয়েছে।

সনাতন সংখ্যায়ন [Classical Statistics] অনুসারে কোন তন্ত্রের [System] সম্ভাব্য আণুবীক্ষণিক অবস্থার [State] সংখ্যা অসীম [Infinite]। এই তন্ত্রের দশা-লোককে [Phase Space] অসংখ্য মৌলিক ক্ষেত্রে বিভক্ত করা যেতে পারে, যে অঞ্চলগুলির প্রত্যেকটির রয়েছে নির্দিষ্ট মাত্রার শক্তি [Constant Energy]। কিন্তু কোয়ান্টাম সংখ্যায়নে দশা-লোককে নির্দিষ্ট শক্তিমাত্রার নির্দিষ্ট সংখ্যক মৌলিক ক্ষেত্রে [Elementary Region] ভাগ করা হয়। নির্দিষ্ট শক্তিমাত্রার এই ধরনের ক্ষেত্রকে বলা হয় 'শীট' [Sheet]। প্রত্যেকটি শীটকে আবার নির্দিষ্ট আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নিয়ে প্রতিটি অংশকে বলা হয় কোষ [Cell]। সুতরাং কোয়ান্টাম সংখ্যায়নে একটি কোষ হল দশা-লোকের ক্ষুদ্রতম অংশ। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে প্রতিটি শীটের সমস্ত কোষে শক্তি-মাত্রা একই এবং তা সুনির্দিষ্ট। ফলে, কোন তন্ত্রের আণুবীক্ষণিক অবস্থাগুলির সংখ্যা সীমিত এবং দশা-লোককে নির্দিষ্ট শক্তির নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্ষেত্রে ভাগ করা যেতে পারে। কোনও তন্ত্রের শক্তির পরিবর্তন হয় কোয়ান্টামের এক শীট থেকে অন্য শীটে স্থানান্তরণে। কোয়ান্টামগুলি দুই শীটের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে অবস্থান করে না। কোষ বা দশা-কোষগুলির [Phase-Cells] আকার নির্দিষ্ট এবং তাদের আয়তন হল h^3, যেখানে h হল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি [Uncertainty Principle] অনুসারে কোষগুলির বা দশা-কোষগুলির আয়তন h^3। কোয়ান্টাম সংখ্যায়ন ফোটন বা শক্তিকণা বা কোয়ান্টামের ওই সব কোষে বন্টনের দু'রকম পদ্ধতি বা

নিয়মের কথা বলেছে, যার একটি বোস-সংখ্যায়ন, অপরটি ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন [Fermi Dirac Statistics], যা এখন কেবল ফের্মি-সংখ্যায়ন নামে খ্যাত।

ম্যাক্সওয়েল-বোলৎজ্‌মান শক্তিবন্টন সূত্র বা সনাতন শক্তিবন্টন সূত্র [Classical Energy Distribution Formula] থেকে পাওয়া যায় ঃ

$$n_s = \frac{A_s}{fe^{\beta Es}}$$

যেখানে,

$n_S = E_S$ শক্তির কোয়ান্টাম সংখ্যা, অর্থাৎ বন্টনযোগ্য কোয়ান্টামের সংখ্যা s-তম শীটে যেখানে কোষের শক্তির পরিমাণ E_S,

A_S = শক্তি অবস্থার গুরুত্ব-গুণিতক, অর্থাৎ s-তম শীটে কোষ [Cell] সংখ্যা,

E_S = s-তম শীটের কোষের শক্তির পরিমাণ, অর্থাৎ কোয়ান্টামের শক্তি,

β = ধ্রুবক = $\frac{1}{KT}$, f = আপজাত্য স্বেচ্ছ-স্থিরাঙ্ক [Degeneracy Parameter]

সনাতন পরিসংখ্যানে কয়েকটি প্রায়োগিক ত্রুটির মধ্যে একটি হল, এই পরিসংখ্যান অনুসারে,

$$u_\upsilon d\upsilon = KT\frac{8\pi\upsilon^2}{c^3}d\upsilon$$

এই সমীকরণ অনুযায়ী স্থির উষ্ণতায় কৃষ্ণ-বিকিরণে υ-বাড়ার সঙ্গে ফোটনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওযার কথা। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল, υ খুব বেশি এবং খুব কম—এই দুই অবস্থাতেই ফোটন সংখ্যা খুবই কম। সনাতন পরিসংখ্যানে গুরুত্ব-গুণিতক সঠিকভাবে নির্দেশ করা যায় না। কোয়ান্টাম সংখ্যায়নে এই সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত মত পাওয়া যায়।

বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নে তাপগতীয় সম্ভাব্যতা হিসাব করার সময় অবশ্যই দেখতে হয় n_S সংখ্যক কণাকে কতভাবে A_S সংখ্যক কোষের [Cell] মধ্যে রাখা সম্ভব। কণাগুলি প্রত্যেকে একই ধরনের এবং একটি কোষে যতগুলি ইচ্ছা কণা রাখা যায়। এখানে কোষ মানে নির্দিষ্ট শক্তির বিভিন্ন quantum state বুঝতে হবে, যেগুলি শীটের ক্ষুদ্রতম অংশ বিশেষ। এইভাবে বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নে পাওয়া যায় ঃ

$$n_s = \frac{A_s}{fe^{\beta E_s} - 1}$$

যেখানে $n_S = E_S$ শক্তির কোয়ান্টাম সংখ্যা, A_S = শক্তি-অবস্থার গুরুত্ব-গুণিতক, E_S= কোয়ান্টামের শক্তি সাম্যাবস্থায়, f = ধ্রুবক = $\frac{V}{nh^3}(2\pi mKT)^{3/2}$, β = ধ্রুবক = $\frac{1}{KT}$।

এটি বোস-আইনস্টাইনের বন্টনসূত্র [Distribution Law according to B-E Statistics]। অনুরূপ পদ্ধতিতে ফের্মি-ডিরাক বন্টন সূত্রে পৌঁছানো যায়। ফের্মি-ডিরাক বন্টন সূত্র [Distribution Law according to F-D Statistics] থেকে পাওয়া যায় ঃ

$$n_s = \frac{A_s}{fe^{\beta E_s} + 1}$$

সুতরাং সনাতন সংখ্যায়ন এবং দুটি কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের শক্তি বন্টন সূত্রগুলি [Energy Distribution Laws] এই রূপ নিয়েছে ঃ

$$n_s = \frac{A_s}{fe^{\beta E_s}} \quad \text{[ম্যাক্সওয়েল-বোলৎজমান]}$$

$$n_s = \frac{A_s}{fe^{\beta E_s} - 1} \quad \text{[বোস-আইনস্টাইন]}$$

$$n_s = \frac{A_s}{fe^{\beta E_s} + 1} \quad \text{[ফের্মি-ডিরাক]}$$

এই সূত্রগুলিতে, f = আপজাত্য স্বেচ্ছ-স্থিরাঙ্ক [Degeneracy Parameter]

$$= \frac{V}{nh^3}(2\pi mkT)^{3/2}$$

যেখানে,

V = গ্যাসের আয়তন এবং তা ফোটন প্রবাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য,
n = অণুর সংখ্যা প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে,
m = অণুর ভর,
h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক,
k = বোলৎজমান ধ্রুবক,
T = পরম [Absolute] উষ্ণতা,

যখন, সাধারণ গ্যাস কিংবা ফোটন-গ্যাস একক আয়তনের হয় তখন V = 1 হয় এবং 'ডিজেনারেসি প্যারামিটার' হয় $f = \frac{[2\pi mKT]^{3/2}}{nh^3}$; আবার f যদি 1 (এক)-এর চেয়ে খুব বেশি হয় [f>>1] তখন ওই কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের দুটি বন্টনসূত্রই সনাতন বন্টনসূত্র হয়ে যায়। স্বাভাবিক উষ্ণতা ও চাপে সব সাধারণ গ্যাসের বেলায় এমনটি দেখা যায়। আবার f যদি 1 (এক)-এর চেয়ে খুব ছোট হয় [f<<1], তখন শক্তির বন্টন ম্যাক্সওয়েল-বোলৎজমান সংখ্যায়ন একেবারে মেনে চলে না। সেক্ষেত্রে শক্তির বন্টন হয় 'বোস-

আইনস্টাইন' কিংবা 'ফের্মি-ডিরাক' সংখ্যায়ন অনুসারে। তখন $n_s = A_s$ হয়ে যায় মোটামুটিভাবে।

ফের্মি-ডিরাক 1926 সালে তাঁদের সংখ্যায়ন প্রকাশ করেন পউলির [Wolfgang Pauli] 'অপবর্জন নীতি' [Exclusion Principle] অনুসরণ করে। ওঁরা বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নের পরিবর্তন করতে গিয়ে এই নতুন সংখ্যায়ন আবিষ্কার করেন। ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন এখন কেবল 'ফের্মি-সংখ্যায়ন' নামে পরিচিত।

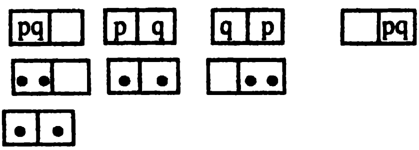
বোস-আইনস্টাইন ও ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়নের মূল পার্থক্য এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে হবে 1-এর আগের চিহ্নটি ঋণাত্মক, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা ধনাত্মক। সে জন্য ফের্মি সংখ্যায়নের 0 থেকে ∞ -র মধ্যে A- র যে কোন মান নির্দিষ্ট হতে পারে। আবার A>>1 অবস্থায় অর্থাৎ উষ্ণতা বেশি ও ঘনত্ব কম অবস্থায় ফের্মির এই সূত্র থেকে সনাতন বন্টন সূত্রে পৌঁছানো যায়। গ্যাসের ক্ষেত্রে ফের্মি-বন্টন সূত্রকে পরীক্ষার মাপকাঠিতে যাচাই করতে যাওয়া এই কারণে অর্থহীন। কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণে 'বোস-আইনস্টাইন' সংখ্যায়নের যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এই পরিসংখ্যান থেকে প্ল্যাঙ্কের বন্টন সূত্রে আসা যায় তা আগেই বলা হয়েছে।

বোস সংখ্যায়নের প্রসঙ্গ শেষ করার আগে তিনিটি সংখ্যায়নের পার্থক্য চিত্রের সাহায্যে বলে নেওয়া যাক ঃ

1] সনাতন সংখ্যায়ন

2] বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন

3] ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন



মনে করা যাক, দুটি ফোটন আছে এবং মাত্র দুটি কোষ [Cell] আছে তাদের অবস্থানের জন্য। সনাতন সংখ্যায়ন অনুসারে দুটি ফোটনের একটি অন্যটির চেয়ে আলাদা বা পার্থক্যহীন নয়। ফোটন দুটি একসঙ্গে কিংবা আলাদা আলাদাভাবে ওই দুটি কোষে অবস্থান করতে পারে। এর ফলে, সনাতন সংখ্যায়নের নিয়মে এই দুই ফোটনের বিন্যাস [Arrangement] চার রকম হতে পারে। ধরা যাক, ফোটন দুটির একটি p এবং অন্যটি q । আর p ও q পার্থক্যহীন নয়, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সনাতন সংখ্যায়নে p ও q প্রথম কোষটিতে অবস্থান করতে পারে এবং দ্বিতীয়টি ফাঁকা থাকতে পারে, কিংবা তারা দুটি কোষেই থাকতে পারে; প্রথমটিতে p এবং দ্বিতীয়টিতে q কিংবা প্রথমটিতে q এবং দ্বিতীয়টিতে p। আবার প্রথম কোষটি ফাঁকা থাকতে পারে এবং তারা একসঙ্গে দ্বিতীয়টিতে অবস্থান করতে পারে। এইভাবে সনাতন সংখ্যায়নে দুটি ফোটনের শক্তিস্তরে বিন্যাস মোট চার রকমের হতে পারে।

বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন অনুসারে p ও q পরস্পর পার্থক্যহীন [Indistinguishable]। ফলে তাদের আর আলাদা p কিংবা q সত্তা থাকে না। দুটি ফোটন তাই প্রথম কোষে কিংবা দ্বিতীয় কোষে যেমন থাকতে পারে, তেমনি এরা এক একটি

কোষে অবস্থান করতে পারে। এইভাবে এই সংখ্যায়নে এদের তিন ধরনের বিন্যাস সম্ভব।

ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়নে একটি কোষে একটির বেশি ফোটন থাকতেই পারবে না এবং তারা পরস্পর পার্থক্যহীন। ফলে, দুটি ফোটন এক্ষেত্রে দুটি কোষে অবস্থান করতে পারে। তাই দুটি ফোটন ও দুটি কোষের মধ্যে বিন্যাস কেবল এক রকমই হতে পারে।

বিশ্বের যাবতীয় কোয়ান্টাম কিংবা কণিকা হয় 'বোসন' নয় 'ফের্মিয়ন'। প্রশ্ন থেকেই যায় বিশ্বে এই দু'রকমের সংখ্যায়ন কেন? চক্রণ [Spin] এবং এই সংখ্যায়নের সম্পর্ক কি? এগুলির সুন্দর উত্তর দিয়েছেন অধ্যাপক ফেইনম্যান [Feynman]। তিনি বলেছেন ঃ

"We cannot give an elementary explanation. An explanation has been worked out by Pauli from complicated arguments of quantum field theory and relativity. He has shown that the two must go together, but we have not been able to find a way of reproducing his arguments on an elementary level. It appears to be one of the few places in physics where there is a rule which can be stated very simply, but for which no one has found a simple and easy explanation. The explanation is deep down in relativistic quantum mechanics. This probably means that we do not have a complete understanding of the fundamental principle involved. For the moment, you will just have to take it as one of the rules of the world."

কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের গভীর তাৎপর্য নিয়ে আজকের বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধিৎসু। আজও জানা যায় নি কেন বাস্তবে মাত্র দু'রকমের সংখ্যায়ন পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, যতদিন পর্যন্ত বস্তুর কণাধর্ম ও তরঙ্গধর্মের যুগপৎ অস্তিত্ব স্বীকার করা হবে, ততদিন এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে না। বস্তুর এই দ্বৈতসত্তার অন্তরালে যে অদ্বৈত ধর্ম আছে তা আবিষ্কৃত না হওয়া অবধি হয়ত এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। হয়ত সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নিবন্ধটির যথাযথ সমীক্ষার ফলেই পাওয়া যেতে পারে প্রশ্নগুলির উত্তর।

1924 সালের 15ই জুন সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় একটি গবেষণাপত্র পাঠান আইনস্টাইনের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এই নিবন্ধটিও আইনস্টাইন জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে বিখ্যাত Zeitschrift fur Physik পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠান। 1924 সালেই ওই পত্রিকার Bd-27 সংখ্যার 385 পৃষ্ঠায় ওটি প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধের শিরোনাম ছিল "Thermal Equilibrium in the Radiation Field in presence of Matter" বা 'পদার্থের উপস্থিতিতে বিকিরণ ক্ষেত্রে তাপীয় সাম্য'।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম নিবন্ধে আলোক কণিকাদের সমষ্টিগত যে আচরণ সেটাই ছিল আলোচ্য বিষয়। আলো জড় ও অন্যান্য বস্তু কণাদের সঙ্গে পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকতে পারে। এই তাপীয় সাম্যের অবস্থাই ছিল দ্বিতীয় নিবন্ধের বিষয়বস্তু। বসুর পূর্বসূরীরা প্ল্যাঙ্কের সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলো ও বস্তুকণাদের মধ্যে কী ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটছে তার সম্বন্ধে কতকগুলি অনুমান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দ্বিতীয় নিবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ প্রমাণ করলেন যে, ঐ সমস্ত অনুমানের কোন

প্রয়োজন নেই—আলোক-কণিকাদের বিশেষ সংখ্যায়ন থেকেই, যাকে এখন 'বোস-সংখ্যায়ন' বলা হয়, তার থেকেই প্ল্যাঙ্কের সূত্রের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু এই দ্বিতীয় নিবন্ধের শেষের দিকে সত্যেন্দ্রনাথ আলোক-কণিকাদের সঙ্গে বস্তু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্দে একটি বিশেষ অনুমান করেন। এই অনুমানের সঙ্গে আইনস্টাইনের প্রস্তাবিত অনুমানের [1917] কিছু পার্থক্য ছিল। তা সত্ত্বেও আইনস্টাইন এই দ্বিতীয় নিবন্ধটিও জার্মান ভাষায় আনুবাদ করেন এবং এর সঙ্গে তাঁর বিরূপ মন্তব্য জুড়ে দিয়ে প্রকাশ করেন। ফলে, এই দ্বিতীয় নিবন্ধটি তেমন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। এই দ্বিতীয় নিবন্ধ প্রকাশের সময় সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে প্যারিসে ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি আইনস্টাইনের ওই বিরূপ মন্তব্য মেনে নিয়ে প্যারিস থেকেই আইনস্টাইনকে তৃতীয় একটি নিবন্ধ পাঠান। এই নিবন্ধও আইনস্টাইনের মনঃপুত হয়নি। কাজেই এই তৃতীয় নিবন্ধটি আর প্রকাশিত হয়নি।

দ্বিতীয় নিবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে আইনস্টাইন যে দু'টি বিষয়ে একমত হতে পারেন নি, সেগুলি তিনি জানিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর 1924 সালের 3রা নভেম্বরের চিঠিতে। তাঁর বিরুদ্ধ মত সম্পর্কে তিনি ওই চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

"Your principle is not compatible with the following two conditions :

i] The absorptıon coefficient is independent of the radiation density.

ii] The behaviour of a resonator in a radiaton field should follow from the statistical laws as a limiting case."

এই দুটি আপত্তির নিরসন করে সত্যেন্দ্রনাথ তৃতীয় একটি নিবন্ধ আইনস্টাইনকে পাঠান 27শে জানুয়ারী, 1925 খ্রীস্টাব্দে। তখন সত্যেন্দ্রনাথ প্যারিসে ছিলেন। কিন্তু সে গবেষণাপত্রের কোন প্রতিলিপি পাওয়া যায় নি। তবে 27শে জানুয়রীর ওই চিঠি এবং পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা সময় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যেটুকু জানা গেছে তার সারমর্মটি হলো এরকম—1917 সালে আইনস্টাইন প্ল্যাঙ্কের সূত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাতে আলোক-কণিকাদের বিশেষ সংখ্যায়নের (অর্থাৎ বোস-সংখ্যায়নের) কোন ভূমিকা ছিল না। সেই কারণে আইনস্টাইন ধরে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, আলোর উৎসারণ দু'ভাবে হয়—উদ্দীপিত বা প্রণোদিত [Stimulated] উৎসারণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণ। এর থেকে আইনস্টাইনের ধারণা হয়েছিল যে, স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণ পরমাণুদেরই নিজস্ব স্বভাবধর্ম। সত্যেন্দ্রনাথ এটা মেনে নিতে পারেননি, কারণ তাঁর নিজস্ব গণনা-পদ্ধতি থেকেই প্ল্যাঙ্কের সূত্রের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—পরমাণুদের নিজস্ব স্বভাব-ধর্ম সম্বন্ধে কোন কিছু অনুমান করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, অধ্যাপক বসুর মতে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণ ঠিক স্বতঃস্ফূর্ত নয়। আইনস্টাইন সেটা মেনে নেন নি। তাঁর আপত্তিটা এ ধরনের ছিল—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যদি একটা হাইড্রোজেন পরমাণু ছাড়া আর কিছুই না থাকত (অর্থাৎ আলোও যদি না থাকত) এবং এই পরমাণুটি যদি উত্তেজিত শক্তির স্তরে থাকত তাহলে সে নিশ্চয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিচের শক্তিস্তরে নেমে আসত উদ্বৃত্ত শক্তিকে আলোক কণিকারূপে উৎসারিত করে। অধ্যাপক বসু এর কোন জবাব দেন নি। কিন্তু আইনস্টাইনের এই যুক্তিও

তিনি কোনদিন মেনে নেন নি। তার কারণ, আইনস্টাইনের কল্পিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই রূপ অবাস্তব।

ডিরাক প্রস্তাবিত আধুনিক কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্ব অধ্যাপক বসুর ধারণাকেই সমর্থন করে। ইদানীং [1987 থেকে] কিছু সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকেও এই মতের সমর্থন মেলে—বিশেষ পরিবেশের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণকে বাড়ানো-কমানো যায়। কাজেই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণ পরমাণুদের স্বভাব ধর্ম হতে পারে না। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল আইনস্টাইন বা বসু কেউই দেখে যেতে পারেননি।

দ্বিতীয় নিবন্ধটি সম্পর্কে অধ্যাপক E.C.G. Sudarshan বলেছেন ঃ

"It [this second paper] was as much a generalisation on the A and B coefficients of Einstein as was Einstein's paper on Bose gases a generalisation of Bose's derivation of Planck's spectral distribution law from the photon picture. Yet all these years and in all literature including the writings of Satyen Bose's contemporaries and students, this great contribution has been systematically ignored."

গাণিতিক আলোচনা এবং প্রমাণের দিক থেকে দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটি এখন অসামান্য বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু আইনস্টাইন এই নিবন্ধের পাদটীকায় তাঁর আপত্তি জানিয়ে লিখেছিলেন যে, কয়েকটি বিষয়ে তিনি লেখকের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তিনি কিন্তু প্রথম নিবন্ধটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তার পাদটীকায় লিখেছিলেন যে, তাঁর মতে বোসের প্ল্যাঙ্কের সূত্রের প্রমাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এখানে ব্যবহৃত পদ্ধতির দ্বারা আদর্শ-গ্যাসের কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব পাওয়া যায়, যা তিনি অন্যত্র করে দেখাবেন। কিন্তু দ্বিতীয় নিবন্ধের পাদটীকায় তাঁর বিরূপ মন্তব্যের ফলে এটি তেমন আমল পেল না। আইনস্টাইনের সঙ্গে 1925 সালে সাক্ষাৎকারের সময় সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় নিবন্ধটি নিয়ে অনেক বার আলোচনা করেন। আলোচনা হয়েছিল বিশদভাবে ঠিকই, কিন্তু কেউ-ই যথোপযুক্ত বিচার দিয়ে অপর পক্ষের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাতে পারলেন না। ফলে, দ্বিতীয় নিবন্ধটি ওই রকমই থেকে যায়। সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর প্রথম নিবন্ধটির চেয়ে দ্বিতীয় নিবন্ধটিকে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তিনি মনে করতেন, এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অবদান এবং আশা রাখতেন, ভবিষ্যতে হয়ত কোনও বৈজ্ঞানিক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্যক উপলব্ধি করে এই নিবন্ধটির প্রাপ্য মর্যাদা দেবেন, যেমন মর্যাদা প্রথম নিবন্ধটি পেয়েছে আইনস্টাইনের কাছ থেকে।

1974 সালের 16ই ডিসেম্বর কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইন্সটিটিউটে এই দ্বিতীয় নিবন্ধটির উপর একটি সেমিনার হয়। এটির বিশেষ মূল্য হল, পরমাণু বিকিরণের সাম্যাবস্থা কোন্ বিশেষ প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সে সম্পর্কে কোন বিশেষ প্রকল্পের অবতারণা না করেই, সাম্যাবস্থায় পরমাণু ও বিকিরণের মধ্যে কী সম্পর্ক থাকবে তা স্থির করা যায়। এই সাধারণ সম্পর্ক থেকে বিশেষ বিশেষ কার্যকারণ প্রণালী মেনে নিয়ে যে সব সমীকরণ আসে, সেগুলিও পাওয়া যায়। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গবেষণাপত্রে বলা

পদ্ধতিতে পাওয়া ফল সত্য হওয়াই উচিত। আইনস্টাইন একথা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আপত্তি ছিল বসুর প্রকল্পে। যেমন, পরমাণুর উপরের শক্তিস্তর থেকে নিচের স্তরে আসার সম্ভাবনায় বিকিরণের প্রভাব নেই। এটা আইনস্টাইন মানেন নি। এটা প্রমাণিত যে, আইনস্টাইনের আপত্তি সঠিক ছিল। সত্যেন্দ্রনাথও আইনস্টাইনের এই আপত্তি মেনে নিয়েছিলেন। এরপর তিনি তৃতীয় নিবন্ধ বা গবেষণাপত্রটি পাঠান আইনস্টাইনের কাছে, যেটি গুরুত্ব পেল না। আইনস্টাইনের অবহেলায় যা প্রকাশিত হল না। এই নিবন্ধটি কিংবা তার অনুলিপি আর পাওয়া যায় নি। তাই প্রশ্ন থেকে যায়, এই দ্বিতীয় নিবন্ধটিতে খুব সাধারণ প্রকল্প থেকে যে সমীকরণ তিনি পেলেন তার সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফলের সামঞ্জস্য কেমন করে জানা যাবে? সেটা সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না মেনে নেওয়া যায় যে, তাঁর প্রকল্পটাই অসম্পূর্ণ ছিল। হয়ত তৃতীয় নিবন্ধে তেমন কিছু ছিল যা পরিপূর্ণতা দিত দ্বিতীয় নিবন্ধটিকে। বিকিরণ বন্টন-ব্যবস্থা [Distribution] পরমাণু-বন্টন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয়। পরমাণু ও বিকিরণের সাম্যাবস্থা নির্ভর করবে উভয়ের মিথস্ক্রিয়ার [Interaction]। উপর। বিজ্ঞানীরা মনে করেন সত্যেন্দ্রনাথের মূল পদ্ধতির অনুসরণে একটা সমীকরণ পাওয়া যাবে, যা পরীক্ষিত ফলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হবে। তবে সবাই মনে করেন, দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটির উপর আরও সেমিনার এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

এছাড়া তৃতীয় নিবন্ধে আরও একটি নতুন কথা ছিল যাকে আইনস্টাইন তখন কোন গুরুত্ব দেননি। 1925 সালের 27শে জানুয়ারিতে লেখা সত্যেন্দ্রনাথেরই ওই চিঠি থেকে জানা যায় যে, তিনি তখন শূন্যগর্ভ তরঙ্গ [Empty Waves]-এর কথাও বলেছিলেন। অর্থাৎ, তড়িৎচ্চুম্বকীয় তরঙ্গগুলি শক্তিবিহীন, আলোক কণিকাগুলিই সমস্ত শক্তির আধার। এই ধারণা আইনস্টাইনের আলোক-কণিকাবাদের মধ্যেই নিহিত ছিল এবং আইনস্টাইন সে সম্বন্ধে অবহিতও ছিলেন। তিনি এই শূন্যগর্ভ তরঙ্গগুলিকে 'Gespensterfelder' অর্থাৎ 'ভৌতিক তরঙ্গ' বলতেন। নীল্‌স্ বোর এবং লুই দ্য ব্রগলিও এই ধরনের তরঙ্গের কথা বলেছেন। অধ্যাপক বসুর অভিনবত্ব ছিল এইখানে যে, তিনি আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে শূন্যগর্ভ তরঙ্গের একটা নিবিড় সম্পর্ক অনুমান করেছিলেন— অর্থাৎ, তিনি মনে করেছিলেন যে, কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব [Unified Field Theory]-র মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে গেলে শক্তির প্রবাহ ও তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রবাহকে পৃথকভাবে ভাবা দরকার। 1946 সালে শ্রোয়েডিঙ্গারকে লেখা আইনস্টাইনের একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, 21 বছর বাদে আইনস্টাইনও এই মত মেনে নেন । কিন্তু আইনস্টাইনের চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথের চিঠির বা তাঁর তৃতীয় প্রবন্ধের কোন উল্লেখ নেই। ইদানীং এই শূন্যগর্ভ তরঙ্গ নিয়ে নানান আলোচনা উঠেছে এবং বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে, যদিও এখনও পর্যন্ত এই এ ধরনের তরঙ্গের বাস্তব অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

সত্যেন্দ্রনাথের আরও একটি মৌলিক ধারণা আইনস্টাইনের সমর্থন পায়নি। তাঁর বিখ্যাত প্রথম নিবন্ধের মধ্যেই এই ধারণা ছিল। কিন্তু আইনস্টাইন তাঁর অনুবাদে সেটিকে

একটু বদলে দিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাব ছিল যে, প্রতিটি আলোককণিকার একটি নিজস্ব স্বভাবজাত চক্রণ [Spin] থাকা প্রয়োজন। আইনস্টাইন এই প্রস্তাবকে পালটে চক্রণের জায়গায় সমবর্তন [Polarization] কথাটির উল্লেখ করেন। পরে প্রমাণিত হয়েছে যে, আলোক-কণিকা ও অন্যান্য বস্তু-কণিকাদেরও একটি স্বভাবজাত চক্রণ আছে। সত্যেন্দ্রনাথ যে আলোক-কণিকার চক্রণের কথা সে সময় ভেবেছিলেন তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় স্যার সি ভি রামন ও এস ভাগবন্তমের লেখা একটি নিবন্ধে, যেটি Indian Journal of Physics -এ (1931) প্রকাশিত হয়। রামন ও ভাগবন্তম যে বসু প্রস্তাবিত আলোক-কণিকাদের চক্রণের পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করেন এই নিবন্ধই তার সাক্ষ্য।

সি ভি রামন এবং ভাগবন্তম তাঁদের এই নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

"In his well known derivation of the Planck radiation formula from quantum statistics, Prof S. N. Bose obtained an expression for the number of cells in phase-space occupied by the radiation, and found himself obliged to multiply it by a numerical fator 2 in order to derive from it the correct number of possible arrangements of the quantum in unit volume. The paper as published did not contain a detailed discussion of the necessity for the introduction of this factor, but we understand from Prof. Bose that he envisaged the possibility of the quantum possessing besides the energy hυ and linear momentum hυ/c also an intrinsic spin or angular momentum h/2π round an axis parallel to the direction of its motion. The weight factor 2 thus arises from the possibility of the quantum being either right-handed or left-handed, corresponding to the two alternative signs of the angular momentum."

অনেককাল পরে সত্যেন্দ্রনাথ একবার তাঁর এক সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে আলোচনার সময় বলেছিলেন আইনস্টাইন কীভাবে সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম গবেষণা পত্রটিতে ফোটনের চক্রণ-সংক্রান্ত প্রস্তাবটি বাতিল করে দিয়ে সে জায়গায় সমবর্তন কথাটি বসিয়ে দেন। ঘটনাটি এই রকম ঃ

"Years later, Bose discussed this factor of 2 business with a visitor. He had said that this factor came from the fact that the photon carried one unit of angular momentum and that this could only take 2 orientations. Bose added :

'But Einstein was't satisfied with that. The old man crossed this portion out from the paper and wrote to me saying that it wasn't necessary at this stage to introduce such a concept. He considered it would suffice to say that it came from the two states of polarization of light. But in those days the polarization of a particle didn't make sense.'

The visitor then asked Bose if after the discovery of the concept of spin, he [i.e., Bose] had tried writing to Einstein claiming priority in discovering the spin of the photon. An amused Bose shook his head saying. "How does it matter who proposed it first? It has been found, hasn't it?"

আত্মপ্রচার বিমুখ-সত্যেন্দ্রনাথ কোনদিনই কোথাও দাবী করেন নি যে, চক্রণের আবিষ্কর্তা তিনি। আইনস্টাইনকে এ ব্যাপার জানানো তো দূর অস্তু, তিনি নিজেও প্রায় কখনই তাঁর

বন্ধু, ছাত্র, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে আলোচনা করতেন না তাঁর নিজের আবিষ্কারগুলি নিয়ে। নিজের আবিষ্কারগুলির আলোচনায় তিনি অদ্ভুতভাবে নীরব থাকতেন।

1924-25 সালে একাধিক মৌলিক ধারণা নিয়ে তিনি যে তিনটি গবেষণাপত্র তৈরি করেছিলেন তার একটিই মাত্র সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করে অনেকটাই আইনস্টাইনের আনুকূল্যে। তাতেই সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। সেকালের এবং একালের অধিকাংশ পদার্থবিজ্ঞানী মনে করেন সত্যেন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল তাঁর 'বোস সংখ্যায়নের' জন্য। নোবেল পুরস্কার তিনি পান নি ঠিকই 'বোসন' নামের মধ্যে তিনি অমর হয়ে আছেন বিজ্ঞান জগতে।

সত্যেন্দ্রনাথ সারাজীবনে মোট 24টি গবেষণাপত্র লিখেছিলেন। এই সংখ্যাটা অনেকটাই কম বলে মনে করা হয়। কারণ তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাধর। নানা কারণে তাঁর গবেষণাপত্রের সংখ্যা আশানুরূপ হয় নি। তাঁর প্রথম গবেষণাপত্রটি বের হয় 1918 সালে এবং শেষটি 1955 সালে। অর্থাৎ 38 বছরে মাত্র 24টি গবেষণাপত্র।

1918 সালের ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনের 36 নম্বর খণ্ডের 199-202 নম্বর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল একটি গবেষণাপত্র "On the Influence of The Finite Volume of Molecules on the Equation of State", অর্থাৎ অবস্থা সমীকরণের উপর অণুসমূহের সসীম আয়তনের প্রভাব। এটি তিনি লিখেছিলেন যুগ্মভাবে বন্ধু মেঘনাদ সাহার সঙ্গে। গবেষণাপত্রটি এঁদের দুজনে যুগ্মভাবে প্রকাশ করেন। এতে এঁরা ভ্যানডারওয়ালের অবস্থা সমীকরণের নতুন রূপ দেন। সে সময় এটা দেখা যাচ্ছিল যে, ওই সমীকরণের a ও b-কে চরম ধ্রুবক হিসাবে গণ্য করলে পরীক্ষালব্ধ ফল তত্ত্ব থেকে নির্ধারিত ফলের সঙ্গে মেলে না। এই জন্য a ও b উভয়কেই আয়তন ও তাপমাত্রার অপেক্ষক হিসাবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হল। এঁরা দেখালেন ঃ

$$p = -\frac{k\theta}{\beta}\log\frac{V - N\beta}{V}$$

$$= -\frac{R\theta}{2b}\log\frac{V - 2b}{V}\ [\because R = NK]$$

∴ যখন V-এর তুলনায় b-এর মান ক্ষুদ্র, তখন $p = \frac{NK\theta}{V}$; অর্থাৎ বয়েল-চার্লস-অ্যাভোগাড্রো সূত্র পাওয়া গেল। আর দ্বিতীয় আসন্ন মান হয় $p = \frac{NK\theta}{V - b}$ ।

এটি হল ভ্যানডারওয়ালের সংশোধন। সাহা এবং বসু আরও দেখালেন যে,

$$pV = NK\theta\frac{x}{1 - e^{-x}}$$

$$\text{যেখানে, } x = \frac{\beta p}{Ke}$$

এই অবস্থা-সমীকরণ থেকে সন্ধি-বিন্দু [Critical Point] সম্পর্কিত নিচের ফলাফল এঁরা বের করলেন। যেমন ঃ

$$\text{সন্ধি-আয়তন} \quad = V_c = \frac{2e}{e-1}.b = 3.165b$$

$$k = \frac{NK\theta_c}{p_c . V_c} = \frac{3.5}{3}$$

ভ্যানডারওয়াল [Van der Walls] ও ডায়েটেরিসি [Dieterici]-দের সমকীরণ থেকে V_c- এর অনুরূপ মান যথাক্রমে 3b ও 2b এবং K-এর অনুরূপ মান যথাক্রমে $\frac{8}{3} = 2.66$ এবং $\frac{e^2}{2} = 3.695$। এই মান সরল গ্যাসসমূহের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অধিকতর উত্তমরূপে পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে মিলে যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বীয় গবেষণা ভ্যানডারওয়াল সমীকরণের নতুন রূপ দেয়। এই গবেষণাপত্রটি সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম গবেষণাপত্র।

সত্যেন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কারে কেন ভূষিত কবা হল না, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তিনি প্রায়শঃই বলতেন—'আমার যা পাওয়ার, তা আমি পেয়েছি'। কী অর্থে তিনি একথা বলতেন তা অজানা। তবে 'বোসন' [Boson] এই নামটি তাঁকে অমর করে রাখবে। আগেই বলা হয়েছে যে সব কণিকা বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন মেনে চলে তারা সাধারণভাবে 'বোসন' নামে অভিহিত। তেমনি যারা ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন মেনে চলে তাদের নাম 'ফের্মিয়ন'।

যে সমস্ত আলোক-কোয়ান্টাম বা যে সব আলোক-কণিকার কোন স্পিন নেই বা যারা শূন্যস্পিন ও জোড়াস্পিন সম্পন্ন তারাই বোসন বা তারাই বোস-সংখ্যায়ন মেনে চলে। তেমনি বিজোড় স্পিনের কণিকারা ফের্মিয়ন বা তারা ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন মেনে চলে। অধ্যাপক বসুকে নোবেল পুরস্কার না দেওয়া হলেও এটা আজ নিঃসংশয়ে বলা যায়, তিনি গ্যালিলিও, নিউটন, ম্যাক্সওয়েল, নীল্‌স্ বোর, দ্য ব্রগলি প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের সমপর্যায়ভুক্ত।

তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা প্রকাশের নানা ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনা বলে তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করি। ঘটনাটি বলেছিলেন তাঁর ছাত্র নন্দলাল সেনগুপ্ত 1974 সালে এক স্মৃতিচারণায়।

"1974 সালের প্রথমের দিকে, বিজ্ঞান কলেজে ওঁর ঘরে আমরা অনেকে বসে আছি। আলোচনা হচ্ছিল কোয়ান্টামবাদ [Quantum Mechanics] এবং আপেক্ষিকতাবাদ [Relativity Theory] নিয়ে। আমাদের মধ্যে একজন মন্তব্য করেছিল, স্যার, শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ [Schroedinger Equation] -এর উপযোগিতা সুদূরপ্রসারী, কিন্তু δ/δt থাকবার জন্য এটাকে সাধারণভাবে আপেক্ষিক অপরিবর্তনশীল [Relativistic Invariant] ভাবা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ ভেবে উনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'সেটা বোধ হয় অসম্ভব হবে না। তোর

অসুবিধা লাগলে তুই সময়ের [Time] পরিবর্তে সময়-অনুরূপ স্তর [Time-like Surface] ভেবে এগুতে পারিস।'

আমাদের মধ্যে কারও জ্ঞান ও চিন্তাধারা তত গভীর ছিল না যে, ওঁর এই উক্তির গভীর তাৎপর্য বুঝে নিয়ে সেই সূত্র ধরে অগ্রসর হব।

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, পরবর্তীকালে দেখেছি, ঠিক এই কাজটা ওই সূত্র ধরেই জাপানের তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী শিনিচিরো টমোনাগা [S. Tomonaga] করেছেন, ওই সময়ের সামান্য কিছুদিন আগে এবং এই কাজের জন্য নোবেল পুরস্কারের অংশীদার হয়েছেন। কিন্তু জাপানি ভাষায় লেখা ওঁর গবেষণা পত্র [1943 সাল] বা তার ইংরেজি অনুবাদ [1946 খ্রীস্টাব্দ] দুটিই তখন আমাদের সকলের অগোচরে ছিল। এর থেকে প্রমাণিত হয় তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পক্ষে কতখানি উপযোগী ছিল।"

শ্রোয়েডিঙ্গারের সেই বিখ্যাত সমীকরণটি হল ঃ

$$ih/2\pi.\delta\varphi/\delta t = h^2/8\pi^2 m \; .\left(\nabla^2\varphi - V\varphi\right)$$

এই সমীকরণের ওই δ/δt-র সম্পর্কেই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর উপরি-উক্ত মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন। টমোনাগা আবিষ্কার করেছিলেন "Theory of Renormalisation", সত্যেন্দ্রনাথ যে পথ বাৎলেছিলেন সেই পথ অনুসরণ করে। তাঁর এই তত্ত্ব বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের প্রেক্ষাপটে কোয়ান্টাম-তড়িৎবলবিদ্যা [Quantum Electrodynamics]-র 'অপসারী বাধাগুলি' [Divergence Difficulties] দূর করতে সমর্থ হয়। এই আবিষ্কারই 1965 সালে অন্য তিন পদার্থ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে টমোনাগাকে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ চাইলে এই আবিষ্কারের সঙ্গে তিনিও সামিল হতে পারতেন।

ডিরাক সাহেব [P.A.M. Dirac] সেবার কলকাতায় এসেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ডিরাক সাহেব তাঁর এক বক্তৃতায় তিনি সত্যেন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করার সময় বারে বারে তাঁকে 'নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী' বলে আখ্যাত করছিলেন। পরে তাঁর খেয়াল হয় সত্যেন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান নি। পরে তিনি যখন রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি হলেন তখন সভ্যদের নামের তালিকা থেকে দেখলেন সত্যেন্দ্রনাথ তখনও রয়্যাল সোসাইটির সভ্যই [FRS] মনোনীত হন নি। বিস্মিত ডিরাক সাহেব তাঁকে FRS করার ব্যবস্থা করেন। এই সূত্রে তিনি অমন্ত্রিত হয়ে লন্ডনে যান। সত্যেন্দ্রনাথ 1958 সালে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় ডিরাক সাহেব তাঁকে প্রস্তাব দেন যে, নোবেল পুরস্কারের পদার্থবিজ্ঞান কমিটিতে তিনি আছেন এবং আর যাঁরা ওই কমিটিতে আছেন তাঁরা সবাই ডিরাক সাহেবের বন্ধুস্থানীয়। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথ যদি অন্ততঃ দুজনকে অনুরোধ করেন তাঁর নাম প্রস্তাব করতে তা হলে তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া আদৌ কঠিন হবে না। সত্যেন্দ্রনাথ ডিরাক সাহেবের প্রস্তাব শুনে হাসলেন। হেসে বললেন, "পুরস্কার পাওয়ার লোভে নিজের জন্য ক্যানভাস [Canvas] করতে রাজী নই। যা পেয়েছি তাতেই

আমি সন্তুষ্ট।'' এ যেন তাঁর উপনিষদীয় জীবন দর্শন। 'মা গৃধ' কথাটির আক্ষরিক প্রতিফলন যেন তাঁর মননে চিন্তনে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা করেন নি আইনস্টাইনের মত খোলাখুলিভাবে। ঈশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সত্যেন্দ্রনাথ সুনিপুণভাবে এড়িয়ে যেতেন। তবে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল স্বচ্ছ এবং অত্যন্ত মানবিক। এক শনিবারের বৈঠকে ধর্ম সম্বন্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তা এই রকম ঃ

"....ধরো যদি বলি ভগবান ছাড়া কিছু নেই, তারপরই প্রশ্ন করব তাহলে তিনি এমন সৃষ্টি করলেন কেন? সৃষ্টির এই বৈচিত্র্যের কারণ কি? বিশেষ করে মনুষ্যসমাজে? কেউ খেতে পাচ্ছে না তোরা বলবি পূর্বজন্মে অনেক পাপ করেছিল, কেউ ওষুধে ভেজাল দিয়ে গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তোরা বলবি পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল। বৈজ্ঞানিক হয়ে এসবে বিশ্বাস করি কি করে? এরকম যদি জীবন হয় মনে কর আমার কিছুই চাই না। চলে গেলুম বনে-জঙ্গলে, বাঘ-ভালুকের সঙ্গে ঘর করলুম, তাহলে তো একটা সমাধান হলো। এটা সামাজিক সমাধান নয়। তবে ভগবান এবং শয়তান সবই বুঝলি আমাদের মনগড়া।

'তবে ভগবানের বিষয়ে এত ভাবনার প্রয়োজন কি? আর যদি জিজ্ঞেস করিস ভগবান কিভাবে বিশ্বাস করি, তা বলা খুব শক্ত। অন্তত তোদের মতো করে নয়। তবে জানিস তো, ভগবানের বিষয়ে নানা লোকের নানা মত।

"অনেকের ধারণা তাঁরই ইচ্ছা আমাদের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। সব কিছুর মধ্যেই তাঁর ইচ্ছার পরিপূর্ণতা ঘটছে। এডিংটন সাহেব এই রকম একটা মনে করতেন, তাঁর ইচ্ছামতো সব চলছে। কর্তা (আইনস্টাইন) কি মনে করতেন আমার জানা নেই। তবে তোদের মতো করে নিশ্চয়ই কোন কিছু মনে করতেন না। হাসতে হাসতে বললেন,—যদি সবকিছুই তাঁর ইচ্ছামতো চলে তাহলে তিনি কেন রাস্তা দেখালেন যে এটম বোমা বানাও আর মুহূর্তে লক্ষাধিক লোক চোখ বুজল। পৃথিবীতে যা কিছু অন্যায় অঘটন ঘটছে তাও সবই কি বলব তাঁর ইচ্ছেতেই হচ্ছে? বুঝলি, এ জাতীয় চিন্তা করে কিছু লাভ নেই। কারণ চোখ বুজলেই তো ইতি। ভেবো না যে আমি এসব কথা ভাবিনি। আবার বলি, অপরে যেভাবে ভগবানে বিশ্বাস করে আমি সেভাবে করি না। আর এই ভগবানতত্ত্ব সম্পর্কে আমার জানার ব্যক্তিগতভাবে কোন আগ্রহ নেই। দেখ, আমাদের জীবনটা সংগ্রামের ভেতর দিয়ে চলছে। সংগ্রামও নেই, জীবনও নেই। তার সঙ্গে ঈশ্বরকে জড়িয়ে কোনো লাভ হবে না। আমরা যখন ল্যাবোরেটরিতে বসে কাজ করি বা কাগজ কলম নিয়ে আঁক কষি, তখন কি একবারও ভাবি ভগবান এসব করিয়ে দিচ্ছে। তাহলে তো আমার কোনো অস্তিত্বই থাকে না।

"কিন্তু হিন্দু সমাজ নিরীশ্বর নয়। যদিও নিরীশ্বরবাদ দার্শনিক মতবাদ হিসেবে একদিন ভারতীয় প্রাচীন সমাজে দেখা দিয়েছিল। সেই অর্থে দুটি মতবাদই প্রাচীনকালে ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্যই নিরীশ্বরবাদ-ই প্রধান হলো না। কতকগুলো জিনিস মেনে নিতে হয়। অনেক কিছু জিনিসই বিশ্বাস করি না কিন্তু অন্যের বিশ্বাসের ওপর বাধা দিই না।

কেউ যদি বলে নরবলি দিলে পুণ্য হয় তবে নিশ্চয়ই বাধা দেব। কিছুদিন আগেও কাগজে পড়েছি কোথায় খরা হয়েছে, নিজের ছেলেকে বলি দিয়ে তার রক্ত মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। তাতে নাকি ঈশ্বর কৃপা করে বৃষ্টি দেবেন। শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা। মানুষকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোলার ব্রত নাও—আমি একজনকে অন্তত শিক্ষিত কবব। শিক্ষিত বলতে শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান নয়। তার বিবেকের জ্ঞানের পর্দাটা একটু তুলে ধরো। একেই বলি কাজ। এরই নাম সাধনা। আমার তো মনে হয় বুদ্ধদেব এমনতরো সাধনাই মানুষের জন্য করার চেষ্টা করেছিলেন।

*　　*　　*　　*　　*

"বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ এমনই একটি সামাজিক বিপ্লব। মানুষকে শিক্ষিত করার অদম্য চেষ্টা করেই তিনি থেমে যাননি। হাতে কলমে কাজ করেছিলেন। এটা আরো বড়ো মাপের সামাজিক বিপ্লব। বিজ্ঞানের দিক থেকে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে কখনো কোনো বিশ্বাস করি নি। অনেক জিনিস আমরা জানি না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন সাধনার দ্বারা ধীরে ধীরে আমবা সব কিছুই জানতে পারব। এসব কোন কিছুই ঈশ্বরের লীলাখেলা নয়। বিপ্লবের প্রয়োজন এইজন্য। বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্টের সময় সমাজ যেখানে ছিল, বস্তুতান্ত্রিক অবস্থা যা ছিল, তারই ওপর ভিত্তি করে তাঁরা মানুষকে জাগাতে চেয়েছেন। কিন্তু আজ সে চেহারা পালটে গেছে। সুতরাং আজকে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা যে কোন মহাপুরুষের বাণীকে Rationally আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবতে হবে। তা যদি না পারো তাহলে কয়েক হাজার বছর পূর্বে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

আসল কথা যা বুঝি, তুমি মানুষের প্রয়োজনে নিজেকে লাগাও। মানুষকে ভালোবাসো আর বাসাও। সেখানেই তোমার শুরু, সেখানেই তোমার শেষ। তোমার শেষ কথা বংশপরম্পরা বয়ে নিয়ে যাবে, এর বাইরে সিদ্ধি আছে বলে আমি তো মনে করি না।" ●

লুই ভিক্টর দ্য ব্রগলি

[1892–1987]

সপ্তদশ শতাব্দীতে নিউটন বলেছিলেন, আলো সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক বস্তুকণার সমষ্টি। ওঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানী হুইগেন্স [Huygens] 1678 সালে বললেন, আলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় তরঙ্গের আকারে। এই তত্ত্বে আলোর তরঙ্গধর্ম প্রমাণিত হল। কোনও মাধ্যম ছাড়া তরঙ্গ প্রবাহিত হতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এল কোন্ মাধ্যম দিয়ে আলোক তরঙ্গ যাতায়াত করে? বিশ্বের সর্বত্র আলোর যাতায়াত। সুতরাং আলোক তরঙ্গ সারা বিশ্বে কোন্ মাধ্যম দিয়ে যাতায়াত করে? হুইগেন্স কল্পনা করলেন সারা বিশ্ব জুড়ে এবং সমস্ত বস্তুর ভিতরে রয়েছে এক মাধ্যম যার সাহায্যে আলোক তরঙ্গ যাতায়াত করে। হুইগেন্স এই কাল্পনিক মাধ্যমের নাম দেন 'ঈথার'।

এইভাবে আলো তার কণারূপ ও তরঙ্গরূপ নিয়ে বহুকাল প্রতিভাত থাকলো। 1865 খ্রিস্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল [James Clark Maxwell] প্রমাণ করলেন আলো হল চলন্ত তরঙ্গ। এই তরঙ্গ হল তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ [Electromagnetic Waves]। আবার 1881 এবং 1887 সালে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মাইকেলসন ও মরলে [Albert Michelson and Edward Morley] দেখালেন ঈথার বলে কিছু নেই। আলোক রশ্মিকে পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম যে কোনও দিকেই পাঠানো হোক না কেন আলোর গতিবেগ সব সময় একই থাকবে। আলোর গতিবেগ তার উৎসের গতির উপর নির্ভর করে না। উৎস কিংবা গ্রাহকের গতিবেগের সঙ্গে তার আপেক্ষিক গতিবেগ বাড়ে কিংবা কমে না।

এই সময় ফিৎজেরাল্ড [Fitzgerald] বললেন, কোন চলন্ত বস্তু তার গতির অভিমুখে কিছুটা সঙ্কুচিত হয় এবং এই সঙ্কোচনের মান নির্ভর করে বস্তুটির বেগের উপর। লোরেনৎস [Lorentz] এই মতবাদের উন্নতি ঘটিয়ে বললেন, প্রতিটি বস্তুই মৌলিক বিদ্যুৎ-আধানের দ্বারা গঠিত। তড়িৎ-গতিবিদ্যার [Electrodynamics] নিয়মানুযায়ী বস্তুটির গতিতে বলের [Force] সৃষ্টি হয়। এই বল আধানগুলিকে গতির অভিমুখে চেপে রাখে এবং সে কারণে বস্তুটি গতির দিকে সঙ্কুচিত হয়।

লোরেনৎস আরও বললেন যে, মাইকেলসন মরলের পরীক্ষায় ব্যবহৃত যন্ত্রে আলোর গতিবেগের তারতম্য না পাওয়ায় অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। তাঁর মতে এটা সনাতন বলবিদ্যার ব্যাপার। ওই পরীক্ষায় আলোর বেগের মান পশ্চিম-পূর্বে রাখা নলটিতে কমেই যায় কিন্তু এই নলটি পৃথিবীর বেগের জন্য দৈর্ঘ্যে সমানুপাতে ছোট হয়ে যায় বলে আলোর তরঙ্গের এই দিকে প্রবাহের সময়-মান এবং উত্তর-দক্ষিণ দিকের নলে আলোর তরঙ্গের প্রবাহের সময়-মান সমান থাকে, কারণ পৃথিবী গতির লম্বের [Perpendicular] দিকে

আলোর বেগ ও নলের দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকে। আবার পূর্ব-পশ্চিমে রাখা নলটির দৈর্ঘ্যের তফাৎও মাপা যাবে না কারণ যে স্কেল দিয়ে সেই দৈর্ঘ্য মাপা হবে সেটিও সমান অনুপাতে ছোট হয়ে যাবে। লোরেনৎস সনাতন পদার্থবিদ্যার ধারণাগুলির কোন্য পরিবর্তন ঘটালেন না। তিনি তাঁর এই মতবাদ প্রকাশ করলেন 1895 সালে। এর গাণিতিক রূপ প্রকাশিত হয় 1904 সালে। লোরেনৎসের এই মতবাদ ছিল তদর্থক [Adhoc]। এর বাস্তবতা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সন্দেহ থেকেই যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, পদার্থ বিজ্ঞানের যুগ শেষ হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের এই শাখায় পড়াশুনা করা বা গবেষণা করা অর্থহীন। ওই শতাব্দীর মাঝামাঝি ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন, 'বিশ্বের অবিনশ্বর ভিত্তি-প্রস্তর' হল বস্তু বা পদার্থ। তার উপর আলো নিয়ে, ঈথার নিয়ে ওই সব দ্বৈত মত। সব মিলিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পদার্থবিদ্যার আর কোনও অগ্রগতির সম্ভাবনা নেই বলে মনে করা হতে থাকে। বিশেষ করে ম্যাক্সওয়েলের ওই ঘোষণা যে, বস্তু বা পদার্থই হল বিশ্বের অবিনশ্বর ভিত্তিপ্রস্তর, তারপরই পদার্থবিদ্যা নিয়ে ওই ধারণার সৃষ্টি হয়। এই রকম একটা সময়ে এলেন আইনস্টাইন। 1905 সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানকে দিলেন এক যুগান্তকারী নতুন মোড়। আলোর দ্বৈত ধর্ম, অর্থাৎ কণাধর্ম ও তরঙ্গধর্ম—দুই-ই বজায় থাকলো বটে, তবে ওই দুই ধর্মের মধ্যে এলো সমন্বয়। এলো 'ফোটন-তত্ত্ব' [Photon Theory]। 1905 সালে আইনস্টাইনের 'আলোকবৈদ্যুৎ ক্রিয়া' [Photo-electric Effect] এবং 'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ' [Special Theory of Relativity] বদলে দিল পদার্থবিজ্ঞানের গতি।

এরপর বস্তু আর অবিনশ্বর থাকলো না। নতুন নতুন আবিষ্কারে বস্তু ও তরঙ্গ এক হয়ে গেল। 1900 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক [Max Planck] প্রচার করলেন তাঁর অতি বিখ্যাত কণাবাদ বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব [Quantum Theory]। তিনি বললেন যে, শক্তির দেওয়া-নেওয়া ও বিকিরণ অবিরত ও অবিচ্ছিন্নভাবে হয় না, হয় ঝাঁকে ঝাঁকে [By Jerks], অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডখণ্ড ভাবে [Discontinuously]। তিনি বললেন, কোন তরঙ্গের শক্তি কখনও ন্যূনতম একটি সংখ্যার চেয়ে কম হতে পারে না। এই ন্যূনতম সংখ্যাটিকে বলা হয় বিকীর্ণ শক্তির কোয়ান্টাম [Quantum]। ওই ন্যূনতম শক্তি 'E' হলে, $E = h\upsilon$ হবে, যেখানে υ হল ওই শক্তির কম্পাঙ্ক এবং h হল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক [Planck's Constant]। প্ল্যাঙ্কের শক্তি বন্টন সূত্র হল,

$$dE = \frac{8\pi hc\lambda^{-5}d\lambda}{e^{hc/K\lambda T} - 1}$$

যেখানে,

dE = শক্তির বন্টন
h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক,
c = বিকীর্ণ শক্তির গতিবেগ বা আলোর গতিবেগ,
K = পরম ধ্রুবক বা বোলৎজমান ধ্রুবক [Boltzmann's Constant]
T = পরম উষ্ণতা Absolute Temperature]।

প্ল্যাঙ্ক যে সময় এই কোয়ান্টাম তত্ত্ব দেন তখনও তিনি আলো যে কণিকার সমষ্টি তা মনে করতেন না। বরং তিনি আলোকে শক্তি-তরঙ্গ বলেই বিশ্বাস করতেন। আর সে তরঙ্গ হল অনুপ্রস্থ তরঙ্গ [Transverse Wave]। কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ সমস্যা সমাধানের জন্য প্ল্যাঙ্ক অবতারণা করেছিলেন কোয়ান্টামসমূহের তথা কণাবাদের।

এরপর আসরে এলেন আইনস্টাইন। তিনি 1905 সালে তাঁর 'আলোকবৈদ্যুৎক্রিয়া তত্ত্ব' [Photo-electric Effect Theory]প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, আলোক-শক্তি শুধু খণ্ড খণ্ডভাবে নির্গত বা শোষিত হয় তা নয়, নির্গমন ও শোষণ—এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তীকালে অর্থাৎ আলোর প্রবহমান অবস্থায়ও আলো খণ্ড খণ্ড অবিভাজ্য টুকরোর সমষ্টি। তিনি এই টুকরোগুলির নাম দেন 'ফোটন' [Photon]। আলো কিংবা যে কোন বিকীর্ণ শক্তি হল ঝাঁক ঝাঁক ফোটনের সমষ্টি এবং ফোটন হল শক্তির মূল কণা যার শক্তির পরিমাণ $E = h\upsilon$ যেখানে h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক এবং υ = কম্পাঙ্ক।

আলোকবৈদ্যুৎ তত্ত্বে আলোর কণাধর্ম প্রতিষ্ঠিত হল। প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টামবাদ আরও দৃঢ় ভিত্তি পেল। কিন্তু আলোর দ্বৈত সত্তা রয়েই গেল। ব্যতিচার, ডিফ্রাকশনের বেলায় আলোক তরঙ্গ-ধর্মী। আবার আলোকবৈদ্যুৎ ক্রিয়ায় সে কণাধর্মী বা ফোটন। আলো আজও ওই দ্বৈতসত্তা সম্পন্ন। বিজ্ঞানীরা দুটি সত্তাই মেনে নিয়েছেন।

1924 সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর Plank's Law and the Hypothesis of Light Quanta' নিবন্ধে শক্তি প্রবাহের মধ্যে কণাধর্ম ও তরঙ্গ-ধর্ম যুগপৎ নিহিত আছে এটা বলা হয়। এই নিবন্ধটির অনুবাদ করেন স্বয়ং আইনস্টাইন। আর তিনিই এটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন বিখ্যাত Zeitschrift fur Physik পত্রিকায়। এরপর বিখ্যাত হয় 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন'। তিনি দেখালেন, শক্তির তরঙ্গ ধর্মকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, কেবলমাত্র বস্তুকণার তুল্যরূপ হিসাবে ধরে প্ল্যাঙ্কের ওই বিখ্যাত সূত্র $dE=\frac{8\pi hc}{\lambda^5}\cdot\frac{d\lambda}{e^{hc/\lambda KT}-1}$ এতে আসা যায়। যদিও তিনি ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গবাদ পুরোপুরি উপেক্ষা করেই প্ল্যাঙ্কের ওই সূত্র পান; তবুও তরঙ্গের স্বভাব সমবর্তন [Polarization] প্রত্যয়ের মাধ্যমে তাঁকে আলোকের তরঙ্গধর্মকে স্বীকার করতে হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর প্রস্তাবে আলোক কণিকার একটি নিজস্ব স্বভাবজাত চক্রণ [Spin] থাকার কথা বলেছিলেন। কিন্তু আইস্টাইন চক্রণের পরিবর্তে সমবর্তন কথাটি আনেন। পরবর্তীকালের গবেষকরা অবশ্য বলছেন সত্যেন্দ্রনাথের ওই বিখ্যাত সংখ্যায়নে আলোর শুধু কণাধর্ম নয় তরঙ্গধর্মের কথাও রয়েছে কিছুটা গৌণভাবে। 1924 সালের সেপ্টেম্বর মাসে লুই ভিক্টর দ্য ব্রগলি প্রকাশ করলেন তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধ যাতে তিনি দেখালেন শুধু আলো নয় বিশ্বের সমস্ত বস্তুই দ্বৈতসত্তাসম্পন্ন। একদিকে তা কণাধর্মী, আর অন্যদিকে সে তরঙ্গধর্মী। এই বিশ্বের প্রতিটি কণিকাই যুগপৎ কণাধর্মী এবং তরঙ্গধর্মী। সমস্ত বস্তুরই তরঙ্গ আছে। তাঁর সূত্র থেকে বস্তুর ভর ও বেগ জানা থাকলে সেই বস্তুটির তরঙ্গরূপের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের করা যাবে। এর উপর ভিত্তি করে গ'ড়ে উঠল কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান

[Quantum Mechanics]। বস্তুর জড়ত্ব গেল ঘুচে। জগৎ হল তরঙ্গময়। পদার্থ ও তরঙ্গের ভেদ গেল মুছে। ম্যাক্সওয়েল যে বলেছিলেন বস্তুই বিশ্বের অবিনশ্বর ভিত্তি, তা তাঁর বলার 60 বছরের মধ্যেই ভুল বলে প্রমাণিত হল।

লুই দ্য ব্রগলি জন্মগ্রহণ করেন ফ্রান্সের দিয়েপ্পে [Dieppe] শহরে 1892 সালের 15ই আগস্ট। তাঁর পুরো নাম হল লুই ভিক্টর পিয়েরে রেমণ্ড ডিউ দ্য ব্রগলি [Louis Victor Pierre Raymond due de Broglie]। রাজ পরিবারে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন ভিক্টর ডিউ দ্য ব্রগলি [Victor Due de Broglie] এবং তাঁর মায়ের নাম পাউলিন ডি আরমাইলি [Pauline d' Armaillé]। 1909 সাল অবধি ব্রগলি প্যারিসের লাইসি জ্যাঁসঁ দ্য সেইলি [Lyceé Janson de Sailly] মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশুনা করেন। স্কুলে পড়ার সময় তিনি বিজ্ঞানী হওয়ার কথা ভাবেন নি। বরং ভাবতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করবেন। বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে তিনি সোরবোন [Sorbonne] বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি রাষ্ট্রদূত হবেন। 18 বছর বয়সে তিনি কলাবিভাগে স্নাতক হন। এই সময় তিনি অঙ্ক ও পদার্থবিজ্ঞানে আকৃষ্ট হন। ইতিহাসে গবেষণা আরম্ভ করেও তিনি তা ছেড়ে দিয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় ডিগ্রীর জন্য পড়াশুনা শুরু করেন। 1913 সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক হন। এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ব্রগলি সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হন। তাঁকে টেলিগ্রাফ বিভাগে কাজ দেওয়া হয়। পুরো যুদ্ধটাই তিনি আইফেল টাওয়ার [Eiffel Tower] স্টেশনে টেলিগ্রাফ বিভাগে কাজ করতেন। এই সময় তিনি যান্ত্রিক সমস্যাগুলি নিয়েই চিন্তাভাবনা করতেন। বিজ্ঞান চিন্তার অবকাশ তাঁর ছিল না তখন। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর 1920 সালে তিনি তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। প্ল্যাঙ্ক এবং আইনস্টাইন নিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা করলেও তিনি পরীক্ষাভিত্তিক পদার্থবিজ্ঞানেও যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। এই সময় তাঁর ভাই মরিস দ্য ব্রগলি [Maurice de Broglie] এক্স-রে নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ব্রগলি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আগ্রহ দেখালেন। তিনি তাঁর ডক্টরেট হওয়ার জন্য যে গবেষণাপত্র জমা দিলেন তা হল 'Researches on the Quantum Theory'। এতে তিনি ইলেকট্রন-তরঙ্গ তত্ত্বের অবতারণা করলেন প্ল্যাঙ্ক এবং আইনস্টাইনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। 1924 সালে সেপ্টে ম্বর মাসে তিনি এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বেই আছে পদার্থের দ্বৈতসত্তার কথা। কোনও বস্তুর যেমন কণাধর্ম আছে তেমনি আছে তরঙ্গধর্ম। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে যুগপৎ এই দুই ধর্ম নিহিত থাকার কথা দ্য ব্রগলি তাঁর এই গবেষণাপত্রে নির্দিষ্টভাবে বললেন। এই তত্ত্বের আভাস ছিল সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম গবেষণাপত্রে যা একটু আগেই বলেছি। সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় 1924 সালের জুলাই মাসে, আর দ্য ব্রগলির গবেষণাপত্র বের হয় ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে।

ব্রগলির এই নতুন তত্ত্ব 1927 সালে পরীক্ষগারে প্রমাণিত হয়। 1929 সালের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ব্রগলিকে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে তিনি তাঁর বক্তৃতায় বস্তু-তরঙ্গের এই মতবাদ উদ্ভাবনের পশ্চাদ্‌পট বর্ণনা করে বলেন ঃ

"Thirty years ago, physics was divided into two camps : .... the physics of matter, based on the concepts of particles and atoms which were supposed to obey the laws of classical Newtonian mechanics, and the physics of radiation, based on the idea of wave propagation in a hypothetical continuous medium, the luminous and electromagnetic ether. But these two systems of physics could not remain detached from each other : they had to be united by the formulation of a theory of exchanges of energy between matter and radiation. ....In the attempt to bring the two systems of physics together, conclusions were in fact reached which were neither correct nor even admissible when applied to the energy equilibrium between matter and radiation ... Planck ... assumed ... that a light source .... emits its radiation in equal and finite quantities - in quanta. The success of Planck's ideas has been accompanied by serious consequences. if light is emitted in quanta, must it not, once emitted, possess a corpuscular structure? ...Jeans and Poincaré [showed] that if the motion of the material particles in a source of light took place according to the laws of classical mechanics, then the correct law of black-body radiation, Planck's, law, could not be obtained."

অনেকটা পরে 1963 সালে এক সাক্ষাৎকারে ব্রগলি এই বস্তু-তরঙ্গের ধারণা কেমন করে জন্ম নিল সে কথা বলেছিলেন। 1923 সালের গ্রীষ্মকালে তিনি বস্তু-তরঙ্গের ধারণায় উপনীত হন। ভাইয়ের সঙ্গে এক্সরে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময়ই এই ধারণা তাঁর মাথায় আসে।

"As in my conversations with my brother we always arrived at the conclusion that in the case of X-rays one had both waves and corpuscles, thus suddenly- ...it was certain in the course of summer 1923 - I got the idea that one had to extend this duality to material particles, especially to electrons, And I realised that, on the one hand, the Hamilton-Jacobi theory pointed somewhat in that direction, for it can be applied to particles and, in addittion, it represents a geometrical optics ; on the other hand, in quantum phenomena one obtains quantum numbers, which are rarely found in mechanics but occur very frequently in wave phenomena and in all problems dealing with wave motion."

ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম পরীক্ষাগারে প্রমাণ হল 1927 সালে। যুক্তরাষ্ট্রের সি. জে. ডেভিসন [C. J. Davisson], সি. এইচ কুনসম্যান [C.H. Kunsman] এবং এল. এইচ. জারমার [L. H. Germer], স্কটল্যান্ডের জি পি থমসন [G. P. Thomson] পরীক্ষাগারে ইলেকট্রনের তরঙ্গ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন। এই জি. পি থমসন হলেন জে. জে থমসনের পুত্র, যিনি পরীক্ষাগারে ইলেকট্রনের $\frac{e}{m}$ -এর মান সর্বপ্রথম নির্ণয় করে 1906 সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। এখানে e হল ইলেকট্রনের তড়িতাধান এবং m হল ওই ইলেকট্রনের ভর। জি. পি. থমসন ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম পরীক্ষাগারে প্রমাণ করে নোবেল পুরস্কার ভাগ করে নেন ডেভিসনের সঙ্গে 1937 সালে। ব্রগলির ইলেকট্রন-তরঙ্গের তত্ত্ব থেকেই শ্রোয়েডিঙ্গার, ডিরাক, ম্যাক্স বর্নদের তরঙ্গ বলবিজ্ঞান [Wave Mechanics] বেরিয়ে আসে কিছুটা পরেই।

ডক্টরেট হওয়ার পর ব্রগলি সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছর পড়ান। 1928 সালে তিনি হেনরি পঁয়কার [Henri Poincare] ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক হন। 1932 সাল অবধি তিনি এখানে কাজ করেন। 1962 সালে তিনি অবসর নেন। 1944 সালে তিনি সদস্য হন 'Bureau des Longitudes'-এর। 1945 সালে তিনি ফ্রেঞ্চ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশারিয়েট-এর [French Atomic Energy Commissariat] উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। 1929 সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষে ব্রগলির দেওয়া বক্তৃতার কিছুটা উদ্ধৃতি আগেই দেওয়া হয়েছে। তারই আর একটু উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করা যাক ঃ

"Thus I arrived at the following general idea which has guided my researches : for matter, just as much as for radiation, in particular light, we must introduce at one and the same time the corpuscle concept and the wave concept. In other words, in both cases we must assume the existence of corpuscles accompanied by waves. But corpuscles and waves cannot be independent, since, according to Bohr, they are complementary to each other ; consequently it must be possible to establish a certain parallelism between the motion of a corpuscle and the propagation of the wave which is asociated with it."

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর ব্রগলি তরঙ্গ বল-বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করতে থাকেন। তাঁর গবেষণাপত্রগুলি ডিরাকের ইলেকট্রন তত্ত্ব, আলোর নতুনতত্ত্ব, কণাদের চক্রণ [Spin] ইত্যাদি বিষয়ে নতুন আলোকপাত করে। তিনি সারাজীবনে অন্ততঃ পঁচিশটি বই লিখেছেন। এই বইগুলির কয়েকটি বিখ্যাত বই হল ঃ

Ondes et mouvements (Waves and Motions) (1926), La mécanique ondulatoire (Wave Mechanics) (1928) Une tentative d'ınterprétation causale et non linéaire de la mécanique ondulatoire : la théorie de la double solution (1956), Introduction à la nouvelle théorie des particules de M Jean-Pierre Vigier et de ses collaborateurs (1961), étude critique des bases de l'interprétation actuelle de la mécanique ondulatoire (1963). এই বইগুলির কয়েকটির ইংরেজী অনুবাদ 1960 – 1964 সালে প্রকাশিত হয়। এগুলি হল 'Non-linear Wave Mechanics : A Casual Interpretation [1960], Introduction to the Vigier Theory of Elementary Particles [1963] এবং 'The Current Interpretation of Wave Mechanics : A Critical Study [1964]। তাঁর জনপ্রিয় বইগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ 'Matter and Light : The New Physics (1939), The Revolution in Physics [1953] ; Physics and Microphysics (1960) এবং New Perspectives of Physics [1962]। এই বইগুলিতে ব্রগলি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

সোরবোনের সায়েন্স অ্যাকাডেমি ব্রগলিকে 1929 সালে হেনরি পঁয়কার পদক দেয় এবং 1932 সালে দেয় 'মোনাকোর আলবার্ট 1 নং' পুরস্কার। ইউনেস্কো [UNESCO] তাঁকে 'কলিঙ্গ পুরস্কার' দেয় 1952 সালে। ফরাসী জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র [French National Scientific Research Centre] 1956 সালে তাঁকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। এছাড়াও তিনি 'লিজিওন অফ অনার' [Légion d' Honneur] সম্মান লাভ করেন।

বেলজিয়াম থেকে পান 'অর্ডার অফ লিওপোল্ড' সম্মান। ব্রগলিকে সাম্মানিক ডক্টরেট দিয়েছে ওয়ারস, বুখারেস্ট, এথেন্স, লাউসেন্নে, কুইবেক এবং ব্রাসেলস বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ। তিনি ইউরোপ, ভারতবর্ষ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট আঠারটি বিভিন্ন অ্যাকাডেমির সম্মানীয় সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন।

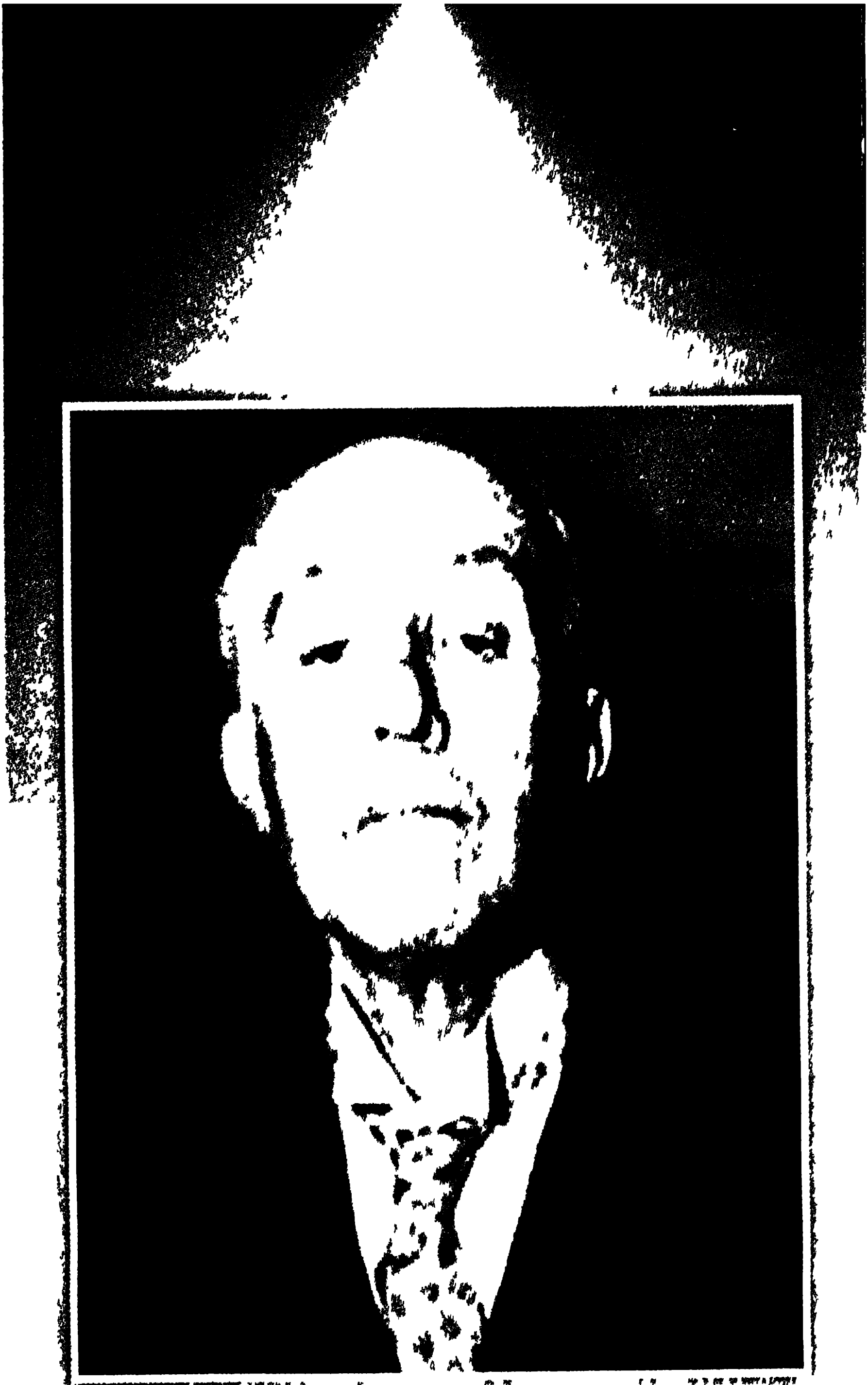
ব্রগলি মানসিক দিক থেকে তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের ভক্ত ছিলেন। ভাইয়ের সংগে পরীক্ষাগারে এক্সরে নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও তাঁর মানসিক গঠন ছিল তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের উপযোগী। দর্শনের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল। বিজ্ঞানের দার্শনিক ব্যঞ্জনায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আধুনিক বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কারের দার্শনিক ব্যঞ্জনা দিয়ে লেখা 1960–1964 সালের যে চারটি বইয়ের কথা একটু আগেই বলা হয়েছে, সেই বইগুলিই বলে দেয় ব্রগলির দার্শনিক জ্ঞানের গভীরতার কথা। ব্রগলি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, "....having much more the state of mind of a pure theoretician than that of an experimenter or engineer, loving especially the general and philosophical view ..."

এবার ব্রগলির সেই মহান আবিষ্কারগুলির কথায় আসি। ফিরে আসি আবার ম্যাক্সওয়েলের কথায়। বস্তু বা পদার্থ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ম্যাক্সওয়েল [James Clark Maxwell] বলেছিলেন, 'The imperishable stones of the universe' বা 'বিশ্বের অবিনশ্বর ভিত্তি-প্রস্তর' হল বস্তু বা পদার্থ। অর্থাৎ বস্তুই বিশ্বের অক্ষয় আদি উপাদান। কিন্তু এর মাত্র 60 বছর পরেই দেখা গেল ম্যাক্সওয়েলের ধারণা ভুল। নতুন নতুন আবিষ্কারে বস্তুর রূপ দাঁড়ালো তরঙ্গ-সমষ্টি। বস্তুর তরঙ্গ সমষ্টি থেকে আমরা যে বিশ্বের ধারণা পাই, সেই বিশ্বের রূপ দাঁড়ালো তরঙ্গরাশি। এর অর্থ হল এই বিরাট বিশ্বের যা কিছু সব — নক্ষত্র, গ্রহ, চন্দ্র, সূর্য, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সব কিছুই তরঙ্গ-সমষ্টি মাত্র। অর্থাৎ জগৎ তরঙ্গময়। সব কিছুই একই ধরনের তরঙ্গের সমাবেশে উৎপন্ন। এই সব তরঙ্গ কোনো মাধ্যমে সৃষ্টি হয় না, হয় সম্পূর্ণ শূন্যে (Void)। আবারো বলি, 1906 সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী জোসেফ জন থমসন (Joseph John Thomson) -কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ইলেকট্রনের তড়িতাধান (Charge) ও ভরের অনুপাত অর্থাৎ $\frac{e}{m}$ পরীক্ষাগারে নির্ণয়ের জন্য এবং এভাবে ইলেকট্রনের কণাধর্ম প্রমাণের জন্য। আবার তাঁর পুত্র জর্জ প্যাগেট থমসন [George Paget Thomson] 1937 সালে ডেভিসনের (Davisson) সঙ্গে নোবেল পুরস্কার ভাগ করে নিলেন পরীক্ষাগারে ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্মগুলি প্রমাণ করে।

1905 খ্রীষ্টাব্দে আইনস্টাইন তাঁর 'আলোকবৈদ্যুৎ প্রক্রিয়া তত্ত্ব' [Photo-electric Effect Theory) প্রকাশ করেন। তাঁর এই বিখ্যাত তত্ত্বে আলোর তরঙ্গরূপ চলে যায়, আসে কণিকারূপ। পরে এই দ্বৈত রূপই চলতে থাকে। সমস্ত বিকিরিত শক্তিরই ওই দ্বৈতরূপ আজ প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণা থেকেই দ্য ব্রগলি [Louis de broglie] 1924 সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন' পত্রিকাতে এক নিবন্ধ লেখেন। তিনি তখন অখ্যাত



যৌবনে দ্য ব্রগলি [1892-1987]



বার্ধক্যে দ্য ব্রগলি [1892-1987]

এক তরুণ বিজ্ঞানী। তাঁর নিবন্ধে তিনি বললেন, যে কোনো বস্তু, সে বস্তুটি গ্রহ, উপগ্রহ, পাথর, ধূলিকণা, নক্ষত্র কিংবা ইলেকট্রন যাই হোক না কেন, চলন্ত অবস্থায় তা হবে কতকগুলি তরঙ্গের সমষ্টি। তড়িচ্চুম্বকীয় [Electromagnetic] তরঙ্গের মত এই বস্তু-তরঙ্গগুলিও [Matter Waves] সম্পূর্ণ শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। এই সব তরঙ্গের গমনাগমনের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। এগুলি সাধারণ যান্ত্রিক উপায়ে বা মাধ্যম- সৃষ্ট তরঙ্গ নয়। কোনো বস্তু বিদ্যুতাহিত হোক বা না হোক বস্তুটির গতি থাকলেই সেটিতে এই তরঙ্গগুলি সৃষ্ট হবে। এগুলি তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গও [Electromagnetic Waves] নয়।

ফোটন কণিকার শক্তি হল $E = hf$ বা $f = \frac{E}{h}$, যেখানে E হল ফোটনের শক্তি, f হল তার কম্পাংক [Frequency] এবং h হল প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক [Planck's Constant)। তেমনি ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য [Wavelength] হল, $\lambda = \frac{h}{p}$, যেখানে λ হল ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য, p হল তার ভরবেগ। এইভাবে দ্য ব্রগলি যে গাণিতিক সূত্র বের করলেন তাতে দেখা গেল কোনো চলন্ত বস্তুর বেগ 'v' এবং ভর 'm' হলে বস্তুর 'বস্তুতরঙ্গ'-এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হবে,

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

যেখানে, m = চলমান বস্তুর ভর
v = চলমান বস্তুর বেগ
h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক
λ = বস্তুর তরঙ্গদৈর্ঘ্য

তেমনি, পৃথিবীর ভর হল 6×10^{27} গ্রাম, সূর্যের চারিদিকে এর আবর্তন বেগ হল প্রতি সেকেন্ডে 3×10^{6} সেন্টিমিটার। সুতরাং বস্তুরূপী পৃথিবীর তরঙ্গরূপের তরঙ্গদৈর্ঘ্য হবে,

$$\lambda = \frac{6 6 \times 10^{-27}}{6 \times 10^{27} \times 3 \times 10^{6}} \text{ সে মি}$$

$$= 3\dot{}6 \times 10^{-61} \text{ সে মি}$$

কারণ, $h = 6.6 \times 10^{-27}$ আর্গস-সেকেন্ড। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এই মান অকল্পনীয়ভাবে ক্ষুদ্র। এবার একটা লোহার গোলকের কথা ভাবা যাক। তার ভর 1000 গ্রাম এবং সেটি সেকেন্ডে এক কিলোমিটার বা 10^{5} সেন্টিমিটার বেগে ছুটছে। ছুটন্ত অবস্থায় লোহার গোলকটিতে যে বস্তুতরঙ্গ হবে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য হবে,

$$\lambda = \frac{6 6 \times 10^{-27}}{10^{3} \times 10^{5}} \text{ সে মি}$$

$$= 6{\cdot}6 \times 10^{-35} \text{ সে মি}$$

সুতরাং এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যেরও মান অতি ক্ষুদ্র। বাস্তবে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা কখনও সম্ভব হবে না।

এবার একটা ইলেকট্রনের কথা ধরা যাক। ইলেট্রনের ভর 9×10^{-28} গ্রাম। ইলেকট্রনের গতিবেগ বিভিন্ন হতে পারে। মনে করা যাক, এক ভোল্ট বিভব পার্থক্য রাখা হয়েছে। তখন ইলেকট্রনের গতিবেগ হবে সেকেন্ডে 6×10^7 সে মি। এই ইলেকট্রনটির তরঙ্গরূপে তরঙ্গদৈর্ঘ্য হবে,

$$\lambda = \frac{6\,6 \times 10^{-27}}{9 \times 10^{-28} \times 6 \times 10^{7}} \text{ সে মি}$$

$$= \frac{11 \times 10^{-6}}{9} \text{ সে মি}$$

$$= 1{\cdot}2 \times 10^{-7} \text{ সে মি}$$

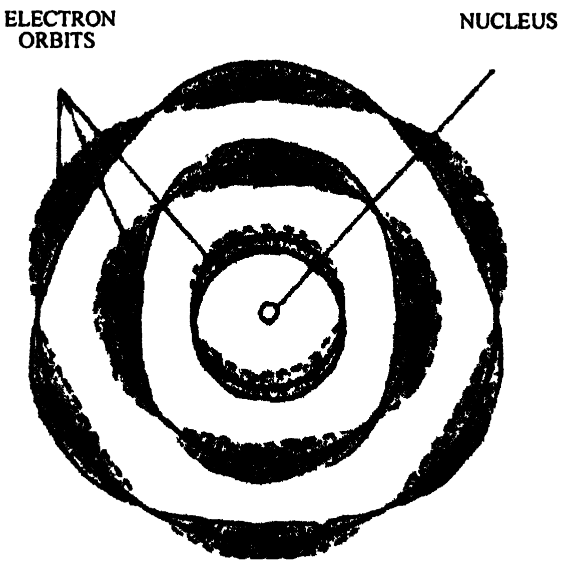
10^{-7} সে মি তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক্স-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অঞ্চলে অবস্থিত এবং এর ফটোগ্রাফি সম্ভব। দ্য-ব্রগলি তাঁর ওই নিবন্ধে এই আশা পোষণ করেছিলেন যে, বস্তু ও বিকিরণের অর্থাৎ বিকীর্ণ শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ব্যাপারটি ভালোভাবে উপলব্ধি করা যাবে, যদি ইলেকট্রনকে কণিকারূপে না ভেবে তরঙ্গরূপে ভাবা যায়।

দ্য ব্রগলির এই নিবন্ধ প্রকাশের কিছুদিন পরেই 1925 খ্রিস্টাব্দে হাইজেনবার্গ [W. Heisenberg) প্রকাশ করলেন তাঁর 'কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান' [Quantum Mechanics]। প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হল আরউইন শ্রোয়েডিঙ্গার [E. Schroedinger)-এর 'তরঙ্গ বলবিদ্যা' [Wave Mechanics]। তিনি তাঁর এই তত্ত্বে দ্য ব্রগলিকে অনুসরণ করে 'বস্তুর তরঙ্গ' ধারণার গাণিতিক রূপ এমন ভাবে দিলেন যে, তা দিয়ে প্রোটন ও ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম নির্ণয় করা যায় এবং কণাঘটিত ব্যাপার-স্যাপারও উপযুক্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়। শ্রোয়েডিঙ্গার পরে দেখিয়েছেন যে, হাইজেনবার্গের 'কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান' এবং তাঁর নিজের 'তরঙ্গ বলবিদ্যা' গাণিতিকভাবে একই ফলদায়ক। এগুলিই হল 'কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান' [Quantum Physics]-এর জনক।

1927 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার দুই পদার্থ বিজ্ঞানী ক্লিনটন ডেভিসন। (Clinton Davisson) ও লেস্টার জারমার [Lester Germer] তাঁদের গবেষণাগারে ফোটোগ্রাফিক প্লেটে ইলেকট্রনের তরঙ্গরূপকে ধরতে পারলেন। 1928 সালে থমসন ইলেকট্রন অপবর্তনের [Diffraction] সুন্দর ছবি তুলে দ্য ব্রগলির সমীকরণ সত্য বলে প্রমাণ করলেন। ফলে, ইলেকট্রনের তরঙ্গরূপ যে সত্যিই আছে তা প্রমাণিত হল। তাঁরা আরও দেখালেন যে, এই তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Wave Length) দ্য ব্রগলির সূত্রানুসারে নির্ণীত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। পরে আরও প্রমাণ পাওয়া গেল যে, শুধু ইলেকট্রনেরই নয় সমস্ত পরমাণু

এমন কি পরমাণুর দ্বারা তৈরি অণুদেরও তরঙ্গরূপ আছে। ম্যাক্সওয়েল যে বস্তুকে বিশ্বের অবিনশ্বর ভিত্তি-প্রস্তর বলেছিলেন, অর্থাৎ বস্তুই বিশ্বের আদি উপাদান এবং তার ক্ষয় নেই, তা আর বজায় রইল না এর পরে। অর্থাৎ 60 বছরের মধ্যেই ম্যাক্সওয়েলের ওই ধারণায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। ফলে, বস্তুর কঠিন রূপ গেল ঘুচে, বস্তুর থেকে খসে পড়ল পদার্থ। বিশ্বের রূপ দাঁড়ালো তরঙ্গ সমষ্টিমাত্র। এই বিশাল বিশ্বের গাছপালা, পশুপাখী, গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি সবই কেবল এক ধরনের তরঙ্গসমষ্টি। এই তরঙ্গ কোনো মাধ্যমে সৃষ্টি হয় না, সৃষ্ট হয় সম্পূর্ণ শূন্যে। এইভাবে দাঁড়ালো মহাবিশ্ব তরঙ্গসমষ্টি। সহজ করে বললে, জগৎ তরঙ্গময়।

আবারো বলি, 1892 সালে 15ই আগস্ট দ্য ব্রগলি জন্মগ্রহণ করেন ফ্রান্সের 'দিয়েপ্পে' [Dieppe] শহরে। রাজ পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন মূলত ইতিহাস ও দর্শনের ছাত্র। প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব, আইনস্টাইনের আলোকবৈদ্যুৎ প্রক্রিয়া ও বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তাঁকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। তিনি কোয়ান্টাম তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হন। এই কোয়ান্টাম তত্ত্ব নিয়ে তখন আলোড়ন চলছিল বিজ্ঞান জগতে। তিনি কোনো নির্দিষ্ট ভরের নির্দিষ্ট বেগে



চিত্র : 1 দ্য ব্রগলির পরমাণু মডেল

গতিশীল কণার উপর তরঙ্গ ধর্মের আরোপ করেন। তাঁর আগে পর্যন্ত সবাই নিঃসৃত কণার তরঙ্গধর্ম উপেক্ষা করেছিলেন। দ্য ব্রগলিই প্রথম নিঃসৃত কণার বিশেষ করে ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম আবিষ্কার করলেন এবং এ সম্পর্কে সূত্র দিলেন। ডেভিসন ও জারমার সর্বপ্রথম পরীক্ষাগারে ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম প্রমাণ করলেন। থমসনের পরীক্ষায়

ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্মের প্রমাণ আরও নিশ্চিত হয়। 1929 সালে দ্য ব্রগলিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম আবিষ্কারের জন্য। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হয়ে দ্য ব্রগলি 34 বছর কাজ করেন। প্যারিস বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর তিনি ছিলেন স্থায়ী সম্পাদক। 'ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমী'-তেও তিনি সদস্য নির্বাচিত হন।

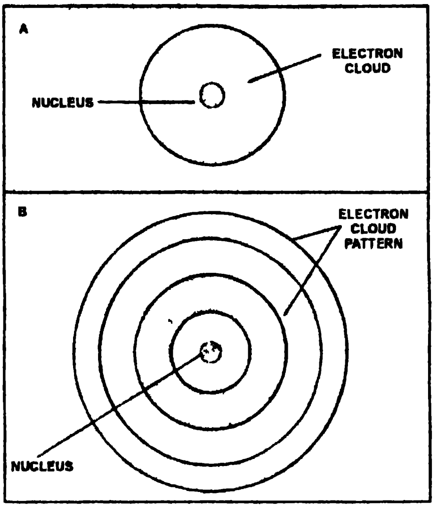
পরবর্তীকালে শ্রোয়েডিঙ্গার, হাইজেনবার্গ, ম্যাক্স বর্ন্ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা পদার্থের এই তরঙ্গরূপের আরও নানান ব্যাখ্যা ও গাণিতিক সূত্র আবিষ্কার করেন। ফলে, জগৎ যেমন তরঙ্গময় বলে প্রমাণিত হল, তেমনি এই তরঙ্গ যে সম্ভাব্যতার তরঙ্গ (Waves of Probability] তাও জানা গেল। অর্থাৎ আমরা এই বিশ্বকে বলতে পারি 'Universe of Wavicles', কারণ বিশ্ব হল বস্তুর তরঙ্গ সমষ্টি। 'Wavicles' কথাটা Wave ও Particle-এর মিশ্রণে তৈরি। এর বাংলা বলেছি 'তরঙ্গনিকা'। অর্থাৎ 'তরঙ্গ' ও 'কণিকা'-র মিশ্রণ। তা হলে আমরা বলতে পারি যে, আমরা এক তরঙ্গময় বিশ্বে, কিংবা তরঙ্গপূর্ণ বিশ্বে বাস করছি। আরও ভালো করে বললে, আমরা এক তরঙ্গণিকাপূর্ণ বিশ্বে বাস করছি।

বস্তুর তরঙ্গধর্ম আবিষ্কারের ফলে বোরেব নির্দিষ্ট পরমাণু মডেল অচল হয়ে পড়লো। সৌর জগতের গ্রহদের মতো ইলেকট্রনরা নির্দিষ্ট কক্ষপথে কেন্দ্রকের চারপাশে ঘুরছে, এই ধরনের পরমাণু মডেল অর্থহীন হয়ে গেল। দেখা গেল, কোনো ইলেকট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ওই ইলেকট্রনের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রকের থেকে দূরত্বের সমান। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য কণাটির আকার পরিমাপের একমাত্র সঠিক উপায়। এই অবস্থায় ইলেকট্রনটিকে সারা পরমাণু জুড়ে আছে ধরে নিতে হবে এবং ইলেকট্রনটিও আপাতভাবে পরমাণুটির মতই বড় হয়ে যাবে। তত্ত্বীয়ভাবে কিংবা যান্ত্রিক উপায়ে একটা ইলেকট্রনের কৌণিক অবস্থান বলা সম্ভব নয়, যদিও কেন্দ্রক থেকে কোনো দূরত্বে একটা ইলেকট্রনকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাব্যতা অঙ্ক কষে বের করা সম্ভব। সুতরাং কক্ষপথের ধারণা কোনোভাবেই টিকে থাকে না. কারণ কোনো একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে নির্দিষ্ট একটি ইলেকট্রনের ধারণাটাই অর্থহীন। ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম এটাই নির্দেশ করে যে, বোর প্রবর্তিত পরমাণু-মডেল বিভ্রান্তিকর এবং এতে পরমাণুর অভ্যন্তরীণ প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত হয় নি। ফলে, বোরের পরমাণু-মডেল অচল হয়ে গেল। বস্তু-তরঙ্গ আবিষ্কৃত হওয়ায় পরমাণুর অভ্যন্তরীণরূপ গেল বদলে। নতুন পরমাণু মডেল এলো দ্য ব্রগলির হাত ধরে।

দ্য ব্রগলি বোরের পরমাণু মডেলের জায়গায় নতুন পরমাণু মডেল দিলেন। তাঁর দেওয়া পরমাণু মডেল । নম্বর চিত্রে দেখানো হল। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান একটা নির্দিষ্ট রূপ নেওয়ার আগে অবধি পরমাণু মডেলও অনেকবার বদলেছে। বোরের পরমাণু মডেলকে [Bohr's Atom Model] ব্রগলির এই মডেল ওই সময়ই বাতিল করে দেয়।

পরবর্তীকালে এই পরমাণু মডেল আরও পরিবর্তিত হয়। আধুনিক মডেলে কেন্দ্রকের চারদিকে 'Cloudy Region'-এর কল্পনা করা হয়, যেখানে ইলেকট্রনগুলিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সুতরাং সম্ভাব্যতা এসে গেছে এই মডেলে। সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা এখন কোয়ান্টাম তত্ত্বের [Quantum Theory] সার কথা। কণাজগতে এখন কার্য-কারণ নিশ্চয়তা নেই।

সম্ভাব্যতা সেখানে মূল মন্ত্র। তাই পরমাণু-মডেলেও সেই অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতা। 'Cloudy Region' সম্পন্ন পরমাণু মডেলের মোটামুটি রূপরেখা এই রকম ঃ



চিত্র ঃ 2 আধুনিক পরমাণু-মডেল

A) হাইড্রোজেন পরমাণু, B) সোডিয়াম পরমাণু

এই ধরনের মডেল এখন পরমাণু মডেল হিসাবে চালু। এতে পদার্থবিদ্যার এবং রসায়ন বিদ্যার অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে বলেই এই মডেলই এ কালের স্বীকৃত পরমাণু মডেল। বিজ্ঞানী মহল এই 'Electron Cloud Pattern'-এর পরমাণু মডেলই এখন ব্যবহার করছেন। [চিত্র নম্বর ঃ 2]।

ব্রগলি মারা যান 1987 সালের মার্চ মাসে। তাঁর মৃত্যু হয় প্যারিসেই। সুতরাং 95 বছরের দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন ব্রগলি। দীর্ঘজীবী এই নোবেলবিজ্ঞানী সারা জীবন বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চা করেই কাটিয়েছেন। তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করা যাক পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান C. W. Oseen বেশ কিছু কাল পরে তাঁর সম্পর্কে যে সব কথা বলেছিলেন তার কিছুটা উদ্ধৃত করে।

"When quite young you threw yourself into the controversy raging round the most profound problem in physics. You had the boldness to assert, without the support of any known fact, that matter had not only a corpuscular nature, but also a wave nature. Experiment came later and established the correctness of your view. You have covered in fresh glory a name already crowned for centuries with honour."

কোয়াণ্টাম বলবিজ্ঞানের আজকের উন্নতির পিছনে যে সব পদার্থবিজ্ঞানীর স্মরণীয় অবদান রয়েছে দ্য ব্রগলি তাঁদের অন্যতম। ●

কার্ল হাইজেনবার্গ

[1901–1976]

মিউনিখ তখন তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণার পীঠস্থান। সময়টা 1920 খ্রিস্টাব্দ। পদার্থবিজ্ঞানের এক দিকপাল আর্নল্ড সোমারফেল্ড (Arnold Somerfeld) সে সময় মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এক জার্মান ছাত্র তাঁর কাছে এলেন পি এইচ ডি ডিগ্রির জন্য গবেষণা করতে। সময়টা তখন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার [Quantum Mechanics] জন্মলগ্ন। মিউনিখে তাই বহু উচ্চাকাঙ্ক্ষী গবেষকের ভীড়। সোমারফেল্ড প্রথম দর্শনেই ছাত্রটিকে খুব উৎসাহ দিলেন। ছেলেটিকে ডেকে বললেন, "তোমার জন্য পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের একটা প্রবলেম [Problem] ঠিক করে রেখেছি, বিশেষ কোনো অঙ্কের প্রয়োজন নেই, Cross-word Puzzle-এর মতই সোজা"। এই বলে তিনি Anomalous Zeeman Effect-এর তোলা ছবি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্য দিয়ে নতুন ছাত্রটিকে কী করতে হবে বুঝিয়ে দিলেন। ছাত্রটি কিন্তু মাত্র ছয়দিনে, সেই তথ্যগুলো মিলিয়ে এক অর্ধসংখ্যার কোয়ান্টাম তত্ত্ব তৈরি করলেন। সোমারফেল্ড ছাত্রের কাজে বেশ অখুশিই হলেন। অর্ধসংখ্যার কোয়ান্টাম তত্ত্ব পূর্ণসংখ্যার কোয়ান্টাম তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। ফলে, সোমারফেল্ড ছাত্রের এই কাজে মোটেই খুশি হতে পারলেন না। কিন্তু সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে তিনি ছাত্রের কথাই মেনে নিলেন। ছাত্রটির 20 বছর বয়সেই তাঁর গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়, যা তত্ত্বীয়ভাবে পরবর্তীকালে আরও ভালো করে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ছাত্রটি হলেন নোবেল-জয়ী পদার্থবিজ্ঞানী অনিশ্চয়তা-নীতির জনক ওয়ার্নার কার্ল হাইজেনবার্গ।

পদার্থবিজ্ঞানে 'অনিশ্চয়তা-নীতি'-র [Uncertainity Principle] জনক হাইজেনবার্গ জন্মেছিলেন 1901 খ্রিস্টাব্দের 5ই ডিসেম্বর। জন্মস্থান জার্মানীর উর্জবার্গ (Wurzburg)। 1920 সালে তিনি গবেষণা আরম্ভ করেন মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমারফেল্ডের অধীনে। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1923 সালে পি এইচ ডি করার পর এক বছর ধরে তিনি অঙ্কশাস্ত্রবিদ ডেভিড হিলবার্ট [David Hilbert] এবং পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্ন [Mzx Born] উভয়ের কাছে পড়াশুনো করেন। পরের বছর নীলস্ বোরের [Neils Bohr] তত্ত্বাবধানে থেকে কোপেনহেগেনে পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা করেন। 1932 খ্রিস্টাব্দে এই জার্মান পদার্থবিদ কোয়ান্টাম-বলবিজ্ঞানের অন্যতম স্রষ্টা হিসাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পরমাণু পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান অসীম। তাঁর অনিশ্চয়তা-নীতি অবিশ্বাস্য হলেও মহান সত্য।

হাইজেনবার্গের পুরো নাম ওয়ার্নার কার্ল হাইজেনবার্গ। তাঁর পিতা অগাস্ট হাইজেনবার্গ [August Heisenberg], আর তাঁর মা আন্না ওয়েকলেইন [Anna Wecklein]।

হাইজেনবার্গের জন্মের সময় অগাস্ট উর্জবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এর আগে তিনি প্রাচীন ভাষাগুলির শিক্ষক ছিলেন উর্জবার্গেরই একটা স্কুলে। কিছু পরে তিনি মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক গ্রীকভাষার অধ্যাপক হন মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে। হাইজেনবার্গ বলেছেন যে, জাপানী পদার্থবিজ্ঞানী উকাওয়া [Yukawa] যখন মেসন [Meson] কণা আবিষ্কার করেন তখন ওই নব-আবিষ্কৃত কণাটির 'মেসন' নামকরণে অগাস্টেরই প্রধান ভূমিকা ছিল। প্রথমে ওই কণাটির নাম রাখা হয় 'মেসট্রন' [Mesotron]। হাইজেনবার্গের পিতা অগাস্টই বলে দেন যে, ওই গ্রীক শব্দটিতে 'ট্র' নেই। শব্দটি হবে 'মেসন'। সেই অনুসারে কণাটির প্রাথমিক নাম বদল করে পাকাপাকিভাবেই রাখা হয় 'মেসন'।

হাইজেনবার্গের দাদামশায় অর্থাৎ আন্নার বাবা নিকোলাস ওয়েকলেইন [Nicholaus Wecklein] ছিলেন মিউনিখের ম্যাক্সিমিলিয়নস্ জিমনাসিয়ামের [Maximilians Gymnasium] প্রধান শিক্ষক। ওই স্কুলেই শিক্ষানবিস শিক্ষক হিসাবে কাজ করছিলেন অগাস্ট। তিনি আন্নাকে দেখলেন। 1899 সালের মে মাসে আন্না ও অগাস্ট বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের প্রথম সন্তান আরউইন [Erwin] জন্মান 1900 সালের মার্চ মাসে। আরউইন হলেন হাইজেনবার্গের বড়দাদা। 1901 সালের ডিসেম্বর মাসে ভূমিষ্ঠ হন কার্ল হাইজেনবার্গ। আরউইনের থেকে তিনি ছিলেন প্রায় দু'বছরের ছোট।

অগাস্ট ছিলেন লুথেরীয় খ্রিস্টান। আন্না বিয়ের আগে রোমান ক্যাথলিক থাকলেও বিয়ের সময় তাঁকে লুথেরীয় করে নেওয়া হয়, যাতে উভয়ের বিবাহ ধর্মবিশ্বাসে পার্থক্য থাকার জন্য বাতিল হয়ে না যায়। খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস এই দম্পতিকে গোঁড়া করে নি। বরং হাইজেনবার্গের পিতামাতা ছিলেন মুক্ত মনের মানুষ। তাঁরা যিশুর নীতিকথায় অনেক বেশি প্রভাবিত ছিলেন। বিশ্বাস করতেন না খ্রীষ্টধর্মের ঐতিহাসিক দিকটিতে এবং তার অলৌকিকত্বে। সুতরাং প্রায় উদারপন্থী এক পিতামাতার কোলেই এসেছিলেন হাইজেনবার্গ।

তাঁর বয়স পাঁচবছর পূর্ণ হওয়ার সামান্য আগে হাইজেনবার্গকে উর্জবার্গের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তিনি ওখানে তিন বছর পড়ার পর, অগাস্ট 1909 সালে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হলে, 1910 সালের জুন মাসে পুরো পরিবার চলে আসেন মিউনিখে। হাইজেনবার্গ এখানে এসে ভর্তি হন 'Elisabethenschule'-এ 1910 সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই স্কুলে মাত্র একবছর পড়ার পর তিনি ভর্তি হন 'ম্যাক্সিমিলিয়ানস জিমন্যাসিয়াম'-এ। আগেই বলেছি, এই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক ছিলেন তাঁর মায়ের বাবা বা দাদামশায়। এক শিক্ষিত পরিবারের উদার মানসিক চেতনার পরিবেশে তাঁর পঠন-পাঠন এগিয়ে চলতে থাকে।

1914 সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সেনাবাহিনী ওই স্কুল দখল করে কুচকাওয়াজ করতে থাকে। স্কুলের স্বাভাবিক কাজকর্ম স্থগিত রাখা হয়। হাইজেনবার্গ এই সময় নিজের পছন্দমত পড়াশুনা করতে থাকেন। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা এবং ধর্ম। ছাত্রজীবনে সব পরীক্ষাই তিনি রেকর্ড নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। অঙ্কটা তিনি এই সময় এতো ভালো শিখে ফেলেছিলেন যে, 1917 সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত

এক পারিবারিক বন্ধুকে তিনি রীতিমত ক্যালকুলাস পড়াতেন। এই সময় তাঁকে সামরিক শিক্ষাও নিতে হয়েছিল, যাতে প্রয়োজনে এইসব তরুণদের যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা যায়।

1918 সালে হাইজেনবার্গ আরও কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে মিলিতভাবে আপার ব্যাভেরিয়ার [Upper Bavaria] একটা দুধের ফার্মে শ্রমদান হিসাবে কাজ করেন। এখানে কাজের সময় ছিল দীর্ঘ এবং এতে শারীরিক পরিশ্রমও ছিল প্রচুর। তা ছাড়া এখানে বেশ কম খাবার জুটতো। আসলে এখানের শিক্ষায় কষ্টসহিষ্ণুতার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এই শিক্ষানবিশী করার সময় তাঁর অবসর সময় কাটতো দাবা খেলে এবং অঙ্কের বই পড়ে। এই সময়ই তিনি ক্রোনেকারের [Kronecker] কাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তা প'ড়ে ফেলেন। তেমনি তিনি ফারম্যাটের শেষ উপপাদ্য [Fermat's Last Theorem] প্রমাণ করার চেষ্টাও করেন এই সময়। 1918 সালে তিনি যুদ্ধেও যোগ দেন। যুদ্ধটা সেই বয়সে তাঁর কাছে খেলা বলেই মনে হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, 'I was a boy of 17 and I considered it a kind of adventure It was like playing cops and robbers '।

1920 সালে হাইজেনবার্গ আবিটুর [Abiture] পরীক্ষা দেন। ম্যাক্সিমিলিয়ানস্ স্কুল থেকে মাত্র দু'জন ছাত্র এই পরীক্ষায় বসে। হাইজেনবার্গ তাদের একজন। সারা ব্যাভেরিয়ায় এই পরীক্ষায় এগারোটি মাত্র স্কলারশিপ দেওয়া হত। হাইজেনবার্গ একাদশতম স্থান দখল করে এই বৃত্তিলাভ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি অঙ্ক ও পদার্থবিজ্ঞানে প্রচুর নম্বর পেলেও, প্রবন্ধে অনেক কম নম্বর পান। তাঁর এই প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'Tragedy as poetic art'। ম্যাক্সিমিলিয়ান ফাউন্ডেশন তাঁকে বিনা ভাড়ার আবাসন দিতে চাইলেও তিনি তা নেননি। পিতা-মাতার সঙ্গেই তিনি বসবাস করতে থাকেন।

আবিটুর পরীক্ষা এবং মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শুরু করার মাঝখানের সময়টা তিনি এক সামরিক হাসপাতালে কিছুদিন রাতের শিফটে কাজ করবার চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েন। তবে তিনি যথাসময়ে সেরে উঠেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ করতে শুরু করেন। 1920 সালে বিশুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশুনা তথা গবেষণা শুরু হয়। সংখ্যা তত্ত্বের [Number Theory) উপর পড়াশুনা শেষ করে তিনি চাইলেন ফার্দিন্যান্দ ফন লিন্ডেমানের [Ferdinand von Lindemann] তত্ত্বাবধানে গবেষণা করতে। লিন্ডেমানের কাছে ইন্টারভিউ দিলেন হাইজেনবার্গ। কিন্তু এই ইন্টারভিউ ভালো হল না। তাছাড়া সে সময় লিন্ডেমানের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করতে মাত্র দু'বছর বাকী ছিল। তাই তিনি প্রথমে হাইজেনবার্গের প্রস্তাবে রাজী হন নি। পরে অবশ্য রাজী হন সহকর্মী অগাস্টের এই সন্তানটিকে গবেষণায় সাহায্য করতে। হাইজেনবার্গ লিন্ডেমানের কাছে গবেষণা করলে তিনি বড় সংখ্যাতত্ত্ববিদ হতে পারতেন, কিন্তু বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী হতে পারতেন না। সে যাইহোক, তিনি লিন্ডেমানের কাছে গবেষণা না করে, গেলেন আর্নল্ড সোমারফেল্ডের [Arnold Sommerfeld] কাছে। সোমারফেল্ড হাইজেনবার্গকে ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন।

এই সময় পউলিও [W. Pauli] হাইজেনবার্গের সঙ্গে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। সহপাঠী পউলির সঙ্গে হাইজেনবার্গ সোমারফেল্ডের কাছে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ নিতে শুরু করেন 1920 সালের অক্টোবর মাসে। প্রথম দিকটা হাইজেনবার্গ অঙ্কের ক্লাসগুলিতে খুব মন দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে পড়াশুনা করতেন। কারণ তিনি ভেবে রেখেছিলেন যে, পদার্থবিজ্ঞান ভালো না লাগলে তিনি অঙ্কের গবেষণায় ফিরে যাবেন। পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় ভালো ফল করা নিয়ে এই সময় তাঁর মনে সন্দেহ ছিল। তিনি লিন্ডেমানের ক্লাশগুলিতে যেতেন না। ফলে অঙ্কশাস্ত্রের সংখ্যা-তত্ত্বের থেকে এই সময় তিনি জ্যামিতির দিকে অনেকটা বেশিই ঝুঁকে পড়েন। তবে এর কিছুদিনের মধ্যেই পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় তিনি তাঁর আত্মবিশ্বাস খুঁজে পান। সোমারফেল্ডের সমস্ত ক্লাশ তিনি মনযোগ সহকারে শুনতে থাকেন। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ করতে থাকেন। ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যায়ও তাঁর ঝোঁক বাড়তে থাকে। এই সময় তাঁর মুখ্য অনুসন্ধানের বিষয় ছিল আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ। পউলিও এই বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি হাইজেনবার্গকে পারমাণবিক গঠন নিয়ে গবেষণা করতে বললেন। কারণ তখনও পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত তত্ত্ব ও পরীক্ষালব্ধ ফলের মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান ছিল, যার ব্যাখ্যার প্রয়োজনও ছিল নিশ্চিতভাবেই। পউলি বলেছিলেন যে, হাইজেনবার্গ পারমাণবিক গঠন নিয়ে গবেষণা করলে অনেক নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সময়ের অবস্থার কথায় হাইজেনবার্গ লিখেছেন ঃ

"My first two years at Munich University were spent in two quite different worlds : among my friends of the youth movement and in the abstract realm of theoretical physics. Both worlds were so filled with intense activity that I was often in a state of great agitation, the more so as I found it rather difficult to shuttle between the two."

1922 সালের জুন মাসে হাইজেনবার্গ গটিংগেন গেলেন নীল্‌স্ বোরের [Niels Bohr] বক্তৃতা শুনতে। মিউনিখে ফিরে এলে সোমারফেল্ড তাঁকে একটা প্রবলেম [Problem] দিলেন সমাধান করে রাখার জন্য। এই 'প্রবলেম'-টি কিন্তু বর্তমানে নিবন্ধের শুরুতে বলা প্রবলেমের থেকে আলাদা। সোমারফেল্ড 1922-23 সালে আমেরিকা যুক্তরাজ্য পরিক্রমায় যান। দেশের বাইরে যাওয়ার আগে তিনি ছাত্রটিকে ওই সমস্যাটি দিয়ে যান সমাধানের জন্য। প্রশ্নটি বা সমস্যাটি ছিল 'তরলগতিবিজ্ঞান' [Hydrodybanmics] সম্পর্কিত। এই সমস্যার সমাধান তিনি বের করলেন। গটিংগেনে গিয়ে তিনি ম্যাক্স বর্নের [Max Born] সঙ্গে আলোচনা করে যে গবেষণাপত্র তিনি বানালেন তাতেই তিনি মিউনিখ থেকে 1923 সালে 'ডক্টরেট' ডিগ্রী লাভ করেন। সোমারফেল্ড বাইরে থাকায় তিনি গাটিংগেনে গিয়ে ম্যাক্স বর্ন, ফ্রাঙ্ক ও হিলবার্ট প্রমুখের সঙ্গে পারমাণবিক তত্ত্ব নিয়েও গবেষণা করেন।

ডক্টরেট পাওয়ারপর হাইজেনবার্গ ফিনল্যাণ্ড যান এবং ফিরে এসে 1923 সালের অক্টোবর মাসে ম্যাক্স বর্নের অধীনে গবেষণা শুরু করেন। 1924 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি কোপেনহেগেনে বোরের সঙ্গে দেখা করেন তাঁর 'ইনস্টিটিউট অফ থিওরিটিক্যাল

ফিজিক্সে [Institute of Theoretical Physics]। ওখানেই তাঁর প্রথম দেখা হয় মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে। কোপেনহেগেন থেকে গটিংগেনে ফিরে 1924 সালের 28 শে জুলাই হাইজেনবার্গ তাঁর জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ানোর যোগ্যতা নির্ণায়ক বক্তৃতা [Habilitation Lecture] দেন। পরবর্তীকালে তিনি লিখেছেন ঃ "I learned optimism from Sommerfeld, mathematics at Göttingen and physics from bohr."

কোপেনহেগেনের নীল্‌স্ বোর (Niels Bohr) তখন পদার্থবিজ্ঞানে আরেক বিশ্ববিখ্যাত প্রতিভা। তাঁর বক্তৃতা সভায় তরুণ গবেষকদের প্রচুর ভীড় হত। লোকে ঠাট্টা করে বলতো সভা নয় যেন 'বোরের উৎসব' [Bohr's Festival]। 1922 সালে বোর গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে আসেন। হাইজেনবার্গ এই বোর-উৎসবে যোগ দিলেন ও খুব মন দিয়ে বোরের বক্তৃতা শুনলেন। বক্তৃতার শেষে আলোচনায়ও যোগ দিলেন। প্রসঙ্গত এক জায়গায় বোরের বক্তব্যের বিরোধিতাও করেন হাইজেনবার্গ। ফলে, বোর হাইজেনবার্গকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিশদ আলোচনা করলেন। আলোচনান্তে বোর দ্বিধাহীনভাবে মেনে নিলেন হাইজেনবার্গের যুক্তি। তাঁর গবেষণার খোঁজখবর নিয়ে, তাঁকে বোর উৎসাহিত করেন। এর বছর খানেক পরে হাইজেনবার্গ বোরের কাছে যান গবেষণা করতে, যার কথা একটু আগেই বলা হয়েছে।

আগেই বলেছি, 1923 খ্রিস্টাব্দে 'তরলগতিবিজ্ঞান' [Hydrodynamics] নিয়ে গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট পান। ওই বছরই কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান [Quantum Mechanics) নিয়ে গবেষণা করেন একে গাণিতিক রূপ দেওয়ার জন্য। ডেভিড হিলবার্টের কাছে অঙ্ক শেখার কারণও তাই। 1924 সালে লুই দ্য-ব্রগলি কণা ও তরঙ্গের দ্বৈত-সত্তার কথা বললেন। 1926 সালে তার উপর ভিত্তি করে আরউইন শ্রোয়েডিঙ্গার [Erwin Schrodinger] গড়ে তুললেন 'তরঙ্গ বলবিদ্যা' [Wave Mechanics]। 1925 সালে হাইজেনবার্গ কোপেনহেগেনে বোরের কাছে কিছুদিন গবেষণা করতে যান। সেখান থেকে ফিরে ম্যাক্স বর্ন্ ও জর্ডনের সহায়তায় 'স্পেকট্রাল টার্মস' [Spectral Terms] ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন 'ম্যাট্রিকস্ বলবিদ্যা' [Matrix Mechanics] 1925 খ্রিস্টাব্দেই। পরবর্তীকালে দেখা যায়, এই ম্যাট্রিকস্ বলবিদ্যা ও তরঙ্গ বলবিদ্যা একই কথা বলছে। এই কাজের জন্যই তাঁকে 1932 সালে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এই নতুন তত্ত্বই হয়ে ওঠে 'কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান' [Quantum Mechanics]।

তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের স্রষ্টা হিসাবে। বলা হয় ঃ

"The creation of quantum mechanics, the application of which has led, among other things, to the discovery of the allotropic forms of hydregen."

নোবেল কমিটি তাঁদের বক্তব্যে বলেন ঃ

"Heisenberg.....viewed his problem, from the very beginning, from so broad an angle that it took care of systems of electrons, atoms, and molecules. According to Heisenberg one must start from such physical quantities as permit

of direct observation, and the task consists of finding the laws which link these quanttities together. The quantities first of all to be considered are the frequencies and intensities of the lines in the spectra of atoms and molecules. Heisenberg now considered the combination of all the oscillations of such a spectrum as one system, for the mathematical handling of which, he set out certain symbolical rules of calculation. It had formerly been determined already that certain kinds of motions within the atom must be veiwed as independent from one another to a certain degree, in the same way that a specific difference is made in classical mechanics between parallel motion and rotational motion. It should be mentioned in this connection that in order to explain the properties of a spectrum it had been necessary to assume self-rotation of the positive nuclei and the electrons. These different kinds of motion for atoms and molecules produce different systems in Heisenberg's quantum mechanics. As the fundamental factor of Heisenberg's theory can be put forward the rule set out by him with reference to the relationship between the position coordinate and the velocity of an electron, by which rule Planck's constant is introduced into the quantum-mechanics calculations as a determining factor. ...

Heisenberg's quantum mechanics has been applied by himself and others to the study of the properties of the spectra of atoms and molecules, and has yielded results which agree with experimental research. It can be said that Heisenberg's quantum mechanics has made possible a systemization of spectra of atoms. It should also be mentioned that Heisenberg, when he applied his theory to molecules consisting of two similar atoms, found among other things that the hydrogen molecule must exist in two different forms which should appear in some given ratio to each other. This prediction of Heisenberg's was later also experimentally confirmed."

হাইজেনবার্গ বিশ্বখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর অনিশ্চয়তা-নীতির [Uncertainty Principle] জন্য। 1927 সালে তাঁর এই অতিবিখ্যাত আবিষ্কারের কথা বলতে গিয়ে হাইজেনবার্গ 1969 সালে লিখেছিলেন ঃ

"To those of us who participated in the development of atomic theory, the five years following the Solvay Conference in Brussels in 1927 looked so wonderful that we often spoke of them as the golden age of atomic physics. The great obstacles that had occupied all our efforts in the preceding years had been cleared out of the way, the gate to an entirely new field, the quantum mechanics of the atomic shells stood wide open, and fresh fruits seemed ready for the picking."

1928 সালে হাইজেনবার্গ প্রকাশ করেন তাঁর 'The Physical Principles of Quantum Theory'. 1929 সালে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং ভারতে। 1930 সালে পউলির সঙ্গে একত্রে একটা গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন 'Quantised Realisation of Space' ব্যবহার করে। 1932 সালের গবেষণাপত্রে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের আধুনিক চিত্র কেমন হবে তার বিশদ বর্ণনা দেন হাইজেনবার্গ।

1935 সালে নাৎসিরা একটা আইন করে যে সব অধ্যাপকদের বয়স তখন 65 বছরের বেশি হয়েছিলো তাঁদের অবসর গ্রহণে বাধ্য করে। সোমারফেল্ডের বয়স তখন 66 বছর হওয়ায় তাঁকে অবসর নিতে হয়। সোমারফেল্ড চাইলেন তাঁর স্থানাভিষিক্ত হোন হাইজেনবার্গ। কিন্তু নাৎসিদের বিরোধিতায় তা হল না। হাইজেনবার্গ ছিলেন খাঁটি জার্মান। তবু নাৎসিরা তাঁর বিরুদ্ধে ছিল এই জন্য যে, তাঁর আবিষ্কারে নাকি 'Jewish Style' ছিল। সে সময় আপেক্ষিকতাবাদ এবং কোয়ান্টামতত্ত্ব নাৎসিদের চোখে ছিল 'Jewish Mathematics' তথা 'Jewish Physics'। উগ্র জাতীয়তাবাদী নাৎসির দল ঘোষণা করেছিল, 'German Mathematics' আনতে হবে ওই তথাকথিত 'Jewish Mathematics'-এর বদলে, 'German Physics' বানাতে হবে 'Jweish Physics'-এর পরিবর্তে। মহামূর্খ ওই নাৎসিদের বিরোধিতায় হাইজেনবার্গ সোমারফেল্ডের স্থলাভিষিক্ত হতে পারলেন না।

1937 সালে হাইজেনবার্গ বিয়ে করলেন এলিজাবেথ স্কুম্যাচার-কে [Elisabeth Schumacher]। হাইজেনবার্গ খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতেন। এক সংগীতের আসরেই তাঁদের পরিচয় ঘটে। এলিজাবেথের বয়স তখন মাত্র 22 বছর। হাইজেনবার্গের 35 বৎসর। তাঁরা বিয়ে করেন 1937 খ্রিস্টাব্দের 29 শে এপ্রিল। প্রথম দেখার তিন মাসের মধ্যেই তাঁদের বিয়ে হয়। মিউনিখে সোমারফেল্ডের জায়গায় যোগ দেওয়ার জন্য হাইজেনবার্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয় 1937 সালের মার্চ মাসে। বিয়ের জন্য তিনি তখনই ওই পদে যোগ দিতে পারবেন না বলে আগস্ট মাস অবধি সময় চান। ঠিক হল তিনি 1লা আগস্ট ওই পদে যোগ দেবেন। জুলাই মাসে তিনি সস্ত্রীক মিউনিখে এসে হাজিরও হন। কিন্তু নাৎসিদের বিরোধিতায় ওই পদে যোগ দিতে পারেন নি হাইজেনবার্গ।

1927 সাল থেকে 1941 সাল অবধি হাইজেনবার্গ 'লিপজিগ' [Leipizig] বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। এরপর তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এবং কাইজার উইলহেলম ইনস্টিটিউটের [Kaiser Wılhelm Institute] পদার্থবিদ্যার ডিরেক্টর হয়ে বার্লিনে আসেন। এখানেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পারমাণবিক বিভাজন [Nuclear Fission] সংক্রান্ত গবেষক বিজ্ঞানী দলের নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধের শেষে তিনি ওই ইনস্টিটিউটের পদার্থবিদ্যার ডিরেক্টর হন গোটিংগেনে। পরে এই ইনস্টিটিউট স্থানান্তরিত হয় মিউনিখে এবং এর নাম হয় 'ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট' [Max Plank Institute]। এখানে তখন চর্চা হত পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের। হাইজেনবার্গ মিউনিখেই মারা যান 1976 সালের 1লা ফেব্রুয়ারি।

পদার্থবিজ্ঞানে যখন চরম উত্তেজনাকর এবং প্রায় বিভ্রান্তিকর অবস্থা সে সময়ই তাঁর গবেষণার শুরু। 1913 সালে নীল্‌স্ বোর, প্ল্যাঙ্ক ও আইনস্টাইনের কোয়ান্টাম তত্ত্ব [Quantum Realisation] অনুসরণ করে পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত তত্ত্ব চালু করেন। তাঁর মতে পরমাণুর কেন্দ্রকের চতুর্দিকে যে সব কক্ষপথে ইলেকট্রনরা ঘুরে বেড়ায়, সেইসব কক্ষপথের শক্তিস্তর [Energy Level] ভিন্ন ভিন্ন। ইলেকট্রন যদি উচ্চ শক্তি-স্তর সম্পন্ন কক্ষপথ থেকে নিম্নশক্তি স্তরের কক্ষপথে যায়, তবে পরমাণুটি থেকে কিছুটা শক্তি নির্গত

হয় যার পরিমাণ ওই দুই কক্ষপথের শক্তি-স্তরের পার্থক্যের সমান। এইরকম ঝাঁপ দেওয়া ইলেকট্রনেরা [Jumping Electrons] উচ্চশক্তি-স্তর থেকে নিম্নশক্তি-স্তরে গেলেই পরমাণু থেকে নির্গত শক্তি বর্ণালির বিভিন্ন রেখা [Spectral Lines] সৃষ্টি করে। বর্ণালির বিভিন্ন রেখার সৃষ্টি হয় বিভিন্ন শক্তি-স্তর থেকে নিম্নতর বিভিন্ন শক্তিস্তরের কক্ষপথে ইলেকট্রনদের ঝাঁপ দেওয়ার ফলেই। বোরের পারমাণবিক গঠন তত্ত্বে পরমাণুর অভ্যন্তরীণ রূপ অনেকটা সৌর জগতের অনুরূপ। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহদের পরিক্রমার মতোই ইলেকট্রনরা পরমাণুর কেন্দ্রকের চারিদিকে পরিক্রমণরত।

বিজ্ঞানীরা বোরের এই পরমাণু-মডেল নিয়ে নানা প্রশ্ন তুললেন। পরমাণুর এই গঠনতত্ত্ব নিয়ে বোর বিরোধীদের প্রথম বক্তব্য হল এই সব ঝাঁপ দেওয়া ইলেকট্রনরা ঝাঁপ-দেওয়ার আগে কোথায় ছিল যদি তারা তাদের উপযুক্ত কক্ষপথে না থেকে থাকে। এই সমস্যার সমাধান বোরের মডেলে নেই। তা সত্ত্বেও সবাই বোরের মডেলই আঁকড়ে ধরে থাকল বহুদিন, যদিও সবকিছুর ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যাচ্ছিল না, বিশেষত পরমাণুর অভ্যন্তরীণ ব্যবহার সম্পর্কে। হাইজেনবার্গের বিপ্লবী চিন্তাধারা কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের জন্ম দিল। 1925 সালেই তিনি 250 বছর ধরে চালু বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস বা মতবাদ বাতিল করে দিলেন। যত রকমের পারমাণবিক মডেল আছে সব নাকচ করে দিয়ে তিনি বিজ্ঞানীদের ধ্যানধারণা আমূল বদলে দিলেন। অথচ এতদিন ধরে এইসব পরমাণু-মডেলই বিজ্ঞানীদের কাছে ছিল অত্যন্ত আদরণীয়। পুরানো মডেলগুলি দিয়ে অনেক কিছুর ব্যাখ্যা পেলেও সব ঘটনার ব্যাখ্যা এগুলিতে পাওয়া যাচ্ছিল না। এই সব অব্যাখ্যাত ঘটনার বেশ কিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া গেল হাইজেনবার্গের নতুন তত্ত্বে।

1923 সাল থেকে 1925 সাল অবধি আলোকের পারমাণবিক শোষণ, স্টার্কের বর্ণালি বিভাজন ক্রিয়া প্রভৃতি কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হাইজেনবার্গ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, বোরের প্রস্তাবিত পরমাণু-মডেলে ইলেকট্রনগুলির তথাকথিত বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার কক্ষপথগুলি কখনোই নিরীক্ষণযোগ্য নয়। এ থেকে তাঁর ধারণা হল পদার্থবিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বে শুধু নিরীক্ষণযোগ্য তথ্যই থাকা উচিত। এই ধারণাকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাই হল তাঁর গবেষণার বিষয়।

1925 সালে হে-ফিভারে আক্রান্ত হলেন হাইজেনবার্গ। জুন মাসে গোটিংগেন ছেড়ে গেলেন উত্তর সাগরের ছোট্ট দ্বীপ হেলিগোল্যান্ডে আরোগ্য লাভের আশায়। এখানেই কোয়ান্টাম-বলবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ধারণা ক্রমশই দানা বাঁধতে থাকে। তিনি নিজে বলেছেন, "আমি উপলব্ধি করেছিলাম কালের (Time) পরিপ্রেক্ষিতে শক্তি [Energy] অপরিবর্তনীয়। তখন গভীর রাত্রি, আমি কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলির গাণিতিক রূপ দিতে কঠিন পরিশ্রম করেছিলাম এবং অভীষ্ট লাভে সমর্থ হয়েছিলাম। তারপর সূর্যোদয় দেখবার জন্য আমি পর্বত চূড়ায় আরোহণ করেছিলাম এবং আমার সমস্ত মন এক গভীর আনন্দে ভরে গিয়েছিলো।" এরপর কয়েক সপ্তাহ ধরে হাইজেনবার্গ কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে সৃতিবিদ্যা [Kinematics] ও বলবিদ্যার সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর নতুন ব্যাখ্যার সুনির্দিষ্ট রূপ দেন।

পরমাণু মডেল সংক্রান্ত এই বিপ্লবী তত্ত্বের রূপ দিতে গিয়ে তিনি তিনটি জিনিসের সাহায্য নিলেন। এই তিনটি জিনিস হল ঃ বর্ণালির বিভিন্ন রেখার কম্পাঙ্ক [Frequency], তীব্রতা [Intensity] এবং সমবর্তিতা [Polarization]। এই তিনটি গুণের মধ্যে একটা সম্পর্ক নির্ণয় করার জন্য তিনি সাহায্য নিলেন ম্যাট্রিক্সের [Matrix]। তার ফলে তিনি এক জটিল পরমাণু গঠনের হদিশ দিলেন। তাঁর এই জটিল মডেল, পরমাণুর মধ্যে বাস্তবিক কী ঘটছে তার ব্যাখ্যা না দিয়ে অতীত পর্যবেক্ষণের নিরিখে ভবিষ্যৎ নিরীক্ষণ কী হবে তার বিশদ বিবরণ দিতে পারে। তাঁর এই জটিল মডেলের আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়।

সনাতন বলবিদ্যা [Classical Mechanics] প্রায় 250 বছর ধরে বলেছে কোনো বস্তুর অবস্থান এবং ভরবেগ [Momentum] একসঙ্গে সঠিকভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিতে পরিমাপ করা সম্ভব। এর ফলে কোনো গতিশীল বস্তুর ভবিষ্যৎ অবস্থান আগেভাগেই বলে দেওয়া যায়। সনাতন বলবিদ্যা তাই নিয়ন্ত্রণবাদ তত্ত্বের [Deterministic Theory] এক বিশিষ্ট উদাহরণ। হাইজেনবার্গ তাঁর নতুন তত্ত্বে সবকিছুই উল্টে দিলেন। বদলে দিলেন 250 বছরের পুরাতন ধ্যান-ধারণা। 1927 সালে হাইজেনবার্গ তাঁর সেই অতি বিখ্যাত 'অনিশ্চয়তা নীতি' [Uncertainty Principle] প্রকাশ করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কোনো কণিকার ভরবেগ [Momentum) ও অবস্থান [Position] একসঙ্গে নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। ভরবেগ নির্ণয় করলে সেই মুহূর্তে ওই কণাটির সঠিক অবস্থান বলা যেমন অসম্ভব, তেমনি কণাটির অবস্থান সম্বন্ধে কোনো মুহূর্তে সঠিক জানা গেলেও সেই মুহূর্তে তার সঠিক ভরবেগ নির্ণয় করা অসম্ভব। সরল করে বলতে গেলে বলা যায়, পারমাণবিক স্তরের ঘটনাগুলির সঠিক কারণ নির্দেশ করা মুশকিল। ঘটনার সম্ভাব্যতার নির্দেশ করা সম্ভব। অর্থাৎ ভরবেগ জানা হলে একই সঙ্গে সঠিক অবস্থান জানা যাবে না। আবার কণাটির অবস্থান যদি ঠিক ঠিক পাওয়া যায় তবে ভরবেগ নির্ণয় করা অসম্ভব হবে ওই অবস্থায়। এই অনিশ্চয়তা নীতি ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ওই অবধি চলে আসা ধ্যানধারণা একেবারে গুঁড়িয়ে দিল। কণার জগতে এল বিপ্লব। পদার্থবিদ্যা নতুন রূপ পেল। পদার্থবিদ্যার পরিচিত জগৎ—নিয়মের সেই জগৎ—যেন একেবারে হারিয়ে গিয়ে সবকিছুতেই সম্ভাব্যতা [Probability] এসে হাজির হল। পরবর্তীকালে দেখা গেল জগৎ জুড়ে কেবল সম্ভাব্যতার তরঙ্গ [Waves of Probability] বিরাজমান। কার্যকারণ সম্পর্ক উধাও। সুতরাং বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির চরম সত্তা [Ultimate Reality] জানা অসম্ভব বলে প্রমাণিত হল। এটা করে দেখালেন ওয়ার্নার কার্ল হাইজেনবার্গ।

অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে, কোনো কণার x- স্থানাঙ্ক [x-Co-ordinate] যদি সঠিকভাবে Δx পর্যন্ত মাপা যায় তবে কণার ভরবেগের x- অংশ [x-Component] একই সঙ্গে সঠিকভাবে Δpx পর্যন্ত করা সম্ভব। অঙ্ক কষে সমীকরণটা এই রকম আসে ঃ

$$(\Delta x) . (\Delta px) \approx h$$

এখানে Δx হল x- স্থানাংকের সম্ভাব্যতা যেটা সঠিকভাবে ভরবেগ মাপার সময় মাপা যেতে পারে এবং Δpx হল ভরবেগের সম্ভাব্যতা যখন x- স্থানাঙ্ক সঠিকভাবে নির্ণয় করা

যায়। h হল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক [Planck's Constant], যার মান 6.63×10^{-34} জুল-সেকেন্ড। এই সূত্র থেকে এটা প্রতীয়মান যে, x এবং px এক সঙ্গে সঠিকভাবে মাপা অসম্ভব। এখানে একটাকে যত সঠিকভাবে মাপা সম্ভব হবে একই সঙ্গে অন্যটার পরিমাপ ততটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে কণিকাটির কোথায় অবস্থিতি ও তার বেগের পরিমাপ সঠিকভাবে নির্ণয় করা একেবারেই অসম্ভব। পরিমাপ করা যেতে পারে শুধুমাত্র অবস্থিতির স্থানের ও বেগের মানের সম্ভাব্যতা। কণিকাটির কোথায় অবস্থিতি সেটি যত বেশি সঠিকভাবে নির্ণয় করা যাবে, তার বেগের পরিমাপও তত অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। কণিকা জগতে অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতারই উপর বেশি নির্ভর করতে হবে, কারণ কোনো যন্ত্র দিয়ে কোনোদিন কোনো একটি ইলেকট্রনের মতো ক্ষুদ্র কণিকাকে গোচরীভূত করা যাবে না। বিজ্ঞানে যুগান্তর এনেছে এই অনিশ্চয়তা নীতি।

1953 সালে হাইজেনবার্গ একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব (Unified Field theory] নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনিও চেয়েছিলেন এমন একটি সূত্র বা তত্ত্ব আবিষ্কার করতে যা পদার্থবিজ্ঞানের সব সূত্রকে একসঙ্গে গেঁথে ফেলবে। জীবনের শেষ 22/23 বছর এই গবেষণাতেই তিনি নিমগ্ন থাকেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, আইনস্টাইনও তাঁর জীবনের শেষ 30 বছর ধরে একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রের একীকরণ ছিল কার্য-কারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে। আর হাইজেনবার্গ চেয়েছিলেন আপেক্ষিকতা, সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা সবই একীভূত করতে। আইনস্টাইন কিন্তু অনিশ্চয়তায় মোটেই বিশ্বাসী ছিলেন না সারাটা জীবন। কার্য-কারণ সম্পর্ককে তিনি কখনোই বিদায় করতে চান নি বিজ্ঞান-জগৎ থেকে।

হাইজেনবার্গ জার্মানি ও তার সংস্কৃতিকে খুবই ভালোবাসতেন। দেশের চরম দুর্দিনেও তিনি জার্মানি ছাড়েন নি। জার্মানির পরাজয়ের পর বহু দুঃখকষ্টের মধ্যে তিনি দিন কাটিয়েছেন, কিন্তু জার্মানি ছেড়ে পালান নি। যুদ্ধের শেষে তিনি কিছুদিন বন্দিজীবনও কাটান; তবু জার্মানিকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসবাসের চিন্তাও তিনি কখনো করেন নি।

তিনি দুটো বই লিখেছেন। একটি হল 'Physics and Philosophy'। এটি প্রকাশিত হয় 1962 সালে। অন্য গ্রন্থটি হল আত্মজীবনীমূলক। নাম 'Physics and Beyond'। এটি প্রকাশিত হয় 1971 খ্রিস্টাব্দে। আগেই বলেছি, 1976 সালের 1লা ফেব্রুয়ারি তিনি দেহত্যাগ করেন। জীবনের শেষদিন অবধি তিনি কর্মক্ষম ছিলেন। 1929 সালে ভারত সফরে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগে তিনি একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যন্ত্রসংগীতেও তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি নিজেও যন্ত্রসংগীতে পারদর্শী ছিলেন। আগেই বলেছি, তিনি খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতেন।

1957 সাল থেকে হাইজেনবার্গ প্লাজমা পদার্থবিজ্ঞান এবং তাপকেন্দ্রকীয় বিক্রিয়া [Thermonuclear Reaction] নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যাটমিক ফিজিক্স' সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় জেনিভাতে। এই সংস্থার সায়েন্টিফিক পলিসি

কমিটির চেয়ারম্যান হয়ে বেশ কয়েক বছর কাজ করেন হাইজেনবার্গ। পরে তিনি এই কমিটির সদস্য হয়েছিলেন।

1953 সালে তিনি আলেকজান্ডার ফন হামবোল্ট ফাউন্ডেশনের [Alexander von Humboldt Foundation] সভাপতি নির্বাচিত হন। এই ফাউন্ডেশনের জন্য তিনি বহু কাজ করেন। বিদেশী বিজ্ঞানীদের জার্মানীতে আমন্ত্রণ করে এনে তাঁদের গবেষণার কাজে সাহায্য করতেন নানাভাবে এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে। 1953 সাল থেকে তিনি মৌলিক কণাসমূহের একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব নিয়ে গভীরভাবে গবেষণাও করতে থাকেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই গবেষণার ফলে মৌলিক কণাসমূহের পদার্থবিজ্ঞান সহজবোধ্য হবে। কণা জগতের কার্য-কারণ-হীনতার সঠিক ব্যাখ্যা করতে তিনি ওদের একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন। ঠিক এরকম একটা নিয়মের মধ্যে মৌলিক বলগুলিকে একীভূত করতে চেয়েছিলেন মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের মাধ্যমে। আইনস্টাইন মারা যান 1955 সালে। তার কিছুটা আগেই হাইজেনবার্গ তাঁর গবেষণা শুরু করেন মৌলিক কণাগুলিকে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের নিয়মে নিয়ে আসতে। হাইজেনবার্গও পারেন নি। 1979 সালে আবদুস সালামরা আইনস্টাইনের একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বকে একধাপ এগিয়ে দিয়েছেন তাঁদের ইলেকট্রোউইক তত্ত্ব [Electro Weak Theory] দিয়ে। এঁরা তাঁদের ইলেকট্রোউইক তত্ত্ব দিয়ে প্রমাণ করলেন, তড়িচ্চুম্বকীয় বল ও দুর্বল মিথস্ক্রিয়া এক ও অভিন্ন। আইনস্টাইন যখন মারা যান সেই 1955 সালে মৌলিক বল ছিল চারটি। 1979 সালে এসে মৌলিক বলসংখ্যা দাঁড়ালো তিনটিতে। অর্থাৎ একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব একধাপ এগিয়ে গেল। যে তিন বিজ্ঞানী এই ইলেকট্রোউইক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন তাঁরা হলেন—আবদুস সালাম, স্টিভেন ভিনবার্গ ও শেলডন গ্লাসো। এঁার তিনজনে 1979 সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পান তাঁদের ওই তত্ত্বের জন্য। 1983 সালে পরীক্ষাগারে ইলেকট্রোউইক ভত্ত্ব প্রমাণিত হয়। প্রমাণ করেন কার্লো রুবিবিয়া ও সাইমন ভ্যানডার মির। এঁরাও 1984 সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পান। ফলে, মৌল বল রইল তিনটি — মহাকর্ষবল, সবল বল এবং তড়িচ্চুম্বকীয় ও দুর্বল বলের মিলিতরূপ ইলেকট্রোউইক বল।

হাইজেনবার্গ সারা জীবনে বহু পদক এবং পুরস্কার পেয়েছেন। তাদের কয়েকটির কথা আগেই বলা হয়েছে। হাইজেনবার্গকে সাম্মানিক ডক্টরেট দিয়েছে ব্রাসেলস বিশ্ববিদ্যালয়, কার্লশ্রুহের টেকনোলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি পেয়েচেন ব্যাভেরিয়ার 'অর্ডার অফ মেরিট', জার্মানীর ফেডারেল সার্ভিসের 'গ্র্যান্ড ক্রুশ'। তিনি ছিলেন ফেলো অ ফরয়েল সোসাইটি, পেয়েছিলেন 'নাইট' [Knight] উপাধিও। গটিংগেন, ব্যাভেরিয়া, স্যাকসনী, প্রুসিয়া, সুইডেন, রুমানিয়া, নরওয়ে, স্পেন, নেদারল্যান্ড, রোম, জার্মানী, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সের তিনি ছিলেন সম্মানীয় সদস্য। 1949-1951 সালে তিনি ছিলেন জার্মান রিসার্চ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট। আগেই বলেছি, 1953 সালে তিনি আলেকজাণ্ডার ফন হামবোল্ট ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

আগেই বলেছি, হাইজেনবার্গ বিয়ে করেছিলেন এলিজাবেথ স্কুম্যাচারকে 1937 সালের



যৌবনে হাইজেনবার্গ [1901-1976]



ভার্নার হাইজেনবার্গ [1901-1976]

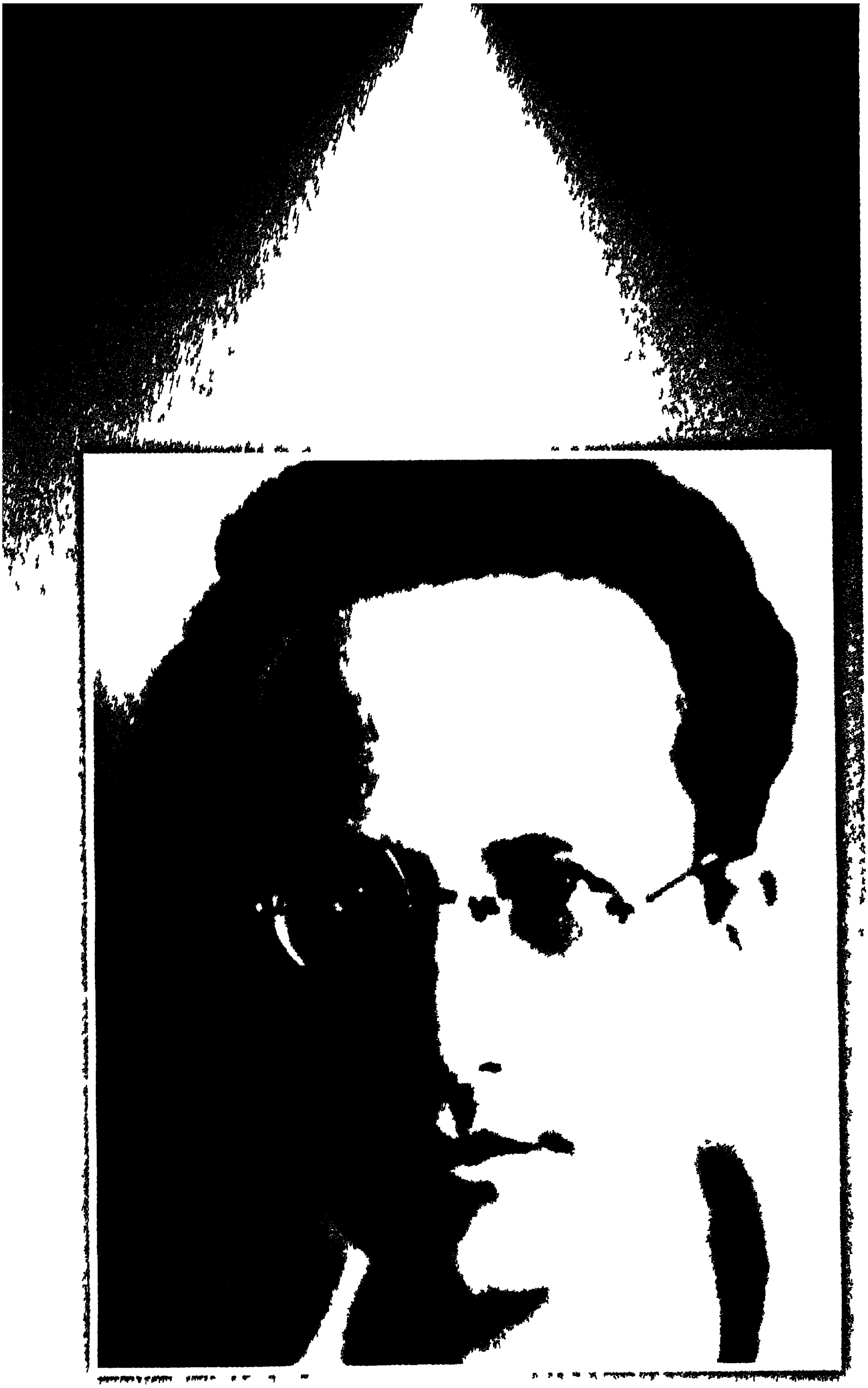
29 শে এপ্রিল। তাঁদের সাতটি ছেলেমেয়ে। তাঁদের নিয়েই এই সুখী দম্পতি শেষ জীবন মিউনিখেই কাটান। হাইজেনবার্গ 74 বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন জার্মানীর মিউনিখেই। তাঁর মৃত্যুদিন 1 লা ফেব্রুয়ারী 1976 খ্রিস্টাব্দে।

হাইজেনবার্গের কথা শেষ করার আগে ফিরে আসি তাঁর অনিশ্চয়তা নীতির [Uncertainty Principle] কথায়। বিজ্ঞানের নতুন পথ করে দেওয়ার পিছনে এই নীতির মূল্য অপরিসীম। আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের জনক হলেন হাইজেনবার্গ একথা আগেই বলেছি। অতি বিখ্যাত এই অনিশ্চয়তা নীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হয় ঃ

"The determination of the position and momentum of a mobile particle necessarily contains errors, the product of which cannot be less than the quantum constant h and that, although these errors are negligible on the human scale, they cannot be ignored in studies of the atom," এই কথাগুলি একটা সূত্র দিয়ে বললে দাঁড়ায় ঃ $\Delta x \, . \, \Delta p \approx h$, যেখানে, Δx অবস্থানের অনিশ্চয়তা এবং 4p বল ভরবেগের অনিশ্চয়তা।

আবারো বলি, বিশ্ববিখ্যাত জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী ওয়ার্নার কার্ল হাইজেনবার্গ 1932 খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের অন্যতম স্রষ্টা এই বিজ্ঞানীর যুগান্তকারী আবিষ্কার হল 'অনিশ্চয়তা-নীতি' [Uncertainty Principle]। 1923 সাল অবধি আলোকের পারমাণবিক শোষণ, স্টার্কের বর্ণালি বিভাজন ক্রিয়া ইত্যাদি কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হাইজেনবার্গ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কোনো কণার ভরবেগ [Momentum] ও অবস্থান [Position] একসঙ্গে নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। কোনো মুহূর্তে সঠিকভাবে ভরবেগ নির্ণয় করলে, সেই সময় ওই কণাটির সঠিক অবস্থান বলা যেমন অসম্ভব, তেমনি কণাটির অবস্থান সম্বন্ধে কোনো মুহূর্তে সঠিক জানা গেলেও, সেই মুহূর্তে তার সঠিক ভরবেগ নির্ণয় করা অসম্ভব। সনাতন বলবিদ্যা [Classical Mechanics] প্রায় 250 বছর ধরে বলেছে, কোনো বস্তুর অবস্থান এবং ভরবেগ একসঙ্গে সঠিকভাবে কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ণয় করা সম্ভব। এর ফলে কোনো গতিশীল বস্তুর ভবিষ্যৎ অবস্থান আগেভাগেই বলে দেওযা যায় বলে সনাতন বলবিদ্যা বিশ্বাস করতো। সনাতন বলবিদ্যা ছিল তাই নিয়ন্ত্রণবাদ তত্ত্বের [Deterministic Theory] এক বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। হাইজেনবার্গ তাঁর নতুন তত্ত্বে সবকিছুই উল্টে দিয়েছেন। বদলে দিয়েছেন 250 বছরের পুরাতন ধ্যান-ধারণা। অনিশ্চয়তা নীতি বদলে দিয়েছে পদার্থ-বিজ্ঞানের পরিচিত নিয়মের জগৎ। সব কিছুতে এসে হাজির হয়েছে সম্ভাব্যতা [Probability]। বিজ্ঞানের মতে, সারাবিশ্ব এখন 'সম্ভাব্যতার তরঙ্গ' [Waves of Probability]। কার্যকারণ সম্পর্ক উধাও। জগৎ তরঙ্গময়। যেখানে তরঙ্গ ঘনত্ব বেশি সেখানে পদার্থ এবং যেখানে তরঙ্গ ঘনত্ব কম সেখানে শক্তি। কণা-জগতে কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই বলে প্রমাণিত হওয়ায়, বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির চরম-সত্তা [Ultimate Realty] জানা অসম্ভব বলে প্রমাণিত হল। যে নিয়ন্ত্রণবাদের পতাকা একদিন নিউটন প্রমুখেরা উড়িয়েছিলেন, বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে সেই নিয়ন্ত্রণবাদ বিদায় নিয়েছে। অন্ততঃ

কণিকার জগৎ থেকে নিয়ন্ত্রণবাদ সম্পূর্ণ বিদায় নিয়েছে। পরিদৃশ্যমান জগতেও যেটুকু নিয়ন্ত্রণবাদ আছে বলে মনে হচ্ছে তাও আপাত-নিয়ন্ত্রণবাদ, প্রকৃত নয়। হাইজেনবার্গ বলেছেন, "Nature abhors accuracy and precision above all things." অর্থাৎ সব ব্যাপারে একেবারে নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে চলা প্রকৃতির ধর্ম বিরুদ্ধ। প্রকৃতি তার কোনো ঘটনায় ভুলশূন্যতা কিংবা যথার্থতা মেনে নিতে একদম রাজি নয়। সারা জীবন কার্য-কারণ সম্পর্কে বিশ্বাসী আইনস্টাইনও বলতে বাধ্য হয়েছেন, "Science did not succeed in carrying out the mechanical programme convincingly and to-day no physicist believes in the possibility of its fulfilment" [The Evolution of Physics]। অর্থাৎ বিজ্ঞান তার যান্ত্রিক পরিকল্পনা তথা কার্যক্রমকে সাফল্যের সঙ্গে তার শেষ পরিণতির দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি এবং এখন কোনো পদার্থবিজ্ঞানীই বিশ্বাস করে না যে তা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে ওই সম্ভাব্যতা-অনিশ্চয়তা দূর হয়ে কোনদিন আবার জগতের সেই সনাতন যান্ত্রিক রূপ ফিরে আসবে এমন আশা করা বাতুলতা মাত্র। সুতরাং একেবারে আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, জগৎ নিয়ন্ত্রণবাদ মানে না। বিশ্ব তরঙ্গময় এবং সে তরঙ্গও সম্ভাব্যতার তরঙ্গ। প্রকৃতিতে কোনো কিছুই নির্ভুল, নিখুঁত নয়। তার কণা-জগৎ কোনো নিয়ম মেনে চলে না। সেখানে সবই অনিশ্চিত, সবই অনিয়ম, সবই বিশৃঙ্খল এবং নিয়ন্ত্রণবাদ সেখানে একেবারেই অনুপস্থিত। ●



যৌবনে শ্রোয়েডিঙার [1887-1961]



'তরঙ্গ সমীকরণ' আবিষ্কারের সময় শ্রোয়েডিঙ্গার [1887-1961]

রউইন শ্রোয়েডিঙ্গার

[1887–1961]

1924 খ্রিস্টাব্দে লুই দ্য ব্রগলি [Louis de Broglie] কণাবাদভিত্তিক [Quantum Theory] একটি গাণিতিক সূত্র বের করলেন, যার সাহায্যে কোনো চলন্ত বস্তুর ভর ও বেগ জানা থাকলে তার বস্তু-তরঙ্গ [Matter Wave] কেমন তা জানা যাবে। বের করা যাবে সে তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। অর্থাৎ যে কোনো বস্তু তা সে ইট, কাঠ, পাথর, গ্রহ, ধূলিকণা, প্রোটন কিংবা ইলেকট্রন যাই হোক না কেন, চলন্ত অবস্থায় বস্তুটি হবে কতকগুলি তরঙ্গের সমষ্টি। বস্তুর তরঙ্গ রূপের অস্তিত্ব সংক্রান্ত ওই নিবন্ধ বিজ্ঞান জগতে প্রবল আলোড়ন তুলল। এরই কিছুদিন পরে আরউইন শ্রোয়েডিঙ্গার [Erwin Schroedinger] অনুরূপ একটি গাণিতিক তত্ত্ব প্রকাশ করলেন, যা পদার্থবিজ্ঞানে 'তরঙ্গ বলবিদ্যা' [Wave Mechanics] নামে বিখ্যাত। এতে এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন, যা দিয়ে প্রোটনে ইলেকট্রনে তরঙ্গরূপ আরোপ করে কণাঘটিত ব্যাপারের উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শ্রোয়েডিঙ্গার তাঁর ওই তরঙ্গবলবিদ্যা সংক্রান্ত নিবন্ধ প্রকাশ করেন 1926 সালে। তাঁর আবিষ্কৃত তরঙ্গ-সমীকরণগুলি [Wave Equations] পদার্থবিজ্ঞানের সমস্ত সনাতন নিয়মাবলী বাতিল করে দেয়।

তরঙ্গ-বলবিদ্যার এই নতুন তত্ত্ব 1930 সালের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। ছোট-খাটো সংশোধনও করে নেওয়া হয় ইতিমধ্যে। এর সাহায্যে তরঙ্গ ও কণিকার সম্পর্ক এবং বস্তুর দ্বৈতধর্ম ব্যাখ্যা সম্ভব হয়। পল ডিরাক [Paul Dirac] 1928 সালে তাঁর আপেক্ষিক তরঙ্গ-সমীকরণ [Relativistic Wave Equation] প্রকাশ করেন যার সাহায্যে ইকেলট্রনের 'স্পিন' [Spin] বা স্বকীয় কৌণিক ভরবেগ [Intrinsic Angular Momentum] ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় এবং এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়। পরমাণুর গঠন সম্পর্কে নিয়মাবলী নতুন করে তৈরি হয় এবং পরমাণু ও বিকীর্ণ শক্তির মধ্যে মিথস্ক্রিয়া [Interaction] সূত্রায়িত হয়। এ সবকিছুরই মূল উৎস হল তরঙ্গ-বলবিদ্যা। শ্রোয়েডিঙ্গারের এই আবিষ্কার কণাজগতের খুঁটিনাটি হিসাবের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক, কারণ এর বৈশিষ্ট্যই হল কোনো একটি যান্ত্রিক প্রণালীকে এর সাহায্যে একটি 'তরঙ্গ অপেক্ষক' বা 'ওয়েভ ফাংশন' [Wave Function] দিয়ে প্রকাশ করা যায়, যেটা হাইজেনবার্গ-ডিরাকের 'কণাতম বলবিদ্যা' বা 'কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান' [Quantum Mechanics] সংক্রান্ত সমীকরণে বা নিয়মাবলীতে করা যায় না, যদিও এঁদের দেওয়া কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের রূপটি অধিকতর সংক্ষিপ্ত, বাহুল্যবর্জিত এবং শক্তিসম্পন্ন।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনাকালীন শ্রোয়েডিঙ্গারের মুখ্য বিষয় ছিল অঙ্ক ও

পদার্থবিদ্যা। তিনি বিভিন্ন জায়গায় অধ্যাপনার পর 1927 সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের [Max Planck] স্থলাভিষিক্ত হন। বার্লিনে তিনি আইনস্টাইন, প্ল্যাঙ্ক এবং ম্যাক্স ফন লাউ [Max von Laue] প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীদের সাহচর্যে আসেন। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে জার্মানী তখন সবার সেরা। তাঁর গবেষণা চলে এগিয়ে। 1933 খ্রিস্টাব্দে পল ডিরাকের সঙ্গে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে তরঙ্গ-বলবিদ্যা আবিষ্কারের জন্য। পারমাণবিক গুণাবলীর যেগুলি তখনও অব্যাখ্যাত ছিল সেগুলির ব্যাখ্যা সম্ভব হয়, 1926 সালে তাঁর আবিষ্কৃত তরঙ্গ-বলবিদ্যার সাহায্যে।

আরউইন শ্রোয়েডিঙ্গার 1887 খিস্টাব্দের 12ই আগস্ট ভিয়েনাতে জন্মগ্রহণ করেন। তখনকার অস্ট্রিয়া দেশের রাজধানী ছিল ভিয়েনা। এরই এর্ডবার্গ-এ [Erdberg] জন্মেছিলেন শ্রোয়েডিঙ্গার। তাঁর পুরো নাম আরউইন রুডলফ যোসেফ আলেকজান্ডার শ্রোয়েডিঙ্গার [Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger]। তাঁর বাবা রুডলফ শ্রোয়েডিঙ্গার। তিনি পৈত্রিকসূত্রে পেয়েছিলেন একটা ছোট্ট কানভাস জাতীয় মোটা কাপড় তৈরির কারখানা। তাঁর মা এমিলি বাউয়ার [Emily Bauer] ছিলেন আধা-ইংরেজ এবং আধা-অস্ট্রীয়। রুডলফের সংসার চলতো ওই কারখানার আয়ে। তাঁদের পরিবারে ইংরেজী এবং জার্মান এই দুই ভাষাতেই কথাবার্তা হত। ফলে, শ্রোয়েডিঙ্গার ছোটবেলাতেই ইংরেজী এবং জার্মান এই দুটি ভাষাই শিখে ফেলেন সহজেই। এমিলির বাবা ভিয়েনার টেকনিক্যাল কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর নাম আলেকজান্ডার বাউয়ার [Alexander Bauer]। এঁরই ছাত্র ছিলেন রুডলফ। শ্রোয়েডিঙ্গারের পরিবার হল ব্যাভেরীয় পরিবার। এঁরা কয়েক পুরুষ ধরেই ভিয়েনাতে বসবাস করছিলেন। রুডলফ রসায়ন নিয়ে পড়াশুনা করেন। লেখাপড়ায় তিনিও খুবই ভালো ছিলেন। তাঁর অধ্যাপক আলেকজান্ডার তাই তাঁর মেয়ে এমিলির সঙ্গে ভালো ছাত্র রুডলফের বিয়ে দেন। ইতালীয় চিত্রকলায় প্রবল আকর্ষণ ছিল রুডলফের। তিনি খুব ভালো আঁকতে পারতেন। পরে তিনি উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করেন। বেশ কয়েকটি গবেষণাপত্রও প্রকাশ করেন উদ্ভিদের গোত্র-বিভাগের উপর। এই রকম একটা শিক্ষিত পরিবারে জন্মেছিলেন আরউইন শ্রোয়েডিঙ্গার 12ই আগস্ট, 1887 খ্রিস্টাব্দ।

বাড়ীতে ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় কথাবার্তা হত। ফলে, শ্রোয়েডিঙ্গার ছেলেবেলাতেই এই দুটি ভাষাতেই কথা বলার দক্ষতা অর্জন করেন। দশ বছর বয়স অবধি তিনি বাড়ীতেই লেখাপড়া করেন। এক গৃহশিক্ষক তাঁকে পড়াতেন। 1898 সালে তাঁকে অ্যাকাডেমিসেস জিমনাসিয়ামে [Akademisches Gymnasium] ভর্তি করা হয়। স্কুলে যাওয়ার আগে তিনি বেশ কিছুদিন ইংল্যান্ডে কাটান। জিমনাসিয়ামে পড়ার সময় তাঁর অনুভূতি সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন ঃ

"I was a good student in all subjects, loved mathematics and physics, but also the strict logic of the ancient grammars, hated only memorising incidental dates and facts. Of the German poets, I loved especially the dramatists, but hated the pedantic dissection of their works

শ্রোয়েডিঙ্গারের এক সহপাঠী পরবর্তীকালে তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ

"Especially in physics and mathematics, Schrödinger had a gift for understanding that allowed him, without any homework, immediately and directly to comprehend all the material during the class hours and to apply it. After the lecture ... it was possible for [our professor] to call Schrödinger immediately to the blackboard and to set him problems, which he solved with playful facility."

শ্রোয়েডিঙ্গার 1906 সালে ওই জিমনাসিয়াম থেকে স্নাতক হন এবং ওই বছরই ভর্তি হন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি স্নাতকোত্তর ক্লাশে পড়াশুনা করেন তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে। তাঁর বিষয়গুলি ছিল ঃ Analytical Mechanics, Applications of partial differential equations to dynamics, Eigenvalue problems, Maxwell's equantios and Electromagnetic theory, Optics, Thermodynamics এবং Statistical mechanics। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগতো Fritz Hasenöhrl-এর বক্তৃতা। ফ্রাঞ্জ মার্টেনস [Franz Mertens] তাঁকে পড়াতেন Calculus এবং Algebra। ভিলহেলম ভিরটিনজার [Wilhelm Wirtinger] পড়াতেন Function Theory, Differential Equations এবং Mathematical Statistics। তবে এঁর পড়ানো তাঁর ভালো লাগতো না। এছাড়া তিনি পড়তেন Projective Geometry, Algebraic Curves এবং Continuous Groups। এগুলির অধ্যাপক ছিলেন Gustav Kohn।

1910 সালে শ্রোয়েডিঙ্গার ডক্টরেট উপাধি পেলেন। তাঁর গবেষণাপত্র ছিল 'On the conduction of electricity on the surface of insulators in moist air'। এরপর তিনি স্বেচ্ছায় সামরিক বিভাগে যোগ দেন। এখানে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের বদলে তাঁকে ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞানের 'Assistantship' দেওয়া হয়। এতে অবশ্য তাঁর লাভই হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন যে, ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞানের এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তাঁর তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের পরিকাঠামোকে অনেকটাই সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন। এরপর তিনি অধ্যাপনার উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জনের [Habilitation] গবেষণাপত্র জমা দেন। 1914 সালের 1 লা সেপ্টেম্বর তাঁকে এ বিষয়ে ডিগ্রী দেওয়া হয়। তবে এই সম্পর্কে তাঁর কাজটি তেমন উন্নতমানের ছিল না। কিন্তু 1914 সালেই তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বোল্‌ৎজমান [Boltzmann] তত্ত্বের আরও উন্নতি ঘটান।

1914 সালেই বেধে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। শ্রোয়েডিঙ্গারকে যুদ্ধে পাঠানো হয় ইতালী সীমান্তে। যুদ্ধে থাকাকালীন তাঁর তত্ত্বীয় গবেষণাও চলতে থাকে। এই বছরই তিনি আরেকটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করার জন্য জমা দেন। 1915 সালে তাঁকে বদলি করা হয় হাঙ্গেরীতে। এখানে থাকাকালীন তিনি আরো একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এরপর তাঁকে যুদ্ধের প্রয়োজনে আবারো ফিরিয়ে আনা হয় ইতালী সীমান্তে। এই সময় তাঁকে সম্মানিত করা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য।

1917 সালের বসন্তকালে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয় ভিয়েনায়। এখানে তাঁকে আবহবিদ্যা

পড়ানোর কাজ দেওয়া হয়। কাজের সঙ্গে তাঁর গবেষণাও চলতে থাকে সমান তালে। এই সময় কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। যুদ্ধের শেষে তিনি ভিয়েনাতেই কাজ করতে থাকেন। 1918 থেকে 1920 সালের মধ্যে তিনি 'বর্ণবোধ তত্ত্ব' [Theory of Colour Vision] নিয়ে গভীর গবেষণা করেন। শ্রোয়েডিঙ্গার ভিয়েনায় এই সময় তেজস্ক্রিয়তা নিয়েও গবেষণা করেন এবং তেজস্ক্রিয়তার পরিসাংখ্যিক প্রকৃতি [Statistical Nature] প্রমাণ করেন। 1921 সালের শেষের দিকে তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

1920 সালে শ্রোয়েডিঙ্গার বিয়ে করেন অ্যান্নেমারি বার্টেলকে [Annemarie Bertel]। এঁর ডাকনাম ছিল 'অ্যান্নি' [Anny]। ওই বছরই তিনি তাঁর শিক্ষক জীবনের শুরু করেন ম্যাক্স ভিনের [Max Wien] সহকারী হিসাবে। কিছুদিন পরে তিনি স্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Extra-ordinary' অধ্যাপক হন। তারপর কিছুদিন তিনি 'Ordinary' অধ্যাপক হিসাবেও কাজ করেন 'ব্রেসলাউ'-তে [Breslau]। তারপর তিনি জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের ওই পদটি পান। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকের ওই পদে তিনি যোগ দেন 1921 সালের শেষের দিকে।

জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন অধ্যাপক ইয়েল [Weyl]। ইয়েল তাঁর অঙ্কশাস্ত্রের গভীর জ্ঞান দিয়ে শ্রোয়েডিঙ্গারকে নানাভাবে সাহায্য করেন। শ্রোয়েডিঙ্গারের জুরিখ খুব ভালো লেগে গেল। 1921 সালে তিনি শুরু করলেন পারমাণবিক গঠন নিয়ে গবেষণা। এর কিছুটা পরে 1924 সালে শুরু হল কোয়ান্টাম সংখ্যায়ন নিয়ে তাঁর বিখ্যাত গবেষণা। এই সালেই প্রকাশিত হল 'বোস-আইনস্টাইন' সংখ্যায়ন, দ্য ব্রগলির 'বস্তু-তরঙ্গ তত্ত্ব'। ব্রগলির এই তত্ত্ব তাঁকে খুবই প্রভাবিত করে। 1925 সালের 3রা নভেম্বর শ্রোয়েডিঙ্গার আইনস্টাইনকে লিখেছিলেন ঃ 'A few days ago I read with great interest the ingenious thesis of Louis de Broglie, which I finally got hold of...'. কয়েকদিন পরে শ্রোয়েডিঙ্গার 16 ই নভেম্বর লিখেছিলেন ঃ

"I have been intensely concerned these days with Louis de Broglie's ingenious theory. It is extra-ordinarily exciting, but still has some very grave difficulties."

এক সপ্তাহ পরে শ্রোয়েডিঙ্গার ব্রগলির কাজের উপর একটি আলোচনা সভার ব্যবস্থা করেন। এতে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখেন। এই সভায় সোমারফেল্ডের এক ছাত্র প্রস্তাব রাখেন যে, এ ব্যাপারে কিছু 'তরঙ্গ সমীকরণ' [Wave Equation] হওয়া উচিত। এরই কয়েক সপ্তাহ পরে শ্রোয়েডিঙ্গার বের করলেন তাঁর বিখ্যাত 'তরঙ্গ সমীকরণ'।

1926 সালে তিনি ছয়টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন 'তরঙ্গ বলবিজ্ঞান' [Wave Mechanics] এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে। এই বৈপ্লবিক সমীকরণগুলি ছিল কোয়ান্টাম তত্ত্বের দ্বিতীয় সূত্রবদ্ধ রূপ। কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রথম সূত্রবদ্ধ রূপ প্রকাশ করেন হাইজেনবার্গ 1925 সালে তাঁর ম্যাট্রিক্স বলবিজ্ঞানের [Matrix Mechanics] মাধ্যমে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের এই দুই রূপ অর্থাৎ তরঙ্গ বলবিজ্ঞান ও ম্যাট্রিক্স বলবিজ্ঞান, এদের

মধ্যে সম্পর্কটা তিনি খুব ভালো করেই বুঝেছিলেন। তাই ওই ছ'টি গবেষণার পত্রের একটিতে তিনি লিখেছিলেন ঃ

"To each function of the position-and momentum-coordinates in wave mechanics there may be related a matrix in such a way that these matrices, in every case satisfy the formal calculation rules of Born and Heisenberg. ... The solution of the natural boundary value problem of this differential equation in wave mechanics is completely equivalent to the solution of Heisenberg's algebraic problem."

শ্রোয়েডিঙ্গারের এই আবিষ্কারকে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বলেছিলেন 'epoch-making work'। আইনস্টাইন লিখেছিলেন 'the idea of your work springs from true genius...'। দিন দশেক পরে আইনস্টাইন আবারো লিখলেন "I am convinced that you have made a decisive advance with your formulation of the quantum condition . ।আইনস্টাইন আরো লিখেছেন ঃ

"I am simply fascinated by your [wave equation] theory and the wonderful new viewpoint it brings. Every day for the past two weeks our little goup has been standing for hours at a time in front of the blackboard in order to train itself in all the splendid ramifications "

শ্রোয়েডিঙ্গার উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 1927 সালে বক্তৃতা দিতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হন। 1926 সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে এই আমন্ত্রণ জানানো হয়। 1927 সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ম্যাডিসনের ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি সাড়া জাগানো বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাগুলি এতই ভালো হয় যে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পাকাপাকিভাবে অধ্যাপক পদে নিয়োগের প্রস্তাব দেয়। শ্রোয়েডিঙ্গার কিন্তু আমেরিকায় থাকতে রাজী হন নি। তিনি জার্মানীতে ফিরে এসে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক অধ্যাপক পদটি গ্রহণ করেন। এই পদের জন্য প্রথমে সোমারফেল্ডকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি এই পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় প্রস্তাব দেওয়া হয় শ্রোয়েডিঙ্গারকে। শ্রোয়েডিঙ্গার প্রস্তাবে রাজী হন। এই পদ গ্রহণের জন্য যাঁদের আবেদন জানাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তাঁদের তালিকার তৃতীয় নামটি ছিল ম্যাক্স বর্ন [Max Born]। শ্রোয়েডিঙ্গার 1927 সালের 1লা অক্টোবর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাক্স-প্ল্যাঙ্ক অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তখন আইনস্টাইন ওখানেই ছিলেন। শ্রোয়েডিঙ্গার আইনস্টাইনের সহকর্মী হন।

কিছুদিন বার্লিনে থাকার পর তিনি বুঝতে পারেন নাৎসিদের ইহুদি নিধন নীতির প্রেক্ষাপটে সেখানে তাঁর বসবাস প্রায় অসম্ভব। 1933 সালের 17ই অক্টোবর মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন চলে যান প্রিন্সটনে। এর অনেকটা আগেই তিনি বার্লিন ছেড়ে দিয়েছিলেন। 1932 সালের 9ই সেপ্টেম্বর তিনি চিরকালের মত ইউরোপ মহাদেশ ছেড়ে চলে যান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। ইহুদি বিধায় হিটলারের নাৎসিবাহিনী আইনস্টাইনকে হত্যার জন্য 5000 সুইশ ফ্রাঁ পুরস্কার ঘোষণা করে। শ্রোয়েডিঙ্গার অবশ্য ইহুদি ছিলেন না। তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। কিন্তু তিনি নাৎসিদের ওই ইহুদি নিধন যজ্ঞ সহ্য করতে পারছিলেন না। ফলে, তিনি বার্লিন ছাড়তে মনস্থ করেন।

1933 সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান আলেকজান্ডার লিন্ডারমান [Alexander Lindermann] বার্লিন এলেন জার্মানী সফরে। তিনি এ সময় চেষ্টা করলেন, যে সব তরুণ ইহুদি বিজ্ঞানীদের জার্মান সরকার ও তার নাৎসি বাহিনী জার্মানীতে থাকতে দেওয়া পছন্দ করছে না, তাঁদের কয়েকজনকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে। এ ব্যাপারে তিনি শ্রোয়েডিঙ্গারের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। লিন্ডারমান এই সময় অত্যন্ত আশ্চর্য হন একথা জেনে যে, স্বয়ং শ্রোয়েডিঙ্গারই জার্মানী ছেড়ে যেতে অত্যন্ত আগ্রহী। শ্রোয়েডিঙ্গার লিন্ডারমানকে এও জানালেন যে, ইংল্যান্ডে তিনি অর্থার মার্চকে নিয়ে যেতে চান তাঁর সহকর্মী হিসাবে।

আর্থার মার্চকে [Arthur March] কেন সহকর্মী হিসাবে শ্রোয়েডিঙ্গার ইংল্যান্ড নিয়ে যেতে চাইলেন তার অন্য একটা কারণও ছিল। শ্রোয়েডিঙ্গার নানা নারীসঙ্গ খুব পছন্দ করতেন। তাঁর স্ত্রী সঙ্গে তাঁর নিজের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল না। স্ত্রীর জ্ঞাতসারে তিনি বেশ কয়েকটি প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর স্ত্রী সেটা সহ্য করতে পারতেন না। তবে তাঁর স্ত্রী অ্যান্নি-রও [Anny] একজন প্রেমিক ছিল। এই প্রেমিক আর কেউ নন, তিনি শ্রোয়েডিঙ্গারের বন্ধু অধ্যাপক ইয়েল, যাঁর সঙ্গে শ্রোয়েডিঙ্গারের বন্ধুত্ব হয়েছিল 1921 সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে। 1933 সালের ওই সময় শ্রোয়েডিঙ্গারের প্রেম চলছিল আর্থার মার্চের স্ত্রী হিলডের [Hilde] সঙ্গে। তাই তিনি সস্ত্রীক মার্চকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে চান হিলডেকে কাছে পাওয়ার জন্য। হিলডের প্রেমে তিনি তখন হাবুডুবু খাচ্ছেন। অনেক প্রেমিকার মধ্যে হিলডেকেই সম্ভবতঃ তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

যে সব বিজ্ঞানীরা 1933 সালে জার্মানী পরিত্যাগ করেন তাঁরা ওই বছর গ্রীষ্মকালটা কাটান দক্ষিণ তিরল-এ [South Tyrol। শ্রোয়েডিঙ্গার হিলডে-কে সঙ্গে নিয়ে গ্রীষ্মকালটা এখানেই কাটান। হিলডে এই সময় গর্ভবতী হন। শ্রোয়েডিঙ্গারের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন হিলডে। 1933 সালের 4ঠা নভেম্বর শ্রোয়েডিঙ্গার নিজের স্ত্রী এবং প্রেমিকা হিলডেকে নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত হন। শ্রোয়েডিঙ্গার এখানের ম্যাগডালেন কলেজের ফেলো [Fellow of Magdalen College] নির্বাচিত হন। অক্সফোর্ডে এসে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই শুনতে পেলেন যে, তাঁর তরঙ্গ বলবিজ্ঞানের আবিষ্কারের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। 1933 সালের পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় শ্রোয়েডিঙ্গারকে পল ডিরাকের সঙ্গে একযোগে।

1934 সালের বসন্তকালে শ্রোয়েডিঙ্গার প্রিন্সটনে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হন। সেখানে তাঁকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকাপাকিভাবে অধ্যাপকপদে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করা হয়। এবার প্রিন্সটনে যাওয়ার জন্য তিনি অনেকটা রাজীও হন। পরে অবশ্য অক্সফোর্ডে ফিরে তিনি বেতন-পেনসন ইত্যাদির হিসাব-নিকাশ করার পর সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি প্রিন্সটনে যাবেন না, অক্সফোর্ডেই থেকে যাবেন। অক্সফোর্ডে অবশ্য তাঁর জীবন তেমন সুখের ছিল না। তিনি স্ত্রী অ্যান্নি এবং প্রেমিকা হিলডেকে নিয়ে একসঙ্গেই থাকতেন। কিন্তু দুই স্ত্রীর সংসারে যেমন সারাদিন সারাক্ষণ অশান্তি লেগেই থাকে, শ্রোয়েডিঙ্গারের সংসারেও তেমনি সারাক্ষণ অশান্তি লেগেই ছিল। এরই মধ্যে হিলডে জন্ম দিলেন এক কন্যাসন্তানের 1934 সালের 30 শে মে। শ্রোয়েডিঙ্গারের এই মেয়ের নাম রুথ জর্জিয়া এরিকা [Ruth Georgie Erica]।

1935 সালে শ্রোয়েডিঙ্গার তিন পরিচ্ছেদের একটা বড়সড় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন 'The present situation in quantum mechanics' নামে। এই প্রবন্ধেই ছিল শ্রোয়েডিঙ্গারের সেই বিখ্যাত 'মার্জার কূটাভাস' [Cat Paradox]। একটা বাক্সের মধ্যে একটা বিড়ালকে রাখা হল। এই বদ্ধ বাক্সের মধ্যে বিড়ালটি জীবন্ত কিংবা মৃত অবস্থায় থাকতে পারে। বাইয়ের কোনও দর্শকের কাছে বাক্সটির ভিতরের অবস্থার সম্ভাবনা দুটি, বিড়ালটি হয় জীবিত, নয় মৃত। বিড়ালটি জীবিত কিংবা মৃত তা জানা যাবে বাক্সটি খুললে তবেই। শ্রোয়েডিঙ্গার বললেন, বিশ্বের অবস্থা সমান্তরালভাবে একই সঙ্গে দু'রকমের—একটা মৃত বিড়ালসহ বাক্সের অবস্থা—অন্যটি জীবিত বিড়ালসহ বাক্সের। কোনটা ঠিক তা বাক্স খুললেই বোঝা যাবে। সুতরাং প্রকৃত সত্য জানার আগে অবধি বিশ্বের দ্বৈতরূপই থাকবে। বজায় থাকবে আপেক্ষকীয় বলবিজ্ঞান এবং কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। থাকবে, একাধারে কার্য-কারণ সম্পর্ক এবং অনিশ্চয়তা-সম্ভাব্যতা।

1936 সালে শ্রোয়েডিঙ্গারকে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এখানে তিনি যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমতি পেতে বেশ কিছুটা দেরী হয়। ইতিমধ্যে 'গ্রাজ' [Graz] বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আরও ভালো প্রস্তাব দেয়। তিনি এডিনবার্গ না গিয়ে অস্ট্রিয়ার গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেখানে তিনি কাজ করেন 1936 সাল থেকে 1938 সাল অবধি। ফলে, এডিনবার্গের ওখানে কাজে যোগ দেন ম্যাক্স বর্ন্।

অস্ট্রিয়া দখলের পর হিটলার গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রাখেন নিজের নামে—অ্যাডল্ফ হিটলার বিশ্ববিদ্যালয়। ওখানে নাৎসিদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে তিনি গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাৎসি প্রধানের উপদেশে সেনিটকে লিখেছিলেন যে, তিনি এতোদিন নাৎসিদের ভুল বুঝেছিলেন ঃ

"....misjudged up to the last the true will and the true density of my country. I make this confession willingly and joyfully...."

গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনিটকে লেখা তাঁর এই চিঠিটির জন্য শ্রোয়েডিঙ্গার তাঁর বাকী জীবনটা আপশোষ করেছেন। নিজের বিবেকের কাছে তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন নাৎসিদের ওই প্রশংসাপত্র লেখায়। বিবেকের দংশনের উপশম ঘটাতে শ্রোয়েডিঙ্গার এক চিঠিতে আইনস্টাইনকে লিখেছিলেন ঃ "I wanted to remain free and could not do so without great duplicity."

এতদ্‌সত্ত্বেও শেষ রক্ষা করা যায়নি। নাৎসিরা ভুলতে পারেনি শ্রোয়েডিঙ্গার 1933 সালে তাদের যেভাবে অপমান করেছিলেন। বার্লিন ছাড়ার সময় শ্রোয়েডিঙ্গার নাৎসিদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলেছিলেন। এবার নাৎসিরা তার শোধ নেয়। 1938 সালের 26শে আগস্ট শ্রোয়েডিঙ্গারকে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করা হয় 'রাজনৈতিক অবিশ্বস্ততা'-র [Political Unreliability] কারণে। তিনি ভিয়েনা গিয়ে দেখা করলেন এক আধিকারিকের সঙ্গে। ওই অফিসারটি তাঁকে জানালেন যে, তিনি শিল্প দপ্তরে একটা কাজ পেতে পারেন এবং তার প্রথম শর্ত হল তিনি দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না। এই সব শুনে তিনি

অ্যান্নিকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গেলেন রোমে। সেখান থেকে তিনি 'লীগ অব নেশনস' [League of Nations]-এর প্রেসিডেন্ট দ্য ভ্যালেরা [De Valera]-কে একটা চাকুরির ব্যবস্থা করার অনুরোধ করে চিঠি লেখেন। দ্য ভ্যালেরা তাঁর জন্য ডাবলিনের Institute for Advance Studies-এ একটা কাজের বন্দোবস্ত করেন। শ্রোয়েডিঙ্গার অবশ্য রোম থেকে আবার অক্সফোর্ডেই ফিরে যান। ওখানে জেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে [Gent University] তিনি এক বছরের জন্য ভিজিটিং প্রফেসরের কাজ পান।

জেন্টে এক বছর কাজের পর শ্রোয়েডিঙ্গার 1939 সালের শরৎকালে আবার ডাবলিন যান। সেখানে গবেষণা করেন এবং একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তাঁর এ সম্পর্কিত প্রথম গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় 1943 খ্রিস্টাব্দে। 1946 সালে তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে পত্রমাধ্যমে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই সময় আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর আলোচনার মুখ্য বিষয়ই ছিল একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব।

শ্রোয়েডিঙ্গারের এক সময় মনে হয়েছিল তিনি একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের একটা বিশাল আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তিনি ভেবেছিলেন, এই আবিষ্কার তাঁকে দ্বিতীয় বারের জন্য নোবেল পুরস্কার এনে দেবে। অবশ্য পরে তাঁর এই ভুল ভাঙে। এই ভুল ভেঙে দেন স্বয়ং আইনস্টাইন। 1947 সালেই আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ বন্ধ হয়ে যায়। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি যে গবেষণা করেন তার লব্ধ ফল তিনি জমা দেন ডাবলিনের ইনস্টিটিউটে এবং 'Irish times' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন ঃ

'This is the generalisation. Now the Einstein Theory becomes simply a special case. .... I believe I am right. I shall look an awful fool if I am wrong "

আইনস্টাইন দেখালেন, শ্রোয়েডিঙ্গারের তথাকথিত 'বিশাল' আবিষ্কারটির কোনও সারবত্তা নেই। এরপর যা হল তা এই রকম ঃ

"[Schrödinger] was even thinking of the possibility of receiveing a second Nobel prize. In any case, the entire episode reveals a lapse in judgment, and when he actually read Einstein's comment, he was devastated."

এর ফলেই, আইনস্টাইনের সঙ্গে শ্রোয়েডিঙ্গারের একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব নিয়ে চিঠিপত্রে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

ডাবলিনে থাকাকালীন তিনি যে শুধু একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তা নয়, তিনি গ্রীক বিজ্ঞান এবং দর্শন নিয়েও পড়াশুনা করেন। 1954 সালে তিনি বের করেন 'Nature and the Greeks' বইটি। এই বইটি তিনি লিখেছিলেন ডাবলিনে থাকাকালীন। এর আগে তিনি লিখেছিলেন 'What is Life' নামের বইটি 1944 সালে। এটিও তিনি লিখেছিলেন ডাবলিনে থাকাকালীন। এই বইটি জীববিজ্ঞানের অগ্রগতির অনন্য দলিল। 1961 সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'Meine Weltansicht' নামের বইটি। 1949 সালে তাঁকে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো [FRS] নির্বাচিত করা হয়।

আগেই বলেছি, হিটলার, ক্ষমতায় আসার পর শ্রোয়েডিঙ্গার 1933 সালে জার্মানী ত্যাগ

করে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। পরে 1940 সালে তিনি যোগ দেন Dublin Institute for Advance Study-তে। জীবনের শেষ ক'টা বছর তিনি অস্ট্রিয়াতেই কাটান। 1961 সালের 4ঠা জানুয়ারী ভিয়েনাতেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

শ্রোয়েডিঙ্গার 1956 সাল অবধি ডাবলিনেই ছিলেন। এরপর তিনি ফিরে আসেন ভিয়েনায়। বাকী জীবনটা তিনি ভিয়েনাতেই কাটান। ডাবলিনে থাকাকালীন তাঁর দুই স্ত্রীর আরও দুটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। ডাবলিনের ওই 'ইনস্টিটিউট ফর অ্যাড্ভান্স স্টাডিজ' সংস্থাটিতে শ্রোয়েডিঙ্গার কাজ করেন 1956 সাল অবধি। ওই বছরই তিনি অবসর নেন। ফিরে যান ভিয়েনায়, যে শহরে তিনি জন্মেছিলেন। 1961 সালের 4 জানুয়ারী তিনি দেহত্যাগ করেন। 1956 সালে তিনি ভিয়েনায় ফিরে আসার পর মাত্র বছর চারেক বেঁচে ছিলেন। 1961 সালে তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স 73 বছরের কিছুটা বেশিই ছিল। জীবনের এই চার বছর তিনি কাজ করেন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ, একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং মেসন [Meson] পদার্থবিজ্ঞানের উপর। শ্রোয়েডিঙ্গার সারাজীবনই ছিলেন একেবারে খাঁটি তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা তথা গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক।

কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের অন্যতম স্রষ্টা আরউইন শ্রোয়েডিঙ্গার শেষ বয়সে ঝুঁকে ছিলেন একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের দিকে। যে কার্য-কারণের বিশ্বাস থেকে আইনস্টাইন পদার্থবিজ্ঞানে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব এনেছিলেন, সেই বিশ্বাস সম্ভবতঃ শ্রোয়েডিঙ্গারের মধ্যেও ফিরে এসেছিল। তাই তিনি ডাবলিনে থাকার সময় এবং 1961 সালে তাঁর মৃত্যুর দিন অবধি গবেষণা করে গেছেন একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব নিয়ে। 'ঈশ্বরের পাশা খেলা'-য় আইনস্টাইন অবিশ্বাসী ছিলেন। সেই অবিশ্বাস ফিরে এসেছিল শ্রোয়েডিঙ্গারের মধ্যে তাঁর শেষ বয়সে। আইনস্টাইনও যেমন সমস্ত মৌল ক্ষেত্রগুলিকে একীভূত করতে পারেন নি, শ্রোয়েডিঙ্গারের পক্ষেও তা করা সম্ভব হয় নি। 1979 সালে আবদুস সালামরা কিছুটা এগিয়ে দিয়েছেন একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বকে তাঁদের 'ইলেকট্রোউইক তত্ত্ব' [Electroweak Theory] -এর মাধ্যমে। কিন্তু সমস্ত মৌল বল আজও একীভূত করা যায় নি। তাই কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান এবং আপেক্ষিকতাবাদ দুই-ই রয়েছে পদার্থবিজ্ঞানে। বিশ্ব আজ দু-ভাবেই প্রতিপন্ন হচ্ছে মানুষের কাছে একেবারে শ্রোয়েডিঙ্গার প্রবর্তিত 'মার্জার কূটাভাস'-এর মতই। ওই বদ্ধ বাক্সটিতে বিড়ালটি মৃতও হতে পারে, আবার জীবিতও হতে পারে। সত্যি সত্যি বিড়ালটি কী অবস্থায় আছে তা জানতে হলে বাক্সটি খুলে দেখা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এবার শ্রোয়েডিঙ্গারের তরঙ্গ বলবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনায় আসা যাক। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী শ্রোয়েডিঙ্গার 'পরিসাংখ্যিক বলবিদ্যা' [Statistical Mechanics], এক্স-রে অপবর্তন [X-ray Diffraction] এবং আপেক্ষিকতাবাদ [Theory of Relativity] নিয়ে গবেষণা করেন। আইনস্টাইনের কাজের সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় ঘটার ফলেই দ্য-ব্রগলির বস্তু-তরঙ্গবাদ [Matter-wave Theory] তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। এর থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই 1926 সালে তিনি তাঁর তরঙ্গ বলবিদ্যা সংক্রান্ত নিবন্ধ প্রকাশ করেন দ্য ব্রগলি-কে অনুসরণ করে। তিনি তাঁর তত্ত্বে বস্তুর তরঙ্গ ধারণার এমন গাণিতিক রূপ

দিলেন যা দিয়ে প্রোটন এবং ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম নির্ণয় করা যায়। এমন কি কণাঘটিত ব্যাপারগুলিরও সরল ব্যাখ্যা এই সব গাণিতিক সূত্রগুলিতে সম্ভব। 1925 সালে হাইজেনবার্গ তাঁর 'ম্যাট্রিক্স বলবিদ্যা' [Matrix Mechanics] প্রকাশ করেন। পরের বছরই শ্রোয়েডিঙ্গার প্রকাশ করলেন তাঁর 'তরঙ্গ বলবিদ্যা' [Wave Mechanics]। আগেই বলা হয়েছে, শ্রোয়েডিঙ্গারের তরঙ্গ-বলবিদ্যার সাহায্যে সহজেই পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত অব্যাখ্যাত ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু হাইজেনবার্গ-ডিরাকের কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের সাহায্যে সেটা সম্ভব হলেও সহজসাধ্য ছিল না। পঁচিশ বছর আগে প্ল্যাঙ্ক যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব [Quantum Theory] দেন তার উপর ভিত্তি করেই নীল্‌স্‌ বোর [Niels Bohr] পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তাঁর মতে পরমাণুর কোন ইলেকট্রন যখন উচ্চশক্তি-সম্পন্ন কক্ষপথ থেকে নিম্নশক্তি-সম্পন্ন কক্ষপথে ঝাঁপ দেয় তখন ওই পরমাণু থেকে যে পরিমাণ শক্তি নিঃসৃত হয় বা বিকীর্ণ হয় তা ওই দুটি কক্ষপথের শক্তিমাত্রার পার্থক্যের সমান। এই শক্তি ফোটনের আকারেই নিঃসৃত বা বিকীর্ণ হয়। বিপরীত ঘটনায় শক্তি বিকীর্ণ না হয়ে শোষিত হয়। তখন ইলেকট্রনটি নিম্নতর শক্তি-বিশিষ্ট কক্ষপথ থেকে উচ্চতর শক্তি-বিশিষ্ট কক্ষপথে ঝাঁপ দেয়। শ্রোয়েডিঙ্গার দেখালেন যে, কেন্দ্রকের চারিদিকে প্রবলবেগে গতিশীল ইলেকট্রনের তরঙ্গরূপের কম্পাঙ্কের পার্থক্যই ওই রকম শক্তি বিকিরণের বা শোষণের কারণ। শুধু তাই নয়, পরমাণুর অভ্যন্তরীণ কিছু গুণাবলী, যার কথা স্থূলভাবে জানা ছিল বা ব্যাখ্যাত হয়েছিল সেগুলি এখন যুক্তি সহযোগে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল শ্রোয়েডিঙ্গারের তরঙ্গ বলবিদ্যার সাহায্যে।

কোনো একক কণার জন্য শ্রোয়েডিঙ্গারের তরঙ্গ-সমীকরণ যে রূপ নেয় তা হল ঃ

$$\frac{\rightarrow h^2}{8\pi^2 m} \cdot \frac{d^2\psi}{dx^2} + (E - V)\psi = 0$$

আবার দেশ [Space] বা স্থান [Space] সম্পর্কিত তাঁর আবিষ্কৃত তরঙ্গ সমীকরণ হল ঃ

$$\nabla^2\psi + \frac{8\pi^2 m}{h^2}(E - V)\psi = 0$$

শ্রোয়েডিঙ্গার সময়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে তরঙ্গ সমীকরণ বের করেন তার রূপ দাঁড়ায় ঃ

$$\frac{ih}{2\pi} \cdot \frac{\delta\psi}{\delta t} = \frac{h^2}{8\pi^2 m} \cdot \nabla^2\psi - V\psi$$

এই সব সমীকরণে,

h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক

m = কণার ভর

E = কণার মোট শক্তি

V = কণার স্থিতি শক্তি

ψ = এইগেন ফাংশন [Eigen Function]। এর অন্য নাম 'তরঙ্গ অপেক্ষক' [Wave Funcetion]। এর মানই ঠিক করে x অবস্থানে অবস্থিত কণিকাকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাব্যতা। সাধারণত ψ -কে আমরা 'Wave Function'-ই বলি। ψ -এর মর্মার্থ [Significance] নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানে বেশ কিছু ব্যাখ্যা আছে।

t = সময়

∇^2 = Laplacian Operator অর্থাৎ

$$\nabla^2\psi = \frac{\delta^2\psi}{dx^2} + \frac{\delta^2\psi}{dy^2} + \frac{\delta^2\psi}{dz^2}$$

প্রথম সমীকরণে অর্থাৎ স্থান-সম্পর্কিত তরঙ্গ-সমীকরণে [Wave Equation with respect to space] ∇, Ψ, h, m, E, এবং V রয়েছে। দ্বিতীয় সমীকরণে অর্থাৎ সময়-সম্পর্কিত তরঙ্গ সমীকরণে [Wave Equation with respect to time] যোগ হয়েছে t এবং i, কিন্তু বাদ গেছে E। এই t হল সময়, আর i হল $\sqrt{-1}$, যা একটি কাল্পনিক রাশি [Imaginary Quantity]। গাণিতিক পদার্থবিদ্যায় যতরকম 'Differential Equations' আছে তাদের কোনোটাতেই এর আগে 'i' ব্যবহৃত হয় নি। এই প্রথম 'i' এলো 'Differential Equation'-এ, যে সমীকরণ গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান সংক্রান্ত।

বস্তু-তরঙ্গের গতি, প্রকৃতপক্ষে, আমাদের অতি পরিচিত তিন রকমের তরঙ্গ গতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে উৎপন্ন কোনো তরঙ্গের গতির মতো। তারের কম্পনে, গ্যাসীয় মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গের গমনাগমনে এবং তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের গতিতে যে সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তার অনেকগুলিই বস্তু-তরঙ্গের গতিতে বিদ্যমান।

সবচেয়ে সরলতম অবস্থা যদি ধরে নেওয়া হয় তবে তা হবে একটা বাক্সে একটি মাত্র কণিকা আছে। এ রকম অবস্থায় ψ (x) = A sin wx। এখানে w-এর উপযুক্ত মান পেতে হলে বাক্সের সীমানা শর্তগুলি [Boundary Conditions] আরোপ করতে হবে। এর ফলে এই সমীকরণ সেইসব তরঙ্গসমূহের প্রতিরূপ হবে, যাদের স্থিরবিন্দুগুলি ওই বাক্সের দেওয়ালগুলিতে অবস্থান করবে। ফলে, 1, 2, 3 অথবা যে কোনো পূর্ণসংখ্যা [Integral Number] অর্ধ-তরঙ্গগুলির [Half Waves] গুণিতক হবে। এই সংখ্যাগুলি হল কোয়ান্টাম সংখ্যা [Quantum Number]। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে [Quantum Mechanics] এই কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলি বহুল ব্যবহৃত। শ্রোয়েডিঙ্গারের এই সমীকরণ জটিল পারমাণবিক ও আণবিক গঠন-সংক্রান্ত সমস্যার অধিকাংশই ব্যাখ্যা করতে পারল। পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই তরঙ্গ সমীকরণ কণাজগতে প্রয়োগ করে যে অদ্ভুত ফল পাওয়া যায়, বড় বড় বস্তুর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ তেমন ফলপ্রসূ হয় না। সে সব ক্ষেত্রে এই সমীকরণ সনাতন বলবিদ্যার [Classical Mechanics] মতই ফল দেয়।

বোরের তত্ত্ব [Bohr's Theory] সাফল্য পেয়েছিল বিন্দুমাত্রার কেন্দ্রকের [Point Nucleus] বৈদ্যুত ক্ষেত্রে [Electric Field] অবস্থিত একক-কণার ক্ষেত্রে। কিন্তু শ্রোয়েডিঙ্গারের তরঙ্গসমীকরণ আরও জটিল পরমাণু ও অণুদের গঠনতন্ত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হল।

শ্রোয়েডিঙ্গারের এই গাণিতিক সূত্র কাজে লাগিয়ে ম্যাক্স বর্ন্ [Max Born] তাঁর সূত্রে তরঙ্গকে বললেন 'সম্ভাব্যতার তরঙ্গ' [Waves of Probability] এবং এইভাবে বস্তুর তরঙ্গ হয়ে গেল সম্ভাব্যতার তরঙ্গ। শেষমেশ দাঁড়ালো এই যে, আমরা একটি তরঙ্গপূর্ণ বিশ্বে কিংবা বস্তুপূর্ণ বিশ্বে বাস করছি। এই বিশ্ব বস্তু কিংবা তরঙ্গের সমাহার। বিশ্বকে বলা হল 'Universe of Wavicles', যেখানে Wavicles-কে বলা যায় 'তরঙ্গণিকা', যা হতে পারে 'তরঙ্গ' এবং 'কণিকা' শব্দ দুটির মিশ্রণ। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, আমাদের বিশ্ব তরঙ্গণিকায় পূর্ণ। অর্থাৎ আমরা এক তরঙ্গণিকাপূর্ণ বিশ্বে বাস করছি।

এইভাবে পদার্থ কিংবা বিকীর্ণ শক্তি হয়ে গেল কণা কিংবা তরঙ্গ-সমষ্টি। পদার্থবিজ্ঞান এই বাস্তব অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলল, "This shows that reality, whether matter or radiation, is made up of a subtle and almost indefinable fusion of two antagonistic but complementary factors, the 'continuous wave' and the 'discontinuous particle'; it is a 'discontinuous continuity' or a 'continuous discontinuity' and hence not a simple but 'complex unity'. এরপরই এল হাইজেনবার্গের [Heisenberg] অতি বিখ্যাত 'অনিশ্চয়তা নীতি' [Uncertainty Principle] বা 'অনিশ্চয়তাবাদ' [Principle of Indeterminacy]।

ফলে, কণিকাজগতে এল অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতা, বিশৃঙ্খলা এবং কার্যকরণ সম্পর্কের অভাব। আইনস্টাইন সারা জীবন কার্যকারণ সম্বন্ধের বাইরে এক পাও বাড়ান নি। কার্যকারণ সম্বন্ধের উপর এই বিশ্বের ঘটনাবলী নির্ভরশীল—একথা আইনস্টাইন সারা জীবন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। সমস্ত জীবন তিনি এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরেছিলেন শক্ত করে। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, কণিকা জগতের চিন্তাধারায় কোথাও একটি গলদ যেভাবেই হোক রয়ে গেছে, আর তার ফলেই এমন বিশৃঙ্খলা। আসল সত্য একদিন জানা যাবেই। তাই, বোর, হাইজেনবার্গ, দ্য ব্রগলি, শ্রোয়েডিঙ্গার, ম্যাক্স বর্ন্ প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের থেকে একেবারে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন। হয়ে গিয়েছিলেন একা, ভিন্নপথের নিঃসঙ্গ পথিক।

কোয়ান্টামবাদকে গভীরভাবে পুষ্ট করেছে যে সব বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা শ্রোয়েডিঙ্গার তাঁদের অন্যতম। দ্য ব্রগলির বস্তু-তরঙ্গ তত্ত্বকে পরিপূর্ণতা দেবার মুখ্য শিল্পী হলেন আরউইন শ্রোয়েডিঙ্গার। সালাম-ভিনবার্গ-গ্লাসোর ইলেকট্রোউইক তত্ত্বের [Electroweak Theory] $W^{\pm}$ ও Z^{0} কণাগুলি পরীক্ষাগারে পাওয়ার ফলে আইনস্টাইনের প্রস্তাবিত 'একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব' [Unified Field Theory] শক্ত ভিত্তিভূমি পেলেও বস্তুর দ্বৈতরূপের বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্যগুলি আজও তেমন দানা বেঁধে ওঠে নি। পদার্থের দ্বৈত সত্তা, বস্তু ও তরঙ্গ যেমন আছে, তেমনি পদার্থবিজ্ঞানের আজও দুটি ধারা বিদ্যমান। তার একটি ধারা 'আপেক্ষিকতাবাদ' [Theory of Relativity] এবং অন্যটি 'কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান' [Quantum Mechanics]। প্রথমটি বলে কার্য-কারণ সম্পর্কের কথা, দ্বিতীয়টি বলে অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতার কথা। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা এখন জোর কদমেই এ দুটির মেলবন্ধন ঘটানোর প্রবল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ●

ম্যাক্স বর্ন্

[1882–1970]

কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের অন্যতম প্রবক্তা, শ্রোয়েডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণের ব্যাখ্যাকার ম্যাক্স বর্ন্ [Max Born] জন্মেছিলেন 1882 সালের 11ই ডিসেম্বর। তাঁর জন্মস্থান সে সময়ের জার্মানীর ব্রেসলাউ [Breslau] শহরে। এই শহরটি এখন পোল্যান্ডের অন্তর্গত। এর নাম এখন 'Wroclaw'। তাঁর বাবা অধ্যাপক গুস্তাভ [Prof. Gustav] অধ্যাপনা করতেন ব্রেসলাউ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি ছিলেন অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা [Anatomy] এবং ভ্রূণবিদ্যার [Embryology] অধ্যাপক। ম্যাক্স বর্নের মা হলেন মার্গারেট কফমান [Margarete Kaufmann]। মার্গারেট-এর পিতা ছিলেন ব্রেসলাউয়ের এক বস্ত্রশিল্প কারখানার মালিক। এঁরা সবাই ছিলেন ইহুদি। ম্যাক্স বর্নের মা ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞা। মায়ের সঙ্গীতানুরাগ ম্যাক্সের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনিও সঙ্গীত প্রেমিক ছিলেন, বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি।

ম্যাক্সের যখন মাত্র চার বছর বয়স তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। এই সময় ম্যাক্স ও তাঁর ছোট বোনের দেখাশুনার জন্য গুস্তাভ একজন গৃহশিক্ষিকা [Governess] নিয়োগ করেন। এরপর চার বছর ধরে বেশ কয়েকজন গৃহশিক্ষকা একের পর এক নিযুক্ত হন ম্যাক্স ও তাঁর বোনের দেখাশুনা ও লেখাপড়ার জন্য। 1890 সালে গুস্তাভ আবার বিয়ে করেন। এই সৎমা অবশ্য খুব দক্ষতার সঙ্গে সংসার চালাতেন। ম্যাক্স এবং তাঁর বোনের খুব আদরযত্ন করতেন। তাঁদের দেখাশুনার ব্যাপারে কোনও ত্রুটি রাখেন নি গুস্তাভের দ্বিতীয়া স্ত্রী। তা সত্ত্বেও বিমাতাকে ম্যাক্স এবং তাঁর বোন কখনই তেমনভাবে মেনে নিতে পারেন নি। এই সৎমার সঙ্গে তাঁদের স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্ক তেমনভাবে গ'ড়ে ওঠে নি। যাইহোক, একটা সংস্কৃতিবান শিক্ষিত পরিবারেই বড় হয়েছিলেন ম্যাক্স বর্ন্। এই ইহুদি বিজ্ঞানীটি ছিলেন আইনস্টাইনের সমসাময়িক। আইনস্টাইন জন্মেছিলেন 14ই মার্চ, 1879 খ্রিস্টাব্দে। আর ম্যাক্স বর্ন্ জন্মেছিলেন 1882 সালের 11ই ডিসেম্বর।

কৈশোরে ম্যাক্স ভর্তি হন কোনিগ ভিলহেলম জিমন্যাসিয়ামে [Knöig Wilhelms Gymnasium]। ব্রেসলাউয়ের এই বিখ্যাত জিমন্যাসিয়ামে তিনি নানা বিষয়ে পড়াশুনা করেন। এখানে তাঁর পড়াশুনা শুরু হয় গণিত, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, ল্যাটিন, গ্রীক এবং জার্মান ইত্যাদি পাঠের মধ্য দিয়ে। স্কুল জীবনে তাঁর প্রতিভার বিকাশ তেমন দেখা যায় নি। বিজ্ঞানের বিষয়গুলির চেয়ে তিনি সাহিত্যের বিষয়গুলির প্রতি অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন। সেগুলি পড়তেও তিনি বেশি পছন্দ করতেন। 1901 সালে তিনি

ব্রেসলাউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। স্কুল ছাড়ার সামান্য আগে ম্যাক্সের বাবা গুস্তাভ হঠাৎই মারা যান। তবে বাবার ইচ্ছার কথা মনে রেখেই ম্যাক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে পড়াশুনা করতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে 1901-1902 সালে তিনি যে সব বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেন তাদের মধ্যে ছিল, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, তর্কবিদ্যা, দর্শন এবং প্রাণীবিদ্যা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হওয়ার পাঠ নিতে থাকেন তিনি। সে সময় জার্মানীতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে ঘুরে পড়তে হত। ম্যাক্স তাঁর পড়ার সময় 1902 সালে যান হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে [University of Heidelberg]। 1903 সালে তিনি যান জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে। জুরিখে তিনি উন্নত গণিতের উপর পড়াশুনা করেন। এই সময় তাঁর পাঠ্য ছিল উপবৃত্তীয় অপেক্ষকসমূহ [Elliptic Functions]। এই অপেক্ষকগুলির উপর একটা পুরো কোর্সই তিনি শেষ করেন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ব্রেসলাউয়ে ফিরে এসে তিনি তাঁর সহপাঠী বন্ধুদের কাছ থেকে জানলেন তিন দিকপাল অঙ্কশাস্ত্রবিদের কথা। এঁরা হলেন গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লেইন [Klein], হিলবার্ট [Hilbert] এবং মিনকৌস্কি [Minkowski]। বর্ন্ প্রায় তখনই গটিংগেনে হাজির হয়ে গেলেন মিনকৌস্কি এবং হিলবার্টের বক্তৃতা শোনার জন্য। 1905 সালে তিনি হিলবার্টের সহকারী হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন। এই সময় তিনি মিনকৌস্কি, ক্লেইন এবং রাঞ্জ [Runge] প্রমুখের বক্তৃতাও মনোযোগ সহকারে শুনতেন। এছাড়া তিনি বোধ হয় সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিলেন এই সব দিকপালদের সঙ্গে বন-ভ্রমণের সময় বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা থেকে। এঁরা, বিশেষ করে হিলবার্ট এবং মিনকৌস্কি, বনপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে দর্শন, রাজনীতি, সমাজ, গণিত ইত্যাদি নানা বিষয়ের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। ম্যাক্স এগুলি শুনে নিজেকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেন। ক্লেইন কিন্তু ম্যাক্সের উপর চটে গিয়েছিলেন। কারণ, ম্যাক্স ক্লেইনের ক্লাশে হাজির হতেন খুবই অনিয়মিতভাবে, যেটা ক্লেইন একদম পছন্দ করতেন না। ক্লেইন বিরূপ হওয়ায় ম্যাক্স বর্ন্ তাঁর বিষয় পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। তিনি তাঁর ডক্টরেটের বিষয়গুলিতে জ্যামিতির জায়গায় জ্যোতির্বিজ্ঞানকে নিয়ে আসেন। বিষয় পরিবর্তনের পর তিনি ক্লেইনের বক্তৃতায় বা ক্লাশে হাজির হওয়া বন্ধ করেন। পরিবর্তে তিনি 'Schwarzschild'-এর জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্লাশে যাওয়া শুরু করেন। 1907 সালে তিনি গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণাপত্রের বিষয় ছিল 'স্থিতিস্থাপক স্থায়িত্ব' [Elastic Stability]।

ডক্টরেট হওয়ার পর তিনি সৈন্যবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে কাজে যোগ দেন। তবে তাঁর হাঁপানি থাকায় এক বছরের জায়গায় অনেকটা কম সময়েই তিনি সৈন্যবাহিনী থেকে



যৌবনে ম্যাক্স বর্ন [1882-1970]



প্রৌঢ় ম্যাক্স বর্ন [1882-1970]

ছাড়া পেয়ে যান। এরপর তিনি ছয় মাসের জন্য কেম্ব্রিজে যান। কেম্ব্রিজের কেইয়াস কলেজের [Caius College] অধ্যাপক লারমোর [Larmor]-এর বক্তৃতা তাঁর আইরিশ উচ্চারণ ভঙ্গির জন্য প্রায় বোধগম্য না হওয়ায় ম্যাক্স বর্ন্ ফিরে আসেন ব্রেসলাউয়ে। এই সময় তিনি আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে প্রকাশিত গবেষণাপত্রটি মন দিয়ে পড়াশুনা করেন এবং গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। আইনস্টাইনের মতবাদ ও মিনকৌস্কির সে সংক্রান্ত ব্যাখ্যার মেলবন্ধ ঘটাতে ম্যাক্স বর্ন্ যে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন তার জন্য গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আমন্ত্রণ জানায় 1909 খ্রীস্টাব্দে। মিনকৌস্কির সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাও নেয়। দুর্ভাগ্য হল, এর কয়েক সপ্তাহ পরেই মিনকৌস্কি মারা যান। ম্যাক্স বর্ন্ এতে যথেষ্ট হতাশ হন। এ নিয়ে তিনি আবার ক্লেইনের কাছে যান। ক্লেইন কিন্তু ম্যাক্সের দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে পারেন নি। তখন ম্যাক্স আরও হতাশ হয়ে রাঞ্জের মাধ্যমে হিলবার্টের কাছে আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে তাঁর ওই কাজের কথা জানান। হিলবার্ট অবশ্য ম্যাক্স বর্নের প্রস্তাবনায় সারবত্তা রযেছে বলে স্বীকার কবে নেন। কিন্তু এ নিয়ে তাঁর গবেষণা সে সময় আব এগোয় নি।

1912 সালে তিনি গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানে অধ্যাপক পদে যোগ দেন। এখান থেকেই তিনি 1907 সালে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। কাজে যোগ দিয়েই তিনি ফন কারম্যানের [Von Karman] সঙ্গে মিলিতভাবে 'ল্যাটিস গতিবিজ্ঞান' বা 'জালকীয় গতিবিজ্ঞান' [Lattice Dynamics] নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এঁরা কোনও বস্তুর স্বাভাবিক কম্পনের ক্ষেত্রে তার কেলাসের স্বাতন্ত্র্য সংখ্যা [Degree of Freedom] শনাক্ত করেন। তাঁদের এই কাজে ত্রি-মাত্রিক ফুরিয়ে বিশ্লেষণ [Three Dimensional Fourier Analysis] এবং পর্যাবৃত্ত সীমানা শর্তসমূহ [Periodic Boundary Conditions] ব্যবহৃত হয়।

ম্যাক্স বর্ন্ 1913 সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্ত্রীর নাম হেডউইগ এহ্‌রেনবার্গ [Hedwig Ehrenberg]। তিনি ছিলেন গটিংগেনের আইনের অধ্যাপকের কন্যা। বর্নের এক পুত্র এবং দুই কন্যা। বর্নের সঙ্গে আইনস্টাইনেব গভীব বন্ধুত্ব ছিল। শুধু বর্নের সঙ্গে নয়, বর্নের স্ত্রী হেডউইগের সঙ্গেও আইনস্টাইনের বেশ সখ্যতা জন্মায়। ইনিই 1918 সালে অসুস্থ আইনস্টাইনকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তিনি মরতে ভয় পান কি না। এর উত্তরে আইনস্টাইন বলেছিলেন ঃ "না, মোটেই না, আমি নিজেকে প্রতিটি জীবন্ত সত্তার সঙ্গে এমনই জড়িত বলে মনে করি যে, এই অনন্ত প্রবাহে কোন একটি মানুষের অস্তিত্বের কোথায় শুরু এবং কোথায় শেষ তা জানবার আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।"

ম্যাক্স বর্ন্ আপেক্ষকীয় ইলেকট্রনের [Relativistic Electron] উপর যে গবেষণা করেন তারই সুবাদে তিনি গটিংগেনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই কাজের জন্যই শিকাগো থেকে মাইকেলসন [Professor Albert Abraham Michelson] তাঁকে ডেকে পাঠালেন আপেক্ষিকতাবাদের উপর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। 1912 সালে তিনি শিকাগো যান এবং

আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে বক্তৃতা করেন। এই সময় মাইকেলসনের সঙ্গে তিনি অনেকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেন।

1914 সালে বর্ন্ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। এখানে তিনি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের সহযোগী হন।এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়। বর্ন্ যদিও সামরিক বাহিনীতে কাজ করতে খুবই অপছন্দ করতেন তবুও তাঁকে বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীর কাজে যোগ দিতে হয়। প্রথমে তিনি জার্মানীর বায়ুসেনা বিভাগে রেডিও অপারেটর হিসাবে কাজ করেন। পরে তিনি গোলন্দাজ বাহিনীতে বদলি হন। এই সময় তিনি শব্দ নিয়ে গবেষণা করেন গোলন্দাজ বাহিনীতে প্রয়োগ করার জন্য। এই গবেষণার সময় তাঁকে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা হয় গবেষণার প্রয়োজনে। এই সময় তিনি তাঁর সমস্ত প্রাক্তন সহকর্মী ও ছাত্রদেরও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনে যুদ্ধসংক্রান্ত গবেষণায় নিয়োগ করার সুপারিশ করেন কর্তৃপক্ষের কাছে। যুদ্ধের বছরগুলিতে ম্যাক্স বর্ন্ খুবই কষ্টের মধ্যে কাটান। তবে এই সময় তাঁর বন্ধুত্ব হয় আইনস্টাইনের সঙ্গে। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে নানা বিষয়ে তাঁর পত্রালাপ চলতে থাকে। আবার আইনস্টাইনের সঙ্গে মাঝে মাঝে একসঙ্গে বাজনাও বাজাতেন ম্যাক্স বর্ন্। আইনস্টাইনের সঙ্গে পরিচিতি, তাঁর সঙ্গ, তাঁর সঙ্গে বাজনা বাজানো—এ সবই ম্যাক্স বর্নের কাছে ছিল যুদ্ধের ওই কষ্টের দিনগুলিতে বেশ কিছুটা আনন্দের। বর্নের ওই কষ্টের উপশম ঘটাতো আইনস্টাইনের ওই সাহচর্য। বর্ন্ ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতেন। সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ তিনি লাভ করেছিলেন মায়ের কাছ থেকে। আইনস্টাইন খুব ভালো বেহালা বাজাতে পারতেন। মাঝে মাঝেই বসত আইনস্টাইন ও ম্যাক্স বর্নের বেহালা এবং পিয়ানোর যুগলবন্দী।

ম্যাক্সা বর্ন্ এবং আইনস্টাইনের এই বন্ধুত্ব বহুকাল অটুট ছিল। যদিও পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কারে এই দুই মহান বিজ্ঞানী দুটি ভিন্ন পথে কিংবা উল্টো পথে চলে গিয়েছেন। আইনস্টাইন সারা জীবন কার্য-কারণ তত্ত্বে বিশ্বাসী থেকে গেছেন, কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতায় তিনি সারাটা জীবনই অবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ম্যাক্স বর্ন্ তাঁর গবেষণায় গিয়েছেন বিপরীত পথে। তিনি কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্যতম স্রষ্টা। তাঁরই ছাত্র হাইজেনবার্গ আবিষ্কার করেন 'অনিশ্চয়তা নীতি' [Uncertainty Principle]। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের অন্যতম প্রবক্তা ম্যাক্স বর্ন্‌কে 1944 সালে আইনস্টাইন লিখেছিলেন ঃ

"আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় আমরা দু'জনে উল্টো পথে গিয়েছি। আপনি পাশা-ক্রীড়ক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন, আর আমি বিশ্বাস করি শৃঙ্খলাপূর্ণ বিশ্বে সব কিছুর বাস্তব অস্তিত্বে এবং সেই সত্য জানবার জন্য আমাকে অদ্ভুত কল্পনার সাহায্য নিতে হয়। আমি আশা করি যে, একদিন কোন একজন বিজ্ঞানী আমার উপলব্ধির চেয়ে অধিকতর বাস্তব পদ্ধতিতে কিংবা অধিকতর বোধগম্য ভিত্তিতে এই সত্যকে আবিষ্কার করতে পারবেন। কোয়ান্টামবাদের প্রথম বিরাট সাফল্য আমাকে ওই পাশা খেলাতে বিশ্বাস করাতে পারবে না।"

আইনস্টাইন বলতেন, 'ঈশ্বব পাশা খেলেন না'। ঈশ্বর বলতে তিনি বুঝিয়েছেন প্রকৃতির শক্তির কার্য-কারণ ভিত্তিতে প্রকাশ। প্রাকৃতিক সত্যের তত্ত্বগুলি পাশার দান নয় যে, এটিও হয় আবার ওটিও হয়। সত্যের এই অনিশ্চয়তা আইনস্টাইন মানতেন না। অথচ কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান এই অনিশ্চয়তায় বিশ্বাস করে। ম্যাক্স বর্ন্ ছিলেন এই বিশ্বাসীদের দলে। তাঁরই ছাত্র হাইজেনবার্গ 1925 সালে প্রকাশ করেছিলেন 'কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান' বা 'ম্যাট্রিক্স বলবিজ্ঞান' [Matrix Mechanics]। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের কিছুটা বিস্তৃত আলোচনায় একটু পরেই আসছি। ম্যাক্স বর্ন্ ভিন্নপথের পথিক হলেও আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক বহুকাল ধরেই বজায় ছিল।

আবার ফিরে আসি ম্যাক্স বর্নের কথায়। আগেই বলেছি, বর্ন্ বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন 1915 সালে। সেনাবাহিনীর কাজ করতে করতেই তিনি কেলাস তত্ত্বের উপর গবেষণা করে তাঁর প্রথম বই 'Dynamics of Crystal Lattices' প্রকাশ করেন। এই বইয়ে ল্যাটিস নিয়ে বর্ন্ গটিংগেনে যে সব গবেষণা করেছিলেন সেগুলি তিনি সংক্ষেপে লিখে ফেলেন।

1919 সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। ওই বছরই ম্যাক্স বর্ন্ ফ্রাঙ্কফুট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। এখানে একটা গবেষণাগার পুরোপুরিভাবেই তাঁর অধীনে রাখা হয়। এই সময় তাঁর সহকাবী ছিলেন অটো স্টার্ন [Otto Stern]। এখানে তিনি Institute of Theoretical Physics-এর ডিরেক্টাব হিসাবেও কাজ করেন। দু'বছর পরে 1921 খ্রিস্টাব্দে তিনি ফিরে আসেন গটিংগেন-এ Physical Institute-এর ডাইরেক্টর হয়ে। তিনি গটিং-গেনের অধ্যাপকও নিযুক্ত হন 1921 সালেই। এই সময় তিনি তাপগতিতত্ত্বের প্রথম সূত্রের নতুন রূপ দেন।

1925 সালে ম্যাক্স বর্নের অধীনে গবেষণা করে হাইজেনবার্গ আবিষ্কার করলেন 'ম্যাট্রিক্স মেকানিকস' [Matrix Mechanics]। ম্যাক্স বর্ন্ এর নাম দিলেন 'কোয়ান্টাম মেকানিকস' [Quantum Mechanics] বা কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। তিনি স্বীকৃত দিলেন যে, হাইজেনবার্গের এই ম্যাট্রিক্স বলবিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে ম্যাট্রিক্স অ্যালজেবরা। ম্যাক্স বর্ন্ নিজে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের পরিসাংখ্যিক ব্যাখ্যা দেন। 1926 সালে শ্রোয়েডিঙ্গার 'তরঙ্গ-সমীকরণ'-গুলি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন তরঙ্গ বলবিজ্ঞান। এই সমীকরণের ψ-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন ম্যাক্স বর্ন্। 1927 খ্রিস্টাব্দে হাইজেনবার্গ প্রকাশ করেন তাঁর 'অনিশ্চয়তা নীতি'। এই আবিষ্কারও হয় বর্নের অধীনে হাইজেনবার্গের কাজ করবার সময়। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের মৌলিক গুরুত্ব তিনিই ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যার ফলে প্ল্যাঙ্ক আইনস্টাইনদের পুরাতন কণাবাদ [Quantum Theory] প্রতিস্থাপিত হয় নতুন কোয়ন্টাম বলবিজ্ঞান দিয়ে। এই আলোচনায় একটু পরেই আসা হচ্ছে।

1933 সালে প্রাণভয়ে ইহুদিরা জার্মানী ছেড়ে পালাতে থাকেন। নাৎসি জমানায় যে বর্বর ইহুদি নিধন যজ্ঞ হয়েছিল জার্মানীতে তার হাত থেকে বাঁচতে ম্যাক্স বর্ন্ প্রথমে ইতালি

এবং পরে ইংল্যান্ডে চলে যান। এই সময় তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্টোক্‌স্ অধ্যাপক' হিসাবে নিযুক্ত হন। কেম্‌ব্রিজে এসে তিনি যে উষ্ণ-অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"He later spoke very warmly of the way in which he had been received and made welcome in [Britain]. For the next few years he and his wife devoted much effort to giving help and advice to others from Germany and Austria who had to emigrate."

1935-36 সালের শীতকালটা তিনি ভারতে কাটান। সে সময় চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন [Sir C. V. Raman] ছিলেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের ডিরেক্টার। 1934 সালে রামন অধ্যাপক ম্যাক্স বর্ন্‌কে ব্যাঙ্গালোরের ওই ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। তারই প্রেক্ষিতে ম্যাক্স বর্ন্ ব্যাঙ্গালোরে আসেন 1935-36 সালের শীতকালে। হিটলারের জার্মানী থেকে নির্বাসিত বর্ন তখন কেম্‌ব্রিজে ছিলেন। বর্নের হাঁপানির অসুবিধা ছিল বলে প্রথমটা তিনি স্বাস্থ্যের কারণে ভারতে আসতে চান নি। পরে আবশ্য রামনের পীড়াপীড়িতে রাজী হয়ে 1935-36 সালের শীতকালটা ব্যাঙ্গালোরের ওই ইনস্টিটিউটেই কাটান। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, শ্রোয়েডিঙ্গারের কাছে এই আমন্ত্রণ একটু দেরীতে পৌঁছায় এবং 'উপনিষদের দেশ'-এ না আসতে পারার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। ম্যাক্স বর্ন্ এখানে অর্থাৎ ব্যাঙ্গালোরে যে সব বক্তৃতা দেন তার মধ্যে ছিল কেলাস জালকের গতিবিদ্যা সম্পর্কে একটি কোর্স। রামন এই বৃক্তৃতা নিয়মিত শুনতে যেতেন। বর্ন্ এ বিষয়ে ছিলেন একজন পথিকৃৎ। বর্ন্ যেভাবে হীরার ক্ষেত্রে ল্যাটিস ধর্ম প্রয়োগ করেন তা এই বিষয়ে বিশাল অগ্রগতি বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। বর্ন্ এ বিষয়ের জনক বলেই গণ্য হন। চল্লিশের দশকে রামন নিজেই কেলাস ল্যাটিসের গতিবিদ্যা নিয়ে একটি তত্ত্ব প্রস্তুত করেন। বর্ন্ আইনস্টাইনকে একটা চিঠিতে রামনের এই তত্ত্বকে অত্যন্ত কাঁচা বলে অভিহিত করেন। পরীক্ষার কাজে রামনের দক্ষতা ছিল সন্দেহাতীত, কিন্তু তাঁর গণিতে জ্ঞান কিছুটা সীমিত হওয়ার দরুণ তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অধিকার তেমন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি।

ভারতবর্ষ থেকে ফিরে 1936 সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ম্যাক্স বর্ন্। স্কটল্যান্ডের এই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়টিতে তিনি একটা গবেষক গোষ্ঠী গ'ড়ে তোলেন তাঁদের নিয়ে যাঁরা ইউরোপ ছেড়ে ওখানে শরণার্থী হিসাবে গিয়েছিলেন। তাঁর গবেষক ছাত্রদের মধ্যে একজন লিখেছেন ঃ

"When Born arrived in the morning he first used to make the round of his research students, asking them whether they had any progress to report, and giving them advice, sometimes presenting them with sheets of elaborate calculations concerning their problems which he had himself done the day before. ..The rest of the morning was spent by Born in delivering his lectures to undergradutae honours students, attending to departmental business, and doing research work of his own. Most of the latter, however he used to carry out at home in the afternoons and evenings."

1953 সালে ম্যাক্স বর্ন্ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি জার্মানীতে ফিরে আসেন। গটিংগেনের কাছে ব্যাড পিবমন্ট [Bad Pyrmont] নামের একটা জয়গায় বর্ন্ গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। এর কিছুদিন পরেই 1954 সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। 1954 সালেব পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার তিনি পান ওয়াল্টার বোথের [Walther Bothe] সঙ্গে মিলিতভাবে। বোথেও ছিলেন জার্মানীর অধিবাসী। ম্যাক্স বর্ন্‌কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় 1925-26 সালে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের উপর তাঁর আবিষ্কারগুলির জন্য। উপ-পারমাণবিক [Sub-atomic] কণাসমূহের আচরণের পরিসাংখ্যিক সূত্র নির্ণয় করেন ম্যাক্স বর্ন্। তাঁর তরঙ্গ অপেক্ষক নিয়ে গবেষণাসমূহ প্রারম্ভিক কোয়ান্টাম তত্ত্বকে নতুন কোয়ান্টাম তত্ত্বে রূপান্তরিত করে। প্রারম্ভিক বা মূল কোয়ান্টাম তত্ত্বে ইলেকট্রনকে কণা ধরা হত। নতুন তত্ত্বে ইলেকট্রন হয়ে গেল যুগপৎ কণা ও তরঙ্গ। এতে ইলেকট্রন কিংবা উপ-পারমাণবিক কণাসমূহের আচরণ আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যাত হল। 1925-26 সালের এই সব আবিষ্কারের জন্যই মূলতঃ ম্যাক্স বর্ন্‌কে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয় 1954 সালে।

1939 সালে ম্যাক্স বর্ন্‌কে ফেলো অফ রয়েল সোসাইটি [FRS] নির্বাচিত করা হয়। 1950 সালে তাঁকে দেওয়া হয় 'Hugh Medal' সাধারণভাবে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর নানা অবদানের জন্য এবং বিশেষভাবে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানকে তাব স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'স্টোক্স্ পদক' [Stokes Medal] দিয়ে সম্মান জানায়। জার্মানীতে দুটি স্কুলের নামকরণ তাঁর নামে করা হয়। নানা অ্যাকাডেমি তাঁকে সম্মানীয় সদস্যপদ প্রদান করে। যেমন ঃ গটিংগেন, মস্কো, বার্লিন, ব্যাঙ্গালোর, বুখারেস্ট, এডিনবরা, লন্ডন, লিমা, কোপেনহেগেন, স্টকহোম, ওয়াশিংটন এবং বোস্টন। তিনি সম্মানীয় ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন যে সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেগুলি হল ঃ ব্রিস্টল বোর্দো, অক্সফোর্ড, ফ্রেইবার্গ, এডিনবরা, অসলো, ব্রাসেলস, হামবোল্ট (বার্লিন), স্টুটগার্ট টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। জার্মান ফিজিক্যাল সোসাইটি তাঁকে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক পদক দিয়ে সম্মানিত করে। Hugh-পদক ছাড়াও তিনি পেয়েছিলেন হিউগো গ্রোটিয়াস পদক [Hugo Grotius Medal] আন্তর্জাতিক আইন রক্ষার সম্মানে। এছাড়াও তিনি পেয়েছিলেন ম্যাকডুগাল-ব্রিসবেন পুরস্কার [Mac Dougall-Brisbane Prize] এবং এডিনবরার বয়্যাল সোসাইটির 'গানিং ভিক্টোরিয়া জুবিলি পুরস্কার'।

1953 সালে তাঁকে গটিংগেনের সম্মানীয় নাগরিক হিসাবে ঘোষণা করা হয়। 1959 সালে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় গণরাজ্যের [German Federal Republic] তরফ থেকে তাঁকে 'Grand Gross of Merit' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

তিনি তাঁর 87 বছরের সুদীর্ঘ জীবনে বহু বই লিখেছেন। বইগুলি পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র এবং গবেষকদের খুবই উপযোগী। তাঁর গবেষণাপত্রের সংখ্যা প্রায় 360টি। সাধারণের উপযোগী কিছু বিজ্ঞান বইও তিনি লিখেছেন। তিনি মারা যান 1970 সালের 5ই জানুয়ারী। তখন তাঁর বয়স 87 বছর সবে অতিক্রম করেছে। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর উদ্দেশে যে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল তার কিছুটা এই রকম ঃ

"He was respected and honoured for many important contributions to his subject and for his wisdom and success as a teacher. He was widely known for his exposition of the ideas of physics to the layman, and he was held in affection by his many colleagues and pupils for the warmth and simple directness of his personality."

ম্যাক্স বর্ন্ যে সব বই লিখেছেন সেগুলির মধ্যে দুটি বই খুবই বিখ্যাত —(i) Einstein's Theory of Relativity এবং (ii) Experiment and Theory in Physics. এছাড়া তিনি নিজের আত্মজীবনীও লিখেছেন। আইনস্টাইনকে ঈশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন, 'স্পিনোজার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর'। তেমনি ম্যাক্স বর্ন্ এক সময় বলতেন,

"If God has made the world a perfect mechanism, He has at least conceded so much to our imperfect intellect that in order to predict little parts of it, we need not solve innumerable differential equations, but can use dice with fair success."

ম্যাক্স বর্নের মতে, 'I am now convinced that theoretical physics is actual Philosophy'. অর্থাৎ তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানই প্রকৃত দর্শন। বহু বিজ্ঞানী এই মতে বিশ্বাস করতেন এখনও করেন। পদার্থ বিজ্ঞানের সমস্যার কথা বলতে গিয়ে তিনি তাঁর Experiment and Theory in Physics বইটিতে লিখেছেন,

"The problems of physics is how the actual phenomena, as observed with the help of our sense organs aided by instruments, can be reduced to simple notions which are suited for precise measurement and used of the formaulation of quantitative laws."

তিনি বলতেন, মানুষের তার হাতের এবং মস্তিষ্কের কাজকেই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা উচিৎ। তাই অত্যুৎসাহী পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারীরা তাঁদের পরীক্ষার মাপজোক নিয়ে জাঁক করলে তার বিরোধিতা করা উচিত নয়। এঁরা কাগজ-কলমের তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানীদের কিছুটা তাচ্ছিল্য করতে পারেন, কারণ এই সব তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী বন্ধুরাও নিজেদের অত্যুন্নত কল্পনাসমূহের জন্য গর্ববোধ করেন এবং অন্যের নোংরা আঙুলগুলির জন্য ঘৃণাবোধ করেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"It is natural that a man should consider the work of his hands or his brain to be useful and important. Therefore nobody will object to an ardent experimentalist boasting of his measurements and rather looking down on the 'paper and ink' physics of his theoretical friend, who on his part is proud of his lofty ideas and despises the dirty fingers of the other." *(Experiment and Theory in Physics)*

তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আসা, কিংবা এক্সপেরিমেন্টাল বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করা নিয়ে ম্যাক্স বর্নের সঙ্গে সি. ভি. রামনের যে কলহ হয়েছিল এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা যায়। ম্যাক্স বর্ন্ একদিকে যেমন তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের দিকপাল, কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের পথিকৃৎদের অন্যতম ছিলেন, তেমনি পরীক্ষাগারেও তিনি বহু গবেষণা করেছেন। বিশেষ করে কেলাস জালকের গতিবিজ্ঞান নিয়ে তাঁর গবেষণা

ছিল সর্বজন স্বীকৃত। 1935-36 সালে বর্ন্ যখন ব্যাঙ্গালোরে আসেন তখন থেকেই এই কলহের শুরু বলা যেতে পারে। রামন মনে করতেন তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানীরা কেবল তাত্ত্বিক হয়েই থাকবেন, পরীক্ষাগারে ঢোকা তাঁদের নিষেধ। বর্ন্ যখন ব্যাঙ্গালোরে এসেছিলেন তখন কেলাস জালক নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। কেলাস জালকীয় গতিবিদ্যা নিয়ে বর্ন্ কয়েকটি বক্তৃতা দেন ব্যাঙ্গালোরে। রামন সেই বক্তৃতাগুলির সবগুলিই আগ্রহী ছাত্রের মত মন দিয়ে শোনেন। তখন রামন কিছু বলেন নি। চল্লিশের দশকে রামন এ নিয়ে একটা তত্ত্ব খাড়া করেন। সে তত্ত্বের গাণিতিক দিকটা তত উন্নত না হওয়ায় তা প্রতিষ্ঠা পায় নি। আগেই বলেছি বর্ন্ এই তত্ত্বকে অত্যন্ত কাঁচা বলে অভিহিত করে একটা চিঠি লিখেছিলেন আইনস্টাইনকে। এতে রামন খুব ক্ষেপে যান ম্যাক্স বর্নের উপর। এরই ফলশ্রুতিতে বর্ন্ ও রামনের মধ্যে মনান্তর বেশ চরমে উঠে 1948 সালে।

1948 সালের এপ্রিলে রামন এবং বর্ন্ দু'জনেই ফ্রান্সের বোর্দোতে রামন প্রভাবের উপর একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত হন। আলোচ্য বিষয় ছিল, 'দি ফিউশন মলিকিউলেয়ার দ্য লা লুমিয়ে লাফেক্ট রামন'। দুজনেরই সেই সভায় সাম্মানিক ডক্টরেট পাওয়ার কথা ছিল। বর্ন্ তখনও নোবেল পুরস্কার পান নি। ল্যাটিস গতিবিদ্যা বা কেলাস গতিবিদ্যা নিয়ে বর্নের সঙ্গে বিতর্কের কথা রামন তখনও ভোলেন নি। তিনি সর্বসমক্ষে বর্ন্‌কে হেয় করে কিছু বলেন। কী বলেছিলেন তা বর্নের লেখা থেকে পাওয়া যায়। বর্ন্ লিখেছেন ঃ

"বোর্দোতে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলো। উনি (রামন) যেসব তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাতে হাত দিচ্ছেন তাঁদের একচোট নিলেন। তখন আমি বললাম — আর যেসব এক্সপেরিমেন্টাল বিজ্ঞানীরা তত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা কি ঠিক করছেন? এতে রামন রেগে অগ্নিশর্মা হন। ভোজসভায় আমার স্ত্রী তাঁর পাশে বসেছিলেন। রামন বলেন আমি নাকি তাঁকে এতো অপমান করেছি যে তিনি উঠে চলে যাবেন। আমার স্ত্রী তাঁকে বহুকষ্টে আটকান। এই মন কষাকষিটা কিন্তু সারা সম্মেলন ধরেই ছিল।"

পরে 1954 সালে বর্ন্ নোবেল পুরস্কার পেলেও রামন এই দম্পতিকে যথা সম্ভব পরিহার করে চলতেন। জার্মানীতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের সভায় এই মনোভাবের কথা ম্যাক্স বর্নের লেখা থেকেই পাওয়া যায়। রামনের সঙ্গে ম্যাক্স বর্নের এই কলহের কারণ হল রামনের নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবণ স্বভাব। রামনের এই স্বভাব তাঁর সারা জীবন ধরেই ছিল। ম্যাক্স বর্ন্ কিন্তু অত্যন্ত সাধাসিধে লোক ছিলেন। বহু গবেষক তাঁর কাছে সাফল্য পেয়েছেন। গবেষকদের গাইড হিসাবে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় এবং অনবদ্য।

অবকলন সমীকরণসমূহের প্রশংসা করে ম্যাক্স বর্ন্ তাঁর Einsten's theory of Relativity বইটিতে লিখেছিলেন ঃ

"The difficulty involved in the proper and adequate means of describing

changes in continuous deformable bodies is the method of differential equastions. ... They express mathematically the physical concept of contiguous action.

অঙ্কই ছিল তাঁর দীর্ঘজীবনের ধ্যানজ্ঞান, তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান ছিল তাঁর দর্শন, কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। সেই ম্যাক্স বর্ন্ দেহত্যাগ করেন 1970 সালের 5ই জানুয়ারী।

কৃষ্ণ-বিকিরণের শক্তিবন্টন সনাতন পদার্থবিদ্যার [Classical Physics] দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। 1900 খ্রিস্টাব্দে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক [Max Planck] 'কণাবাদ'-এর অবতারণা করে কৃষ্ণ-বিকিরণে শক্তিবণ্টন সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হন। 1905 সালে আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত আলোকবৈদ্যুৎ তত্ত্বে [Photo-Electric Effect Theory] এই কণাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। আলোর আপতনে ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গমনের ব্যাখ্যায় তিনি আলোর তরঙ্গ রূপের জায়গায় কণিকা রূপের কল্পনা করলেন।এই ঘটনার পূর্ণ ব্যাখ্যা দিলেন তাঁর তত্ত্বে। আলোর ওই কণিকার নাম দিলেন 'ফোটন' [Photon]। প্ল্যাঙ্ক কণাবাদের জনক হলেও তাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন আইনস্টাইন। আলোর দ্বৈত রূপ প্রতিষ্ঠিত হল বিজ্ঞান জগতে। শুধু আলো নয়, যে কোন বিকিরিত শক্তি গামা-রশ্মি, এক্স-রশ্মি ইত্যাদি সব শক্তিরই দুই রূপ পাওয়া গেল।

1924 সালে আইনস্টাইন লিখলেন : "There are therefore now two theories of light, both indispensable, and - as one must admit today despite twenty years of tremendous effort on the part of theoretical physicists - without any logical connection."

আইনস্টাইন এবং অন্যান্য প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীরা আলোর এই দ্বৈতসত্তা নিয়ে খুবই বিব্রত ছিলেন সে সময়। আইনস্টাইন নিজেও খুব বিব্রত ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানে সম্ভাব্যতা বা 'Chance' ব্যাপারটা এসে পড়ায়। 1924 সালেই নীল্স্ বোর, ক্র্যামারস এবং শ্লেটার প্রশ্ন তুললেন :

(১) শক্তির নিত্যতা কী ভাবে রক্ষিত হয়, যখন কিছু শক্তির পরিবর্তন হয় অবিচ্ছিন্নভাবে, কিছু শক্তির পরিবর্তন হয় বিচ্ছিন্নভাবে বা টুকরো টুকরো ভাবে অর্থাৎ কণারূপে?

(২) একটা ইলেকট্রন কেমন করে জানে কখন বিকিরণ নিঃসৃত করতে হবে?

"(i) How can energy be conserved when some energy changes are continuous and some are discontinuous, i. e. change by quantum amounts ?

(ii) How does the electron know when to emit radiation ?"

নীল্স্ বোরদের প্রশ্ন দুটি অবশ্য যথাযথ ছিল না। আইনস্টাইন নিজে অবশ্য দ্বিতীয় কূটাভাসটি নিয়ে বেশ বিব্রত ছিলেন। এ পর্যন্ত কোয়ান্টাম তত্ত্ব আইনস্টাইনীয় ধারা মেনে সঠিকভাবেই চলছিল। 1924 সালেই নতুন এক ধারার সূত্রপাত ঘটালেন আমাদের আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনিই নতুন কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রথম উদ্গাতা। বোস তাঁর সংখ্যায়নে

ফোটনের বিভিন্ন অবস্থাসমূহের কথা বললেন। তিনি আরও বললেন যে, ফোটনগুলির সংখ্যার সংরক্ষণের কোন দরকার নেই। কণাগুলির পরিসাংখ্যিক স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে, বসু তাঁর তত্ত্বে কণাগুলির কোষে [Cell] অবস্থানের কথা বললেন এবং প্রস্তাবে জানালেন এই কোষগুলির পরিসাংখ্যিক স্বাতন্ত্র্যের কথা। বোসের এই তত্ত্বের সমস্ত প্রস্তাবনাই পরবর্তীকালে একেবারে খাঁটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। বোসের এই সংখ্যায়ন আইনস্টাইনের খুবই ভালো লাগে এবং তিনি এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এটির অনুবাদ করে স্বয়ং এটির প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এর থেকেই আমরা পাই 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন'। নতুন কোয়ান্টাম তত্ত্বের সেই শুরু।

এর কিছুদিন পরে 1924 সালেই বের হল আরেকটি বৈপ্লবিক প্রবন্ধ। সমস্ত শক্তির এই দ্বৈত-ভাবের চিন্তা করেই লুই দ্য ব্রগলি [Louis de Broglie] 1924 খ্রিস্টাব্দে তাঁর বস্তু-তরঙ্গের মতবাদ প্রকাশ করেন। দুটি বস্তুর ভিতরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু একটি বস্তু ও শক্তির ভিতরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি খুব একটা বোধগম্য তখন ছিল না। দ্য ব্রগলি এই ব্যাপারটির পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিলেন বস্তুর তরঙ্গরূপ মতবাদে।

1924 খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর সংখ্যার 'ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন' লুই দ্য ব্রগলি নামের অখ্যাত এক তরুণ বিজ্ঞানীর একটি নিবন্ধ প্রকাশ করল। নিবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য হল বস্তুর তরঙ্গরূপের অস্তিত্ব গাণিতিকভাবে প্রমাণ করা। তিনি লিখলেন, যে কোন বস্তু সেটি গ্রহ, পাথর, ধূলিকণা, কিংবা ইলেকট্রন যাই হোক না কেন, চলন্ত অবস্থায় বস্তুটি হবে কতগুলি তরঙ্গের সমষ্টি। তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গগুলির মত এই বস্তুতরঙ্গগুলিও সম্পূর্ণ শূন্যস্থান দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে, এতে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। তবে এগুলি কোন সাধারণ যান্ত্রিক তরঙ্গ [Mechanical Waves] বা মাধ্যমে উৎপন্ন তরঙ্গ নয়। এই তরঙ্গের কোনও আধান নেই। বস্তুটি গতিতে থাকলেই এই তরঙ্গ উৎপন্ন হবে। তাঁর সূত্র হল, $\lambda = \frac{h}{mv}$, যেখানে, λ হল বস্তুটির তরঙ্গের দৈর্ঘ্য, h হল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, m হল বস্তুটির ভর এবং v হল তার বেগ। সুতরাং m ও v যত বেশি হবে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও তত কম বা ছোট হবে। ব্রগলি তাঁর এই নিবন্ধে বললেন, বস্তু ও শক্তির পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ব্যাপারটি ভালভাবে উপলব্ধি করা যাবে যদি ইলেকট্রনকে কণিকা হিসাবে না ভেবে তাকে তরঙ্গরূপে কল্পনা করা হয়।

1925 সাল ওয়েরনার হাইজেনবার্গ তাঁর 'ম্যাট্রিকস্ বলবিজ্ঞান' [Matrix Mechanics] বা 'কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান' [Quantum Mechanics] সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রকাশ করেন। 1926 সালে আরউইন শ্রোয়েডিঙ্গার তাঁর বিখ্যাত গাণিতিক তত্ত্ব প্রকাশ করেন ব্রগলিকে অনুসরণ করে। এই তত্ত্ব পদার্থবিদ্যায় 'তরঙ্গ বলবিজ্ঞান' [Wave Mechanics] নামে খ্যাত। দেশ বা স্থান [Space] সম্পর্কিত তাঁর তরঙ্গ সমীকরণ হল ঃ

$$\nabla^2\psi + \frac{8\pi^2 m}{h^2}(E - V)\psi = 0$$

আর সময়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাঁর তরঙ্গ সমীকরণটি হল ঃ

$$\frac{ih}{2\pi}\cdot\frac{\delta\psi}{\delta t}=\frac{h^2}{8\pi^2 m}\nabla^2\psi-V\psi$$

এই দুই সমীকরণে,

h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক

m = কণার ভর

E = কণার মোট শক্তি

V = কণার স্থিতি শক্তি

ψ = এইগেন অপেক্ষক [Eigen Function]। এইগেন ফাংশনের অন্য নাম 'তরঙ্গ অপেক্ষক' [Wave Function]। এর মান ঠিক করে x অবস্থানে অবস্থিত কণিকাকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাব্যতা। সাধারণতঃ ψ-কে আমরা 'Wave Function'-ই বলি। ψ-এর মর্মার্থ [Significance] নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানে বেশ কিছু ব্যাখ্যা আছে।

t = সময়

∇^2 = Laplacian Operator অর্থাৎ

$$\nabla^2\psi=\frac{\delta^2\psi}{\delta x^2}+\frac{\delta^2\psi}{\delta y^2}+\frac{\delta^2\psi}{\delta z^2}$$

$i=\sqrt{-1}$, কাল্পনিক রাশি।

প্রথম সমীকরণে অর্থাৎ স্থান সম্পর্কিত তরঙ্গ-সমীকরণে ∇^2, ψ, h, m, E এবং V রয়েছে। আবার দ্বিতীয় সমীকরণে অর্থাৎ সময়-সম্পর্কিত তরঙ্গ-সমীকরণে যোগ হয়েছে t এবং i, কিন্তু বাদ গেছে E। t হল সময় এবং i হল কাল্পনিক রাশি। গাণিতিক পদার্থবিদ্যায় যতরকম 'Differential Equation' আছে তাদের কোনোটাতেই এর আগে 'i' ব্যবহৃত হয় নি। এই প্রথম 'i' এলো 'Differential Equation'-এ যে সমীকরণ গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান সংক্রান্ত।

1926 সালে ম্যাক্স বর্ন্ ওই ψ-এর ব্যাখ্যায় বললেন, ψ^2 কোন বিন্দুতে কণা-ঘনত্ব [Particle Pensity] পরিমাপ করে না, কিন্তু সেই বিন্দুতে কোনও একটি নির্দিষ্ট প্রদত্ত সময়ে কণাটির অবস্থানের সম্ভাব্যতার কথা বলে। কোনও কণাকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা ψ^2-এর মানের সঙ্গে সমানুপাতিক। বর্ন্ বললেন, শক্তি যখন বস্তুর সঙ্গে সংঘাতে আসে তখন শক্তি কণার মতই ব্যবহার করে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে একটি ফোটনকে খুঁজে পেতে হলে আমাদের মেনে নিতে হবে ফোটনের তরঙ্গধর্মিতা। এই খুঁজে পাওয়ার সম্ভাব্যতা ওই তরঙ্গের বিস্তারের বর্গের উপর নির্ভরশীল। ম্যাক্স বর্ন্ বললেন, দ্য ব্রগলির বস্তুর-তরঙ্গ হল সম্ভাব্যতার তরঙ্গ [Waves of Prabability]। আবার

বস্তু-তরঙ্গের কথায় ফিরে আসি।

দ্য ব্রগলির এই নিবন্ধ প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই শ্রোয়েডিঙ্গার প্রকাশ করলেন তাঁর অতি বিখ্যাত গাণিতিক তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানে যা 'তরঙ্গ বলবিজ্ঞান' [Wave Mechanics] নামে বিখ্যাত। দ্য ব্রগলির 'বস্তু-তরঙ্গ' মতবাদের অনুরূপে বস্তুর তরঙ্গের ধারণার সুসঙ্গত গাণিতিক রূপ দিলেন তিনি। এতে এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল, যা দিয়ে প্রোটন ও ইলেকট্রনের উপর তরঙ্গ ধর্ম আরোপ করে কণাঘটিত ব্যাপারের উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। 1927 সালে পরীক্ষাগারে ডেভিসন-জারমার ইলেকট্রনের তরঙ্গরূপ প্রমাণ করলেন। তাঁরা আরো দেখালেন, বাস্তবে ইলেকট্রনের যে তরঙ্গ পাওয়া গেল তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দ্য ব্রগলির সূত্রানুযায়ী পাওয়া তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় এক। সুতরাং বস্তুর কঠিনত্ব আর রইল না, বস্তু থেকে পদার্থ গেল খসে। বিশ্বের রূপ দাঁড়াল তরঙ্গ সমষ্টি। সারা বিশ্বে আলাদা আলাদা পদার্থ বলে আর কিছুই রইল না। সবই এক ধরনের তরঙ্গ সমষ্টি। জগৎ হল তরঙ্গময়। তরঙ্গ ঘনত্ব যেখানে বেশি সেখানে পদার্থ, তরঙ্গ ঘনত্ব যেখানে কম সেখানে শক্তি।

পদার্থবিজ্ঞানে এই সময় দুটি অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি হল। এর একটি কণিকার তরঙ্গ [Waves of Particles] এবং অন্যটি তরঙ্গের কণিকা [Particles of Waves]। এই দুই ধারণার সমন্বয় সাধনে এগিয়ে এলেন হাইজেনবার্গ [Heisenberg] এবং ম্যাক্স বর্ন্ [Max Born]। তাঁরা বললেন, 'কোন পদার্থবিজ্ঞানীর পক্ষে একটি স্বতন্ত্র ইলেকট্রনের গুণাগুণ নিয়ে চিন্তা করবার কোন সার্থকতা নেই; গবেষণাগারে তাঁকে কাজ করতে হয় ইলেকট্রন রশ্মি নিয়ে, যে সব রশ্মিতে থাকে কোটি কোটি ইলেকট্রন, তা সে কণিকা বা তরঙ্গ যেরূপেই থাকুক না কেন, বিজ্ঞানীর কোন অসুবিধা নেই, তাঁকে কাজ করতে হবে বহু সংখ্যক ইলেকট্রন নিয়ে, কখনও একটি কিংবা অল্প কয়েকটি নিয়ে নয়, সে জন্য পরিসংখ্যানের তথা সংখ্যায়নের [Statistics] এবং সম্ভাব্যতার [Probability] নিয়মাবলী মানতে হবে, যা করা হয় গ্যাসের অণুদের ক্ষেত্রে।

"আমাদের অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করতেই হবে। কারণ কোন যন্ত্র দিয়ে, সেটি বাস্তবে সম্ভবপর যত উচ্চশক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র হোক না কেন, কোন একটি ইলেকট্রনের মত ক্ষুদ্র কণিকাকে প্রত্যক্ষ করা যাবে না।"

ম্যাক্স বর্নের ছাত্র ছিলেন হাইজেনবার্গ। 1927 সালে হাইজেনবার্গ দিলেন তাঁর বিখ্যাত 'অনিশ্চয়তা নীতি' [Uncertainty Principle]। তিনি বললেন, কোন একটি কণিকার গতি, অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে তার অবস্থান এবং তার বেগের পরিমাণ বা ভরবেগ একই সঙ্গে সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। পরিমাপ করা যেতে পারে কেবল অবস্থানের এবং বেগের মানের সম্ভাব্যতা। কোন কণিকার অবস্থান যত বেশি সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যাবে, তার বেগের মানের পরিমাপও তত বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। তেমনি, কণিকাটির বেগের মান যত বেশি সঠিকভাবে নির্ণয় করা যাবে, তার অবস্থানের বিষয়টিও তত বেশি অনিশ্চিত হবে। ফলে, কণাজগতের সব পরিমাপেই আমাদের সম্ভাব্যতা এবং অনিশ্চয়তার

উপর নির্ভর করতে হবে। শ্রোয়েডিঙ্গারের গাণিতিকরূপ ব্যবহার করে ম্যাক্স বর্ন্ দেখালেন কণাজগতের এই তরঙ্গ সম্ভাব্যতার তরঙ্গ [Waves of Probablity]। সুতরাং 'বস্তুর তরঙ্গ' হল 'সম্ভাব্যতার তরঙ্গ'। ইলেকট্রন কিংবা পরমাণুকে আমরা কণাও বলতে পারি আবার তরঙ্গও বলতে পারি। এইভাবে বিশ্বকে আমরা তরঙ্গময় কিংবা কণাময় বললে কণাবাদে কোন ভুল বলা হয় না। বিশ্বকে তাই কোন কোন বিজ্ঞানী বলছেন 'Universe of Wavicles'। Wavicles হল Wave এবং Particle-এর মিশ্রণ। যারা বাংলা করা হয়েছে 'তরঙ্গণিকা' অর্থাৎ 'তরঙ্গ' এবং 'কণিকা'র মিশ্রণ। এইভাবে কণা জগতে এলো অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতা এবং কার্য-কারণহীনতা। কিন্তু বর্হিজগতে বজায় আছে পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য এবং কার্য-কারণ সম্পর্ক।

আবারো বলি, কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে ম্যাক্স বর্নের অবদান অসামান্য। পদার্থবিজ্ঞান এখন দাঁড়িয়ে আছে দুটি স্তম্ভের উপর — একটি আপেক্ষিকতাবাদ, অন্যটি কোয়ান্টামবাদ। প্রথমটি সম্পূর্ণভাবে আলবার্ট আইনস্টাইনের মস্তিষ্ক-প্রসূত, আর দ্বিতীয়টির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, কিন্তু সেটির বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে আইনস্টাইনের সুচিন্তিত অবদানে। আবার কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করে কোয়ান্টামবাদকে নতুন করে দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছেন নীল্স্ বোর, সত্যেন্দ্রনাথ, দ্য ব্রগলি, শ্রোয়েডিঙ্গার, ম্যাক্স বর্ন্, হাইজেনবার্গ, ডিরাক প্রমুখ বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীরা।

কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান অনুসারে বিশ্বের গঠনের মূলে রয়েছে একত্ব। ছোট ছোট বস্তুকণার দ্বারা তা ভাগ করা যায় না। বস্তু হল একত্বের সম্পর্কিত সম্ভাবনার জাল। এই সম্ভাবনার জাল কিন্তু স্রষ্টা নিরপেক্ষ নয়। দর্শকই এই সম্ভাবনার জন্য দায়ী। একটি ইলেকট্রনকে আমি কী ভাবে দেখবো তা-ই ইলেকট্রনটির অবস্থা নিরূপণ করবে। অর্থাৎ কোয়ান্টাম-তত্ত্ব এই কথাই বলে যে, আমার মনের বাইরে ইলেকট্রনটির কোন বাস্তব অস্তিত্বই যেন নেই। অনেকটা দেকার্তে যেমন বলেছিলেন কোন দর্শকই নিরপেক্ষ দর্শক হতে পারে না। আপেক্ষিকতাবাদ যেমন বিজ্ঞানের ধারা বদলে দিয়েছে, তেমনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে এই কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এই দুই বিপরীতমুখী তত্ত্ব এক হয়ে গেলে বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবেই হবে। ●

পল ডিরাক

[1902–1982]

বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী পল ডিরাক জন্মেছিলেন 1902 সালের ৪ই আগস্ট ইংল্যান্ডের গ্লস্টারশায়ার [Gloucestershire] শহরে। তাঁর পুরো নাম পল অ্যাড্রিয়েন মরিস ডিরাক [Paul Adrien Maurice Dirac]। তাঁর বাবা ছিলেন চার্লস অ্যাড্রিয়েন ল্যাডিসলাস ডিরাক [Charles Adrien Ladislas Dirac]। তাঁর মায়ের নাম ফ্লোরেন্স হান্নাহ্ হোলটেন [Florence Hannah Holten]। চার্লস ডিরাক ছিলেন সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী। তিনি জন্মেছিলেন বালাইসের [Valais] মোন্থে [Monthey] শহরে। তাঁর মায়েরা ছিলেন ইংল্যান্ডের কর্নওয়াল [Cornwall] শহরের বাসিন্দা। চার্লস পড়াশুনা করেছিলেন জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁরা ইংল্যান্ডে আসেন 1888 সাল নাগাদ। ব্রিস্টলে এসে চার্লস ফরাসী শিখলেন। এখানেই তাঁর দেখা হয় ফ্লোরেন্স-এর সঙ্গে। ফ্লোরেন্সের বাবা সে সময় ব্রিস্টলেই বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন এক জাহাজের মাস্টার মেরিনার [Master Mariner]। এই জাহাজটি ব্রিস্টলের জাহাজ হওয়ায় তিনি এখানেই থাকতেন। তাই ফ্লোরেন্সও ব্রিস্টলে থাকতেন। তিনি কাজ করতেন ব্রিস্টলের এক পাঠাগারে। চার্লস এবং ফ্লোরেন্সের বিয়ে হয় 1899 খ্রিস্টাব্দে। বিয়ের পর তাঁরা বিশপস্টোনের [Bishopston] একটা বাড়ীতে বাস করতে থাকেন। ব্রিস্টলের বিশপস্টোনের এই বাড়ীটার নাম তাঁরা 'মোন্থে' রাখেন, যেহেতু সুইজারল্যাণ্ডের মোন্থে শহরে চার্লস জন্মেছিলেন। মোন্থে শহরের স্মৃতি মনে রাখতেই ব্রিস্টলের এই বাড়ীটির এমন নাম রাখা হয়। এই সময় চার্লস একটা মাধ্যমিক স্কুলে ফরাসী পড়াতেন। এই স্কুলটা ছিল ব্রিস্টলের ম্যার্চেন্ট ভেনচারার্স টেকনিক্যাল কলেজের [Merchant Venturers Technical College] অধীন।

পল ডিরাকরা দুই ভাই। তাঁর বড় ভাইয়ের নাম রেজিন্যাল্ড চার্লস ফেলিক্স ডিরাক [Reginald Charles Felix Dirac]। তাঁর ছোট বোনের নাম বিয়াত্রিস ইসাবেলা মার্গেরাইট ওয়াল্লা ডিরাক [Beatrice Isabelle Marguerite Walla Dirac]। পলের পরিবারে বেশ কিছু অনুশাসন মেনে চলা হত। যেমন, চার্লস ঠিক করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর পরিবারে খাওয়ার টেবিলে বসে কেবল ফরাসীতেই কথা বলতে হবে। ফলে, একমাত্র পলই বাবার সঙ্গে ডিনার টেবিলে বসে খাওয়া-দাওয়া করতে পারতেন। চার্লস খুব কড়া ধাতের মানুষ হওয়ায় ছেলেমেয়েরা বেশ কিছুটা অসুখীই ছিলেন তাঁদের ছোটবেলায়। পলের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক অবশ্য এতটা খারাপ ছিল না। তবে কড়া অনুশাসনে মানুষ হওয়া পলেরা অবশ্য ছেলেবেলায় নিজেদের অসুখীই ভাবতেন।

পল প্রথমে ভর্তি হন বিশপ প্রাইমারি স্কুলে। এখানে তিনি অঙ্কে তাঁর স্বাভাবিক ব্যুৎপত্তি

দেখাতে থাকেন। শিক্ষকরা দেখলেন, তাঁদের এই ছাত্রটি অঙ্কে অত্যন্ত ভালো। বারো বছর বয়েস পল ভর্তি হন মাধ্যমিক স্কুলে। এই স্কুলেরই শিক্ষক ছিলেন পলের বাবা চার্লস ডিরাক। আগেই বলা হয়েছে, এই বিদ্যালয়টি ছিল মার্চেন্ট ভেনচারার্স টেকনিক্যাল কলেজের অধীন। পল যখন স্কুলে পড়াশুনা করছিলেন তখন প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হয়। এতে পলের বেশ সুবিধাই হয়েছিল। স্কুলের বয়স্ক ছাত্রদের যুদ্ধে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক হওয়ায়, পলের মত কমবয়েসি ছাত্ররা বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারগুলি অনেক বেশি সময় ধরে ব্যবহার করার সুযোগ পান। স্কুলের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও কমবয়েসি এই সব ছাত্ররা অনেক বেশি মাত্রায় ভোগ করার সুবিধা পান। পল ডিরাক নিজেই লিখেছেন ঃ

"The Merchant Venturers was an excellent school for science and modern languages. There was no Latin or Greek, something of which I was rather glad, because I did not appreciate the value of old cultures. I consider myself very lucky in having been able to attend the school. ... I was rushed through the lower forms, and was introduced at an especially early age to the basis of mathematics, physics and chemistry in the higher forms. In mathematics I was studying from books which mostly were ahead of the rest of the class. This rapid advancement was a great help to me in my latter career."

পল ডিরাক খুব কম বয়সেই উঁচু ক্লাশের গণিত, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন পড়ে ফেলতে পেরেছিলেন যুদ্ধের কল্যাণে। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধই পল ডিরাককে দ্রুত বিজ্ঞানের জ্ঞান সঞ্চয়ের সুযোগ করে দেয়। অতি অল্প বয়সেই পল ডিরাক বিজ্ঞানের মুখ্য তিনটি শাখায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। পরবর্তীকালে পলের বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী হওয়ার পিছনে এই শক্ত ভিত্তিভূমি অতি দ্রুত তৈরি হওয়াটাও বেশ কিছুটা অবদান যুগিয়েছে।

1918 সলে পলের স্কুলের পড়াশুনা শেষ হয়। এরপর তিনি ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। এই সময় মার্চেন্ট ভেঞ্চারার্স টেকনিক্যাল কলেজ ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ফলে, পল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সময় একই বিদ্যালয় ভবনেই ক্লাশ করতেন। পলের সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল গণিত। কিন্তু তিনি গণিত নিয়ে পড়াশুনা করে ভবিষ্যতে গণিতের অধ্যাপক হতে চান নি। গণিত নিয়ে পড়াশুনা করলে গণিতের অধ্যাপক হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না বলেই তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে যান। অধ্যাপনাটা তাঁর তেমন পছন্দের ছিল না সে সময়। 1921 সালে তিনি ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে ডিগ্রী লাভ করেন।

ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার পর তিনি কোন পাকা চাকুরি পেলেন না। কয়েকটি পার্ট-টাইম কাজ করার পর তাঁর মনে হল তিনি গণিত নিয়ে পড়াশুনা করবেন। দরখাস্ত করলেন কেম্ব্রিজে গণিত নিয়ে অধ্যয়ন করার। কিন্তু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কিছু অদ্ভুত কারণ দেখিয়ে তাঁর দরখাস্ত নামঞ্জুর করে দেয়। এরপর 1921 সালের জুন মাসে তিনি কেম্ব্রিজের স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য পরীক্ষা দেন। এবার তিনি স্কলারশিপ পান। কেম্ব্রিজের সেন্ট জনস্ কলেজে তাঁর পড়বার ব্যবস্থা হয়। ওখানে থেকে পড়াশুনার জন্য এই স্কলারশিপের টাকা যথেষ্ট ছিল না। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে অর্থ সাহায্য করতে রাজী হলেন না এই যুক্তিতে যে, পলের বাবা বহুদিন ধরে বৃটিশ নাগরিক হন নি। এই টানাপোড়েনের সময়

ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বিনা বেতনে গণিত পড়ানোর ব্যবস্থা করে দেয়। ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 1923 সালে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ্ গণিতের ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি অনুদান পান কেম্ব্রিজে গবেষণা করার জন্য। 1923 সালেই পল ডিরাক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা শুরু করেন।

ডিরাক চেয়েছিলেন আপেক্ষিকতাবাদের উপর গবেষণা করবেন ইবেনেজার কানিংহ্যামের [Ebenezer Cunningham] অধীনে। কিন্তু কানিংহ্যামের অধীনে তখন বেশ কয়েকজন গবেষক ছাত্র কাজ করছিলেন। ফলে, পলের জায়গা হল না কানিংহ্যামের অধীনে। তাই তিনি গবেষণা শুরু করলেন ফাউলারের [Prof. Ralph H. Fowler] অধীনে। পল ডিরাকের জীবনীকাররা লিখেছেন ঃ

"Flowler was then the leading theoretician in Cambridge, well versed in the quantum theory of atoms; his own research was mostly on statistical mechanics. He recognised in Dirac a student of unusual ability. Under his influence Dirac worked on some problems in statistical mechanics. Within six months of arriving in Cambridge he wrote two papers on these problems. No doubt Fowler aroused his interest in the quantum theory, and in May 1924 Dirac completed his first paper dealing with quantum problems. Four more papers were completed by November 1925."

কেম্ব্রিজে যোগ দেওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ডিরাক দুটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন পরিসাংখ্যিক বলবিজ্ঞানের সমস্যা নিয়ে। ফাউলার ডিরাকের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের গবেষণায়। 1924 সালের মে মাসে ডিরাক কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন ফাউলারের উৎসাহে। 1925 সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে তিনি কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর আরও চারটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন।

এই সময় হঠাৎই তাঁর বড় ভাই আত্মহত্যা করেন। এই আত্মহত্যার কোনও কারণ পাওয়া গেল না। মনে করা হল, বাবার কঠোর অনুশাসনই এই আত্মহত্যার জন্য দায়ী। এ নিয়ে ডিরাকের সঙ্গে তাঁর বাবার মনোমালিন্য হয়। দাদার মৃত্যুর শোক, পিতার সঙ্গে কলহ, সব মিলিয়ে ডিরাক এই সময় মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত ছিলেন। তবে এ সময় আনন্দের ব্যাপারটা হল, কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর তাঁর প্রকাশিত গবেষণাপত্রগুলি উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। গবেষক ছাত্র হিসাবে তাঁর এই সাফল্য ছিল আনন্দের। ভাইয়ের মৃত্যু, পিতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের দুঃখে ওই গবেষণার সাফল্যই ছিল আনন্দের প্রলেপ।

ডিরাকের গবেষণার শুরুটা খুবই ভাল ছিল। পরবর্তীকালে আরো উন্নততর গবেষণাপত্র বের করেছেন তিনি। 1925 সালে হাইজেনবার্গ তাঁর 'ম্যাট্রিক্স বলবিজ্ঞান' [Matrix Mechanics] প্রকাশ করেন। হাইজেনবার্গের দিক্‌পরিবর্তকগুলির [Commutators] বীজগণিতীয় গুণাবলীর [Algebraic Properties] বৈশিষ্ট্য ডিরাককে খুবই আকর্ষণ করে। তিনি বুঝেছিলেন হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি হল কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণীয়গুলির ক্রমবিনিময়হীনতার [Non-commutativity] বিবরণ। এর সঙ্গে তিনি তুল্যতা খুঁজে পান হ্যামিল্টনীয় বলবিজ্ঞানের [Hamiltonian Mechanics] পয়সন

ব্র্যাকেটগুলির [Paisson Brackets] সঙ্গে। তাঁর জীবনীকার হিগ্স [Higgs] লিখেছেন ঃ

"This similarity provided the clue which led him to formulate for the first time a mathematically consistent general theory of quantum mechanics in correspondence with Hamiltonian mechanics."

ডিরাক তাঁর এই চিন্তাগুলির গাণিতিকরূপ প্রকাশ করলেন 'Quantum Mechanics' নামের গবেষণাপত্রটিতে। এই গবেষণাপত্রটিই হল তাঁর পি. এইচ. ডি.-র গবেষণাপত্র। 1926 সলে ডিরাক পি. এইচ. ডি. [Ph. D] ডিগ্রী লাভ করেন। এই গবেষণাপত্রটি পেশ করার আগে ডিরাকের মোট এগারোটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করার পর ডিরাক কোপেনহেগেনে নীল্স্ বোরের কাছে যান তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য। 1929 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি গটিংগেনে আসেন রবার্ট ওপেনহাইমার [Robert Oppenheimer], ম্যাক্স বর্ন্, জেমস ফ্র্যাঙ্ক [James Franck] এবং ইগর টাম [Igor Tamm] প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য। এই সময় এহ্‌রেনফেস্ট [Ehrenfest] ডিরাককে আমন্ত্রণ জানান তাঁদের বাড়ীতে আসবার এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য। ডিরাক এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কেম্ব্রিজ ফেরার পথে কয়েক সপ্তাহ লাইডেনে [Leiden] কাটান অধ্যাপক এহ্‌রেনফেস্টের সঙ্গে। 1927 সালে ডিরাক সেন্ট জনস্ কলেজের 'ফেলো' [Fellow] নির্বাচিত হন।

1928 সালে ডিরাক কোয়ান্টামবাদকে আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে গাণিতিক সূত্রে বিপরীত ইলেকট্রন বা পরা-ইলেকট্রন [Anti-electron] আবিষ্কার করে ফেলেন। ধনাত্মক আধান-যুক্ত ইলেকট্রনের ভর-বিশিষ্ট এই কণিকার নাম দেওয়া হয় 'পজিট্রন [Positron]। পরে তা পরীক্ষাগারেও আবিষ্কৃত হল। ওই সময়ই তিনি তাঁর বিখ্যাত আধা-চক্রণ [$^1/_2$-Spin] সমীকরণ আবিষ্কার করেন। এই সমীকরণ 'Half-spin Dirac Equation' নামে বিখ্যাত। 'বোস-আইনস্টাইন' সংখ্যায়ন যেমন পূর্ণ-চক্রণ-যুক্ত ফোটন বা কণাদের কথা বলে, তেমনি আধা-চক্রণযুক্ত কণাদের কথা বলে ডিরাক সমীকরণ, যা 'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন' নামে বিখ্যাত।

এনরিকো ফের্মি ও পি এম ডিরাক দুজনে পৃথকভাবে একই ধরনের কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের প্রস্তাব দেন। এই সংখ্যায়নকে বলা হয় 'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন', যাকে সংক্ষেপে বলা হয় 'ফের্মি সংখ্যায়ন'। ডিরাক এবং ফের্মি আলাদাভাবেই এই সংখ্যায়নের আবিষ্কর্তা। ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা একটু পরেই করা হচ্ছে। 'বোস-আইনস্টাইন' সংখ্যায়নের সঙ্গে 'ফের্মি-ডিরাক' সংখ্যায়নের পার্থক্য নিয়েও আলোচনা করা হবে কিছুটা পরেই। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' এখন 'বোস সংখ্যায়ন' এবং 'ফের্মি ডিরাক সংখ্যায়ন' এখন 'ফের্মি সংখ্যায়ন' নামে পরিচিত।

1928 সালে ডিরাক রাশিয়ায় আমন্ত্রিত হন এবং সেখানে বক্তৃতা দিতে যান। শুধু 1928 সালেই নয়, তিনি রাশিযা ভ্রমণ করেন 1929, 1930, 1932, 1933, 1935, 1936, 1937, 1957, 1965, 1973 এবং 1957 সালগুলিতে। অর্থাৎ তিনি মোট 12 (বারো) বার সোভিয়েত



যৌবনে ডিরাক [1902-1982]



বার্ধক্যে ডিরাক [1902-1982]

ইউনিয়ন পরিক্রমা করেন। 1929 সালে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যান। সেই তাঁর প্রথম আমেরিকা যাওয়া। সেবার তিনি হাইজেনবার্গের সঙ্গে উইসকনসিন এবং মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতার মূল বিষয়ই ছিল নতুন কোয়ান্টাম তত্ত্ব। হাইজেনবার্গকে সঙ্গে নিয়েই তিনি জাপান যান এবং সেখানেও বক্তৃতা দেন। জাপান থেকে তিনি 'ট্রানস-সাইবেরিয়ান' রেলপথে ফিরে আসেন মস্কো হয়ে।

1930 সালে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত বই 'The Principles of Quantum Mechanics'। বইটির সারবত্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"Dirac was not influenced by the feeding frenzy in experimental phenomenology of the time. This has given Dirac's book...a lasting quality that few works can match."

বইটির সম্পর্কে এও বলা হয়, বইটি '...reflects Dirac's very characteristic approach : abstract but simple, always selecting the important points and arguing with unbeatable logic.'

1930 সালের ওই বইটিতে ডিরাক ".... developed the so-called transformation theory of quantum mechanics that furnished a machinery for calculating the statistical distribution of certian variables when others are specified. He also stated his philosophical position with respect to theoretical physics. The fundamental laws of nature, he worte, 'control a substratum of which we cannot form a mental picture without introducing irrelevancies.' In his own work Dirac avoided using any pictorial model or mental picture of the phenomena described by his mathematical symbols."

1933 সালের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ডিরাককে তাঁর ওই বিখ্যাত বইটির জন্য। 'The Principles of Quantum Mechanics' বইটি কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে কতকগুলি বৈপ্লবিক তত্ত্ব সংযোজিত করে। ডিরাক চারটি তরঙ্গ-অপেক্ষকের [Wave Functions] সাহায্যে যে চারটি তরঙ্গ-সমীকরণ বের করেন, আপেক্ষকীয় প্রভাব সমন্বিত হওয়ায় সেগুলির সাহায্যে ইলেকট্রনের গতি, চক্রণ, চৌম্বকীয় এবং অন্যান্য গুণাবলী একেবারে সঠিকভাবে বলে দেওয়া সম্ভব হয়। 1930 সালে মাত্র 28 বছর বয়সে ডিরাক রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন বলেই এতো অল্প বয়সে তিনি ওই বিরল সম্মান অর্জন করেন। 1933 সালে তিনি যখন নোবেল পুরস্কার পান তখন তাঁর বয়স মাত্র 31 বছর।

1932 সালে ডিরাক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লুকাসিয়ান অধ্যাপক [Lucasian Professor] পদে নিযুক্ত হন। এই অধ্যাপক পদটি ছিল অঙ্কের অধ্যাপকের পদ। 1933 সালে তিনি লাগ্রাংগীয় কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের উপর একটি মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণাপত্রের উপর নির্ভর করে ফেইনম্যান [Feynman] পরবর্তীকালে 'Path Integral'-এর মতবাদ গড়ে তোলেন। ওই বছর অর্থাৎ ওই 1933 সালেই শ্রোয়েডিঙ্গারের সঙ্গে একযোগে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পান ডিরাক। তিনি আত্মপ্রচার বিমুখ ছিলেন। প্রথমে তিনি নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করবেন বলে ঠিক করেন। কারণ নোবেল

পুরস্কার পেলে তিনি বিখ্যাত হয়ে পড়বেন। এটা তিনি মনে-প্রাণে চাইতেন না। পরে তাঁকে বোঝানো হয় যে, নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেও তিনি অনেক বেশি বিখ্যাত হয়ে যাবেন। তাঁর প্রচারবিমুখতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এরপর তিনি নোবেল পুরস্কার নিতে স্বীকৃত হন। পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসেন। বন্ধুরা তাঁকে স্টকহোমের পুরস্কার বিতরণী সভায় মা-বাবাকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে বলেন। ডিরাক তখনও বাবার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই ওই সভায় আসার জন্য তিনি কেবল তাঁর মাকেই আমন্ত্রণ জানান। বাবাকে ডাক পাঠান নি ওই মহতী সভায় যোগ দেওয়ার জন্য। ডিরাক এবং শ্রোয়েডিঙ্গারকে একসঙ্গে 1933 সালের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। 1932 সালে হাইজেনবার্গকে এবং পরের বছর এঁদের দুজনকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে নোবেল কমিটি কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান এবং অনিশ্চয়তা নীতি—দুটিকেই বিজ্ঞান জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

1934-35 সালটি ডিরাকের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বছর তিনি প্রিন্সটনের 'ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজ'-এ যান বক্তৃতা দিতে। এখানে উইগনারের [Wigner] সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়। ডিরাক যখন ওখানে ছিলেন সেই সময় উইগনারের বোন মারগিট [Margit] ভাইয়ের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন। মারগিট তখন বিবাহ-বিচ্ছিন্না এবং দুই সন্তানের জননী। মারগিটের সঙ্গে ডিরাকের আলাপ হয় ওই প্রিন্সটনেই। দু'জনেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। মারগিটরা থাকতেন বুদাপেস্টে। পরে 1937 সালের জানুয়ারী মাসে ডিরাক মারগিটকে বিয়ে করেন লন্ডনে। মারগিটের দুই সন্তানকে ডিরাক দত্তক হিসাবে গ্রহণ করেন। এই শিশু দুটির নাম ছিল জুডিথ [Judith] এবং গ্যাব্রিয়েল অ্যানড্রু [Gabriel Andrew]। দত্তক নেওয়ার পর তাঁদের নামের সঙ্গে ডিরাক পদবী যুক্ত হয়। গ্যাব্রিয়েল অ্যান্ড্রু ডিরাক পরবর্তীকালে বিশুদ্ধ গণিতের বিখ্যাত অধ্যাপক হয়েছিলেন। গ্রাফ-তত্ত্ব নিয়ে তাঁর মূল্যবান গবেষণা-পত্র রয়েছে। ডেনমার্কের আরহাস [Aarhus] বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক হয়েছিলেন ডিরাকের এই সৎ-পুত্র গ্যাব্রিয়েল অ্যানড্রু ডিরাক।

1937 সালে ডিরাক বিয়ে করলেন। ওই বছরই তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় বিশাল সংখ্যা এবং মহাকাশের বস্তুদের নিয়ে। তিনি সনাতন ইলেকট্রন তত্ত্ব [Classical Electron Theory] নিয়ে তাঁর বিখ্যাত গবেষণাপত্রটিও 1938 সালে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ডিরাক ইউরেনিয়াম বিভাজন এবং পারমাণবিক অস্ত্রের নির্মাণ নিয়ে কাজ করেন। বার্মিংহামে পারমাণবিক শক্তির উপর একদল বিজ্ঞানী কাজ করছিলেন সে সময়। ডিরাক সেই দলে ছিলেন। এই সময় বৃটিশ সরকার তাঁকে সোভিয়েত দেশে যেতে বাধা দেয়। 1957 সালের আগে ডিরাককে আর সোভিয়েত দেশে যাওয়ার অনুমতি দেওযা হয় নি। পরে অবশ্য 1957, 1965 এবং 1973 সালগুলিতে তিনি সোভিয়েত দেশে যাওযার অনুমতি পান।

আগেই বলেছি, ডিরাক 1930 সালে রয়েল সোসাইটি সদস্য [F.R.S] নির্বাচিত হন। 1939 সালে তাঁকে রয়্যাল সোসাইটির পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। আর তাঁকে সোসাইটির

কপ্‌লে পদক [Copley Medal] দেওয়া হয় 1952 খ্রিস্টাব্দে।

কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের একটি কণার অপেক্ষীয় গতিবিদ্যার উপর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্য ডিরাককে 1952 সালে কপ্‌লে পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। 1968 সালে ডিরাক কেম্ব্রিজের অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর নেওয়ার পর তিনি সপরিবারে চলে যান ফ্লোরিডায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই জায়গাটি তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। এখানে এসে তিনি মিয়ামি এবং ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসাবে কাজ করতে থাকেন। 1971 সালে তিনি ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি তাঁর গবেষণাও চালিয়ে যান অধ্যাপনার সঙ্গে। 1973 এবং 1975 সালে ডিরাক লেলিনগ্রাদের ফিজিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউট-এ কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এইসব বক্তৃতায় বিশ্বতত্ত্বের [Cosmology] সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই সমস্যা হল বিশ্বের ধ্রুবকসমূহের অমাত্রিক [Non-dimensional] সমবায়গুলির সমস্যা।

ডিরাক পদার্থবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে তিনি গাণিতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত করে উপস্থাপিত করতেন। ডিরাক কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির সঙ্গে আপেক্ষিকতাবাদ একীভূত করতে চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়াও চৌম্বকীয় একমেরু [Magnetic Monopole], মৌলিক দৈর্ঘ্য, পরাপদার্থ [Antimatter], d-অপেক্ষক [d-function], Bra-kets ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গাণিতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত গবেষণাগুলি আজও পদার্থবিজ্ঞানে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ডিরাক সম্পর্কে নানা মজার গল্প প্রচলিত আছে। এগুলি ঠিক গল্প নয় সত্য ঘটনাই। একবার এক ভোজসভায় ডিরাকের প্রশংসা করে একজন তাঁর আবিষ্কারগুলিকে গর্বের [Windy] বলে উল্লেখ করলেন। ডিরাক প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভোজসভা গৃহের দরজায় এসে বাইরের অবস্থাটা দেখে ফিরে গিয়ে বললেন, 'Indeed it is windy'। চন্দ্রশেখর-সীমার আবিষ্কর্তা সুব্রাহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখর তখন কেম্ব্রিজে গবেষক। তিনি একবার যখন তাঁর চিন্তাভাবনাগুলি ডিরাককে বোঝাচ্ছিলেন, তখন ডিরাক বারে বারেই 'Yes' বলে যাচ্ছিলেন। পরে তিনি চন্দ্রশেখরকে বুঝিয়ে বললেন যে, তাঁর 'Yes' মানে তিনি চন্দ্রশেখরের কথা মেনে নিচ্ছেন তা নয়; তিনি তাঁকে তাঁর বক্তব্য ধারাবাহিকভাবে বিরতি না দিয়ে বলে যেতে বলছেন মাত্র। ডিরাক বেশির ভাগ সময়ই হয় 'Yes' নয় 'No' কিংবা 'I don't know' বলতেন। এমনিতে তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। একবার তিনি এ সম্পর্কে বলেছিলেন, "I was taught at school never to start a sentence without knowing the end of it." এটাই বলে দেয় কেন তিনি মিতভাষী ছিলেন। কিন্তু তাঁর বই এবং গবেষণাপত্রের ভাষা ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং সুগঠিত।

গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের মাঝামাঝি ডিরাক কলকাতায় আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতাও দেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ডিরাক তাঁর এক বক্তৃতায় তিনি সত্যেন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করার সময় বারে বারে তাঁকে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী বলে আখ্যাত করছিলেন। পরে তাঁর খেয়াল হয় যে, সত্যেন্দ্রনাথ

নোবেল পুরস্কার পান নি। এরপর তিনি লন্ডনের রয়েল সোসাইটির সভাপতি হলেন। সেখানের সভ্যদের তালিক থেকে দেখলেন যে, সতেন্দ্রনাথ তখনও রযেল সোসাইটির সভ্যই [FRS] নির্বাচিত হন নি। বিস্মিত ডিরাক তাঁকে FRS করার ব্যবস্থা করেন। 1958 সালে সত্যেন্দ্রনাথ FRS হন।

এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়ে লন্ডন যান। ডিরাক তাঁকে প্রস্তাব দেন যে, নোবেল পুরস্কারের পদার্থবিজ্ঞান কমিটিতে তিনি আছেন এবং যাঁরা ওই কমিটিতে আছেন তাঁরা সবাই ডিরাকের বন্ধুস্থানীয়। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথ যদি অন্ততঃ দুজনকে অনুরোধ করেন তাঁর নাম প্রস্তাব করার জন্য তা হলে তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া আদৌ কঠিন হবে না। সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য ডিরাকের এই প্রস্তাব শুনে হেসেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'পুরস্কার পাওয়ার লোভে নিজের জন্য 'ক্যানভাস' [Canvass] করতে রাজী নই। যা পেয়েছি তাতেই আমি সন্তুষ্ট।'

ডিরাক সারা জীবনে বহু সম্মান লাভ করেছেন। এদের কয়েকটির কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি সাম্মানিক ডিগ্রী নিতে চান নি একেবারেই। যাঁরা বা যে প্রতিষ্ঠান তাঁকে সাম্মানিক ডিগ্রী দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা সবাই প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। তবে তিনি বিভিন্ন অ্যাকাডেমি এবং সোসাইটির সম্মানীয় সদস্য-পদ গ্রহণে আপত্তি করেন নি। তিনি যে সব অ্যাকাডেমি এবং সোসাইটির সম্মানীয় সদস্য-পদ গ্রহণ করেছিলেন তার তালিকা দীর্ঘ। তাদের কয়েকটি হল ঃ

(1) ইউ এস এস আর অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস [1931], (2) ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস [1939], (3) চাইনিজ ফিজিক্যাল সোসাইটি [1943], (4) রয়েল আইরিশ অ্যাকাডেমি [1944], (5) রয়্যাল সোসাইটি অফ এডিনবরা [1946], (6) ইনস্টিটিউট দ্য ফান্স [1946], (7) ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া [1947], (8) আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি [1948], (9) ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস [1949], (10) ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস [1950], (11) অ্যাকাডেমিয়া দেল্লে সায়েঞ্জে ডি টোরিনো [1951], (12) অ্যাকাডেমিয়া ন্যাজিওন্যাল ডেই লিনসেই রোম [1960], (13) রয়েল ড্যানিশ অ্যাকাডেমি [1962] (14) অ্যাকাডেমিয়ে ডেস সায়েন্সেস প্যারিস [1963] ইত্যাদি। 1973 সালে তাঁকে 'Order of Merit'-এ ভূষিত করা হয়।

ডিরাক 1984 সালে 20 শে অক্টোবর মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 82 বছর। দীর্ঘ 82 বছরের জীবন জুড়ে পদার্থবিজ্ঞান তথা কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানকে তিনি নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। 1968 সালে তিনি অবসর নেন। আগেই বলেছি, 1932 সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের লুকাসিয়ান [Lucasian] অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। প্রায় 36 বছর ওই পদে আসীন থাকার পর 1968 সালে তিনি অবসর নেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন স্টিফেন ডব্লিউ হকিং [Stephen W. Hawking]। উল্লেখযোগ্য যে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের এই লুকাসিয়ান অধ্যাপকের পদটি এক সময় অলঙ্কৃত করেছিলেন স্যার আইজাক নিউটন স্বয়ং। ডিরাককে সমাহিত করা হয় ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে-তে [Westminister Abbey]।

1985 সালের 19 শে এপ্রিল ডিরাকের এক বিশাল স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বহুবিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণাপত্র পাঠ করেন। এই গবেষণাপত্রগুলি একত্র করে একটি স্মরণিকা ছাপা হয় 'Tributes to Paul Dirac' নাম দিয়ে। এটি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে 1985 সালে এবং ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় ছাপায় 1987 খ্রিস্টাব্দে। এই সংখ্যার আলোচনায় ডিরাক সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

"...we vividly see everywhere the brilliant imprints of Dirac, unifier of quantum mechanics and relativity theory. Each of the pieces not only is in praise of an exceptionally gifted intellect but also places on record how deeply and abidingly the human mind can delve into the realms of mathematical insight and modelling, keeping intact the spirit of beauty and clarity of a creative genius. Only a few Nobel laureates ever can compare as well with this giant of mathematical sciences in whose demise the world of original thinking certainly has lost one of the most precious souls retaining fortunately still the glory for others to sing and emulate for a long time to come."

1995 সালের নভেম্বরে ডিরাকের স্মৃতিতে এক প্রস্তর ফলক স্থাপন করা হয় ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে-তে। এই স্মৃতি সভায় মুখ্য ভাষণ দেন তাঁরই উত্তরসূরি স্টিফেন হকিং। এই উপলক্ষ্যে পল ডিরাক গ্রন্থাবলীর অষ্টম খণ্ড, যাতে রয়েছে তাঁর বক্তৃতা সমূহ, উপহার দেওয়া হয় রয়্যাল সোসাইটিকে। 'The Principles of Quantum Mechanics' ছাড়া তিনি অন্যান্য যে সব বই লিখেছেন তাদের মধ্যে বিখ্যাত হল ঃ Lectures on Quantum Mechanics [1966], The Devolopment of Quantum Theory [1971], Spinors in Hilbert Space [1974] এবং General Theory of Relativity [1975]।

ডিরাকের কথা শেষ করি ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়নের কথা দিয়ে। এনরিকো ফের্মি এবং পল ডিরাক আলাদাভাবে এই সংখ্যায়ন আবিষ্কার করেন। ডিরাকের এই সংখ্যায়নের কথায় একটু গোড়ার দিক থেকে আসা।

আগেই বলেছি আবারও বলি, 1900 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষের দিকে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক [Max Planck] তাঁর বিখ্যাত কণাবাদ বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব [Quantum Theory] প্রকাশ করলেন। এই কোয়ান্টাম তত্ত্বকে ভিত্তি করে আজকের কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান [Quantum Mechanics] গড়ে উঠেছে। প্ল্যাঙ্ক তাঁর ওই তত্ত্ব যে গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন তাকেই বলা হয় 'প্ল্যাঙ্কের সূত্র' [Planck's Formula]। এই সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্ল্যাঙ্ক বিকিরণের শোষণ ও উৎসারণ [Emission] সম্পর্কে নতুন ধারণার কথা বললেন। তিনি বললেন যে, শক্তির দেওয়া-নেওয়া অর্থাৎ শোষণ-বিকিরণ অবিরত ও অবিচ্ছিন্নভাবে হয় না; হয় ঝাঁকে ঝাঁকে [By Jerks] অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড ভাবে [Discontinuously] বা কণা-ভাবে। তিনি বললেন, কোনও তরঙ্গের শক্তি কখনও ন্যূনতম একটি সংখ্যার চেয়ে কম হতে পারে না। এই ন্যূনতম সংখ্যাটিকে বলা হল বিকীর্ণ শক্তির কণাতম বা কোয়ান্টাম [Quantum]। প্ল্যাঙ্ক আরও বললেন, এই ন্যূনতম কণার শক্তি 'E' হলে, $E = h\upsilon$ হবে, যেখানে υ হল ওই শক্তি তরঙ্গের কম্পাঙ্ক [Frequency] এবং h হল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক [Planck's Constant]। প্ল্যাঙ্কের এই যুগান্তকারী মতবাদ থেকেই আইনস্টাইন

1905 সালে আলোক-বৈদ্যুৎ ক্রিয়া [Photoelectric Effect] সম্পর্কে সব প্রশ্নের মীমাংসা করে এই সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্ব খাড়া করেন। প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টামবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় আইনস্টাইনের 'আলোক-বৈদ্যুৎ তত্ত্বে' [Photoelectric Theory]। আইনস্টাইন বললেন, শক্তির আসা-যাওয়াটাও হয় কোয়ান্টাম আকারে। আলোক শক্তি শুধু খণ্ড খণ্ড ভাবে নির্গত [Emitted] কিংবা শোষিত [Absorbed] হয় তাই নয়, নির্গমন ও শোষণ এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তীকালে অর্থাৎ প্রবহমান অবস্থায়ও আলো খণ্ড খণ্ড অবিভাজ্য শক্তি-টুকরোর সমষ্টি। কিছুদিন পরে তিনি এই টুকরোগুলির নাম দেন 'ফোটন' [Photon]। ফোটন হল শক্তির মূল কণা এবং আলো কিংবা যে কোন বিকীর্ণ শক্তি হল ঝাঁক ঝাঁক ফোটনের সমষ্টি।

1913 সলে নীল্‌স্‌ বোর কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। অণু-পরমাণুর গঠনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেখানেও তিনি কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিচ্ছিন্নতার ধারণার যে প্রয়োজন আছে তা প্রতিপন্ন করেন। এভাবে ধীরে ধীরে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সর্বজনীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। যেখানেই শক্তির আদান-প্রদান বা প্রবাহ সেখানেই বিচ্ছিন্নতা, অর্থাৎ কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা। এই ধারণা শেষ পর্যন্ত মূলত আইনস্টাইনের নেতৃত্বেই বিজ্ঞানীসমাজে স্বীকৃতি লাভ করে। তা সত্ত্বেও প্ল্যাঙ্কের সূত্রের মধ্যে অদ্ভুত একটা অসঙ্গতি বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন। ঐ সূত্রের কোন যুক্তিসঙ্গত, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তাঁরা পাচ্ছিলেন না। ডিবাই [1910], আইনস্টাইন [1917], পউলি [1923] ও আইনস্টাইন-এহ্‌রেনফেস্ট [1923] —এঁরা সকলেই প্ল্যাঙ্কের সূত্রের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নির্ধারণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এঁরা সকলেই তাঁদের নির্ধারণ পদ্ধতিতে সনাতন তত্ত্ব এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব একই সঙ্গে ব্যবহার করেন। ফলে, ইঙ্গিত ফল লাভে অসমর্থ হন। এই রকম একটা সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথকে মেঘনাদ সাহা বিশেষ করে পউলির [Pauli] অপবর্জন নীতির [Exclusion Principle] প্রতি দৃষ্টি দিতে বলেন। সময়টা ছিল 1924 সালের মার্চের পরের কোনও একটা সময়। অপবর্জন নীতির কথা পউলি বলেছিলেন 1923 সালে। অধ্যাপক সাহা সত্যেন্দ্রনাথকে আইনস্টাইন এবং এহ্‌রেনফেস্টের প্রবন্ধটিও [1923] দেখান। পউলির ওই নীতিতে একটা অদ্ভুত ধারণার কথা ছিল—যেন, বর্তমান নির্ভর করছে ভবিষ্যতের উপর।

প্ল্যাঙ্কের সূত্র সংক্রান্ত যাবতীয় গবেষণাপত্র সত্যেন্দ্রনাথ খুব ভাল করে পড়ে নিলেন এবং 1924 সালের মে মাসে প্ল্যাঙ্কের সূত্রের একটি সম্পূর্ণ কোয়ান্টাম-তাত্ত্বিক ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিলেন। এই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি প্রথমেই আইনস্টাইনের আলোক-কণিকাবাদ মেনে নিলেন ও দেখালেন যে, তাঁদের কোয়ান্টাম তত্ত্বের যথাযথ ব্যবহার থেকেই প্ল্যাঙ্কের সূত্রের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্ল্যাঙ্কের সূত্রের এই নির্ধারণ পদ্ধতির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ আলোক-কণিকাদের যে বিশেষ গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন তাকেই বলা হয় 'বোস সংখ্যায়ন' [Bose Statistics]। এই সংখ্যায়নের বৈশিষ্ট্য হলো—একই শক্তির আলোক-কণিকাগুলি পরস্পর পার্থক্যহীন [Indistinguishable]। সাধারণ বস্তুকণিকারা একরূপী হলেও পার্থক্যহীন নয়। দুটি বাক্সের মধ্যে একটি করে সাধারণ

বস্তুকণিকা রাখলে ও পরে তাদের বাক্স বদল করলে দুটি বিন্যাস [Arrangement] পাওয়া যায়—অথাৎ দুটি উপায়ে বস্তুকণিকা দুটিকে দুটি বাক্সে রাখা যায়। কিন্তু সেই কণিকাগুলি পার্থক্যহীন হলে এই দুটি বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব নয়—বিন্যাস তখন একটাই হয়। এই হলো বোস-সংখ্যায়নের মূল কথা। সেই সময় আইনস্টাইন ছাড়া আর কেউ এই গবেষণাপত্র যথার্থ উপলব্ধি করতে পারতেন কিনা সন্দেহ আছে। নিউটনের ধ্রুপদী বলবিজ্ঞান অনুযায়ী এটা সম্ভব নয়। লন্ডনের ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনও সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণাপত্র সম্পর্কে নিরুত্তর ছিল। ওখান থেকে কোন উত্তর না পেয়ে সতেন্দ্রনাথের আইনস্টাইনকে তাঁর গবেষণাপত্রটি পাঠান। আইনস্টাইন রাতারাতি প্রবন্ধটিকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদ জার্মানির বিখ্যাত গবেষণাপত্র 'ৎসাইটশ্রিফট ফুয়ের ফিজিক' [Zeitschrift fur Physik, Vo. 26, 178] পত্রিকায় প্রকাশিত হয় [জুলাই, 1924]। প্রবন্ধটির শেষে আইনস্টাইন একটি মন্তব্য জুড়ে দেন। মন্তব্যটি হলো 'আমার মতে প্ল্যাঙ্কের সূত্র নির্ধারণে বোস যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমি অন্যত্র দেখাব যে, এই পদ্ধতিতে আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টমতত্ত্ব পাওয়া যায়।' অর্থাৎ, আইনস্টাইন দেখালেন যে, শুধু আলোক-কণিকাই নয় অন্য বস্তু-কণিকার ক্ষেত্রেও বসুর গণনা পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে। সত্যেন্দ্রনাথের কাজের এই সার্বিক চরিত্রের উদ্‌ঘাটনের জন্যই প্রথম যুগে এই সংখ্যায়নকে 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' বলা হতো। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ধারণার উপর ভিত্তি করেই যেহেতু এই সংখ্যায়ন গড়ে উঠেছে, সেহেতু এই সংখ্যায়নকে ইদানীং শুধু 'বোস-সংখ্যায়ন' বলা হয়।

এরপর এনরিকো ফের্মি ও পি এ এম ডিরাক দুজনে পৃথকভাবে আর এক ধরনের কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের প্রস্তাব দেন। তাকে বলা হয় 'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন' বা 'ফের্মি-সংখ্যায়ন'। বোস-সংখ্যায়ন ও ফের্মি-সংখ্যায়নের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হলে আমাদের স্মরণ করতে হবে যে, আলোক-কণিকা বা বস্তুকণিকারা যে কোন শক্তিস্তরে থাকতে পারে না—তাদের শক্তিস্তরগুলি বিচ্ছিন্ন ও ধাপে ধাপে বাড়ে কমে। একটা উপমা দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়।

ধরা যাক, একটা বহুতল বাড়ি আছে। তার বাসিন্দারা বিভিন্ন তলায় বাস করে। দুটি তলার মাঝামাঝি জায়গায় কারও থাকা সম্ভব নয়। বাসিন্দারা যদি 'বোস সংখ্যায়ন' মেনে চলে তবে এক একটা ঘরে একাধিক লোক থাকতে পারবে। কিন্তু তারা যদি ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন মেনে চলে তবে কোনও ঘরে একজনের বেশি থাকা সম্ভব হবেই না। কতকগুলি কণিকা 'বোস সংখ্যায়ন' মেনে চলে, কতকগুলি মানে 'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন'।

যে সব মৌল কণিকা বোস-সংখ্যায়ন মেনে চলে তাদের বলা হয় 'বোসন', যারা ফের্মি সংখ্যায়ন মেনে চলে তাদের বলা হয় 'ফের্মিয়ন'। এখনও পর্যন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের মৌল কণিকার কথা জানা গেছে তারা সকলেই হয় 'বোসন' নয় 'ফের্মিয়ন'। যেমন, নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রন, কোয়ার্ক ইত্যাদি ফের্মিয়ন, আর ফোটন ও নানান ধরনের যে সমস্ত মেসন কণিকা পাওয়া গেছে তারা সকলেই 'বোসন'। অতি তারল্য ও অতি পরিবাহিতার

মূলেও রয়েছে এই বোস-কণিকাদের ভূমিকা। কাজেই সহজেই অনুমেয় আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানে বোস সংখ্যায়নের ভূমিকা কত গভীর ও সর্বজনীন।

এইভাবে সত্যেন্দ্রনাথের অবদান পদার্থবিজ্ঞানের জগতে একটা যুগান্তর ঘটিয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণাপত্র পাওয়ার পরই কিভাবে আইনস্টাইন লুই দ্য ব্রগলির প্রস্তাবিত বস্তুর তরঙ্গ-কণিকা দ্বৈতবাদের তাৎপর্য বুঝতে পারেন ও তার দিকে অন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রোয়েডিঙ্গারের চিঠিপত্র থেকেও জানা গেছে কিভাবে তিনিও আইনস্টাইনের 'বোস-সংখ্যায়ন' সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি থেকেই তাঁর আবিষ্কৃত 'তরঙ্গ-বলবিদ্যা'র প্রেরণা পেয়েছিলেন।

ম্যাক্সওয়েল তাঁর তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ তত্ত্বে বলেছিলেন, আলো তাপ ইত্যাদি বিকীর্ণ শক্তি তরঙ্গের আকারে আলোর বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। প্ল্যাঙ্ক এই শক্তিকে কণিকারূপে কল্পনা করে তাঁর অতি বিখ্যাত শক্তি বন্টন সূত্রে ব্যবহার করেছিলেন। এই কণিকা বা কোয়ান্টামকেই আইনস্টাইন 'ফোটন' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর 'আলোক-বৈদ্যুৎ ক্রিয়া তত্ত্ব'-টিতে। সত্যেন্দ্রনাথ ফোটনকে বস্তুরকণার তুল্যরূপ বিবেচনা করে প্ল্যাঙ্কের ওই বিখ্যাত সূত্রটিকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট হলেন। তিনি শক্তির তরঙ্গ চরিত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, কেবলমাত্র বস্তুকণার তুল্যরূপ হিসাবে ধরে প্ল্যাঙ্কের সূত্র উপস্থাপিত করে ফেললেন। তিনি দেখালেন যে, প্লাঙ্কের সূত্র পেতে ম্যাক্সওয়েলের তড়িচ্চুম্বকীয়-তরঙ্গবাদ গ্রহণ করবার দরকার নেই। শক্তিকে শুধুমাত্র বস্তুকণার তুল্যরূপ হিসাবে ধরেই প্ল্যাঙ্কের ওই সূত্রে আসা যায়। সে কারণে এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, শুধুমাত্র কণা-ধর্ম দিয়েই তিনি প্লাঙ্কের সূত্রের পুনরাবিষ্কার করেন। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে পরবর্তীকালে গবেষকরা বলেছেন যে, যদিও তিনি ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গবাদ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই প্ল্যাঙ্কের সূত্র পান, তবুও তরঙ্গের স্বভাব সমবর্তন [Polarization] প্রত্যয়ের মাধ্যমে তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল 'দশা-লোক' [Phase Space]-এর Cell-এর সংখ্যা নির্ণয়ে। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথের সংখ্যায়নের মূলে যে শুধুমাত্র কণাধর্ম আছে তা নয় তরঙ্গ ধর্মও রয়েছে। কিন্তু এই তথ্যটি তাঁর নিবন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে বলা না থাকলেও পরবর্তীকালের গবেষকরা তা প্রমাণ করেছেন। শক্তি প্রবাহের মধ্যে কণাধর্ম ও তরঙ্গ ধর্ম যুগপৎ নিহিত আছে এই তত্ত্ব লুই দ্য ব্রগলি যেমন বলেছিলেন, তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের ওই বিখ্যাত সংখ্যায়নেও কেবল কণাধর্ম নয়, তরঙ্গ ধর্মও যুগপৎ নিহিত আছে কিছুটা গৌণভাবে। আর উভয়েই এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন 1924 খ্রিস্টাব্দে। সত্যেন্দ্রনাথের নিবন্ধ প্রকাশিত হল জুলাই মাসে আইনস্টাইনের অনুবাদের পর এবং ওই বছরই সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় লুই দ্য ব্রগলির নিবন্ধটি।

সত্যেন্দ্রনাথ ফোটনদের এক বস্তুকণার গ্যাস হিসাবে কল্পনা করে তাতে প্রয়োগ করেন পরিসাংখ্যিক গতিবিদ্যার [Statistical Dynamics] নিয়মাবলী। ফোটন সমষ্টির মধ্যে এক ফোটনকে অন্য ফোটন থেকে ভিন্ন ভাবা সম্ভব নয়। তিনি ফোটনদের নির্দিষ্ট সংখ্যাক অবস্থার [States] মধ্যে বন্টন করার চেষ্টা করলেন না, বরং তিনি সন্ধান করলেন কি ভাবে অবস্থাসমূহের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। এই সব অবস্থার বৈশিষ্ট্য হল কেবলমাত্র একটি

নির্দিষ্ট সংখ্যক ফোটন যেন এক একটি অবস্থার পরিচায়ক হিসাবে থাকে। অবস্থাগুলির সংখ্যা নির্ণয়ের পর তিনি ফোটনগুলিকে ওই সব কোষে বন্টন করলেন। অর্থাৎ দশা-লোকের [Phase Space] ক'টি কোষ [Cell] বিকীর্ণ শক্তির জন্য পাওয়া যাচ্ছে তা নির্ণয় করার পর তিনি ফোটনগুলিকে ওই সব কোষে বন্টন করলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন ঃ (1) ফোটনেরা পরস্পর পার্থক্যহীন [Indistinguishable]; (2) প্রতিটি কোষে ফোটনদের সংখ্যা অসংরক্ষিত [Not Conserved] এবং [3] ফোটনদের চক্রণ [Spin] হল 1 (এক)। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর গবেষণা পত্রে ফোটন সংক্রান্ত এই সব অনুসিদ্ধান্তগুলি একেবারে নির্দিষ্ট করে বলেন নি ঠিকই, কিন্তু তাঁর সংখ্যায়নে এগুলি ধরে নিয়েই তিনি প্ল্যাঙ্কের শক্তি-বন্টন সূত্রে উপস্থিত হন। তাঁর এই সংখ্যায়ন যুগান্তকারী কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের পথিকৃৎ এবং যা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন স্বয়ং আইনস্টাইন। সে সব কথা আগেই বলা হয়েছে।

শক্তিবন্টন সংক্রান্ত প্ল্যাঙ্কের সেই অতি বিখ্যাত সূত্রটি হল ঃ

$$dE = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \cdot \frac{d\lambda}{e^{hc/\lambda KT} - 1}$$

যেখানে, dE = শক্তির বন্টন, h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, c = আলোর গতিবেগ, λ = শক্তির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, T = তাপমাত্রা [Absolute], K = বোল্ৎজমান ধ্রুবক [Boltzmann's Constant]।

আইনস্টাইন বসুর এই কাজে এতোই অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি দ্রুত পরপর কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ করলেন। এই নিবন্ধগুলিতে তিনি দেখালেন বসুর এই আবিষ্কার কত সুদূর-প্রসারী। বসুর পরিসাংখ্যিক নিয়ম অনুসরণ করে তিনি সৃষ্টি করলেন এক পরমাণু সম্পন্ন গ্যাসের কোয়ান্টামবাদ। বসুর এই কাজটিকে তিনি গ্যাসের গতি-তত্ত্বে প্রয়োগ করে অতি অল্পমাত্রার গ্যাসের আচরণাদির ব্যাখ্যা করলেন। এই নতুন গণনা পদ্ধতি খ্যাতি পেলো "বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন" [Bose-Einstein Statistics] হিসাবে। আচার্য বোসের পরিসংখ্যান যে সব কণা মেনে চলে তাদের একই শ্রেণীভুক্ত করে বলা হয় 'বোসন' [Boson]।

অনুরূপভাবে, 1926 সালে ডিরাক বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নের উপর পউলির অপবর্জন নীতির বিশেষ বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করে নতুন এক ধরনের সংখ্যায়নে উ পস্থিত হলেন। এই সংখ্যায়ন মেনে চলে সেই সব কণিকারা যাদের 'চক্রণী কৌণিক ভরবেগ' $^1/_2$ h কিংবা তার বিজোড় পূর্ণ-গুণিতক। ফের্মিও আলাদাভাবে একই সংখ্যায়ন নির্ণয় করলেন। সুতরাং $^1/_2$ h, $^3/_2$ h, $^5/_2$ h ইত্যাদি 'চক্রণী কৌণিক ভরবেগ' [Spin Angular Momentum] বিশিষ্ট কণিকারা ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন মেনে চলে। যে সব কণিকারা ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন মেনে চলে তাদের বলা হয় 'ফের্মিয়ন' [Fermion]। ইদানীংকালে আবিষ্কৃত 'ইলেকট্রোউইক তত্ত্বের' [Electro-weak Theory] নব আবিষ্কৃত $W^{\pm}$ এবং Z^0 কণাগুলি 'ভেক্টর বোসন' [Vector Boson]। বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন এখন 'বোস-সংখ্যায়ন' [Bose-Statistics] নামেই বিখ্যাত।

সনাতন সংখ্যায়ন [Classical Statistics] অনুসারে কোন তন্ত্রের [System] সম্ভাব্য আণুবীক্ষণিক অবস্থার [State] সংখ্যা অসীম [Infinite]। এই তন্ত্রের দশা-লোককে [Phase Space] অসংখ্য মৌলিক ক্ষেত্রে বিভক্ত করা যেতে পারে, যে অঞ্চলগুলির প্রত্যেকটির রয়েছে নির্দিষ্ট মাত্রার শক্তি [Constant Energy]। কিন্তু কোয়ান্টাম সংখ্যায়নে দশা-লোককে নির্দিষ্ট শক্তিমাত্রার নির্দিষ্ট সংখ্যক মৌলিক ক্ষেত্রে [Elementary Region] ভাগ করা হয়। নির্দিষ্ট শক্তি মাত্রার এই ধরনের ক্ষেত্রকে বলা হয় 'শীট' [Sheet]। প্রত্যেকটি শীটকে আবার নির্দিষ্ট আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নিয়ে প্রতিটি অংশকে বলা হয় কোষ [Cell]। সুতরাং কোয়ান্টাম সংখ্যায়নে একটি কোষ হল দশা-লোকের ক্ষুদ্রতম অংশ। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে প্রতিটি শীটের সমস্ত কোষে শক্তি-মাত্রা একই এবং তা সুনির্দিষ্ট। ফলে, কোন তন্ত্রের আণুবীক্ষণিক অবস্থাগুলির সংখ্যা সীমিত এবং দশা-লোককে নির্দিষ্ট শক্তির নির্দিষ্ট সংখ্যাক ক্ষেত্রে ভাগ করা যেতে পারে। কোনও তন্ত্রের শক্তির পরিবর্তন হয় কোয়ান্টামের এক শীট থেকে অন্য শীটে স্থানান্তরণে। কোয়ান্টামগুলি দুই শীটের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে অবস্থান করে না। দশা-কোষগুলির [Phase-Cells] আকার নির্দিষ্ট এবং তাদের আয়তন হল h^3, যেখান h হল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি [Uncertainty Principle] অনুসারে দশা-কোষগুলির আয়তন h^3। কোয়ান্টাম সংখ্যায়ন ফোটন বা শক্তিকণা বা কোয়ান্টামের ওই সব কোষে বন্টনের দু'রকম পদ্ধতি বা নিয়মের কথা বলেছে, যার একটি বোস-সংখ্যায়ন, অপরটি ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন [Fermi-Dirac Statistics], যা এখন কেবল 'ফের্মি-সংখ্যায়ন' নামে খ্যাত।

ম্যাক্সওয়েল-বোল্ৎজমান শক্তিবন্টন সূত্র বা সনাতন শক্তিবন্টন সূত্র [Classical Energy Distribution Formula] থেকে পাওয়া যায় ঃ

$$n_s = \frac{A_s}{f_e^{\beta E_s}}$$

যেখানে,

n_s= E_s শক্তির কোয়ান্টাম সংখ্যা, অর্থাৎ বন্টনযোগ্য কোয়ান্টামের সংখ্যা s-তম শীটে যেখানে কোষের শক্তির পরিমাণ E_s,

A_s = শক্তি অবস্থার গুরুত্ব-গুণিতক, অর্থাৎ s-তম শীটে কোষ [Cell] সংখ্যা,

E_s = s-তম শীটের কোষের শক্তির পরিমাণ, অর্থাৎ কোয়ান্টামের শক্তি,

β = ধ্রুবক $= \frac{1}{KT}$, f = আপজাত্য স্বেচ্ছ-স্থিরাঙ্ক [Degeneracy Parameter]

সনাতন পরিসংখ্যানে কয়েকটি প্রায়োগিক ত্রুটির মধ্যে একটি হল, এই পরিসংখ্যান অনুসারে,

$$u_\upsilon d\upsilon = KT\frac{8\pi\upsilon^2}{c^3}d\upsilon$$

এই সমীকরণ অনুযায়ী স্থির উষ্ণতায় কৃষ্ণ-বিকিরণে ʋ-বাড়ার সঙ্গে ফোটনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল, ʋ খুব বেশি এবং খুব কম—এই দুই অবস্থাতেই ফোটন সংখ্যা খুবই কম। সনাতন পরিসংখ্যানে গুরুত্ব-গুণিতক সঠিকভাবে নির্দেশ করা যায় না। কোয়ান্টাম সংখ্যায়নে এই সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত মত পাওয়া যায়।

বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নে তাপগতীয় সম্ভাব্যতা হিসাব করার সময় অবশ্যই দেখতে হয় n_s সংখ্যক কণাকে কতভাবে A_s সংখ্যক কোষের [Cell] মধ্যে রাখা সম্ভব। কণাগুলি প্রত্যেকে একই ধরনের এবং একটি কোষে যতগুলি ইচ্ছা কণা রাখা যায়। এখানে কোষ মানে নির্দিষ্ট শক্তির বিভিন্ন quantum state বুঝতে হবে, যেগুলি শীটের ক্ষুদ্রতম অংশ বিশেষ। এইভাবে বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নে পাওয়া যায় ঃ

$$n_s = \frac{A_s}{fe^{\beta Es} - 1}$$

যেখানে $n_s = E_s$ শক্তির কোয়ান্টাম সংখ্যা, A_s = শক্তি-অবস্থার গুরুত্ব-গুণিতক, E_s = কোয়ান্টামের শক্তি সাম্যাবস্থায়, f = ধ্রুবক $= \frac{V}{nh^3}(2\pi mKT)^{3/2}$, β = ধ্রুবক $= \frac{1}{KT}$ ।

এটি বোস-আইনস্টাইনের বন্টনসূত্র [Distribution Law according to B-E Statistics]। অনুরূপ পদ্ধতিতে ফের্মি-ডিরাক বন্টন সূত্রে পৌঁছানো যায়। ফের্মি-ডিরাক বন্টন সূত্র [Distribution Law according to F-D Statistics] থেকে পাওয়া যায় ঃ

$$n_s = \frac{A_s}{fe^{\beta E_s} + 1}$$

সুতরাং সনাতন সংখ্যায়ন এবং দুটি কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের শক্তি বন্টন সূত্রগুলি [Energy Distribuion Laws] এই রূপ নিয়েছে ঃ

$$n_s = \frac{A_s}{fe^{\beta E_s}} \quad [\text{ ম্যাকসওয়েল-বোল্‌ৎজমান }]$$

$$n_s = \frac{A_s}{fe^{\beta E_s - 1}} \quad [\text{ বোস-আইনস্টাইন }]$$

$$n_s = \frac{A_s}{fe^{\beta E_s} + 1} \quad [\text{ ফের্মি-ডিরাক }]$$

এই সূত্রগুলিতে,

f = আপজাত্য স্বেচ্ছা-স্থিরাঙ্ক [Degeneracy Parameter]

$$= \frac{V}{nh^3}(2\pi mkT)^{3/2}$$

যেখানে,

V = গ্যাসের আয়তন এবং তা ফোটন প্রবাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য,
n = অণুর সংখ্যা প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে,
m = অণুর ভর,
h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক,
k = বোল্‌ৎজমান ধ্রুবক,
T = পরম [Absolute] উষ্ণতা,

যখন, সাধারণ গ্যাস কিংবা ফোটন-গ্যাস একক আয়তনের হয় তখন V = 1 হয় এবং 'ডিজেনারেসি প্যারামিটার' হয় $f = \frac{[2\pi mkT]^{3/2}}{nh^3}$; আবার f যদি 1 (এক)-এর চেয়ে খুব বেশি হয় [f >>1] তখন ওই কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের দুটি বন্টনসূত্রই সনাতন বন্টনসূত্র হয়ে যায়। স্বাভাবিক উষ্ণতা ও চাপে সব সাধারণ গ্যাসের বেলায় এমনটি দেখা যায়। আবার f যদি 1 (এক)-এর চেয়ে খুব ছোট হয় [f<<1], তখন শক্তির বন্টন হয় 'বোস-আইনস্টাইন' কিংবা 'ফের্মি-ডিরাক' সংখ্যায়ন অনুসারে। তখন $n_s = A_s$ হয়ে যায় মোটামুটিভাবে।

আবারো বলি, ফের্মি-ডিরাক 1926 সালে তাঁদের সংখ্যায়ন প্রকাশ করেন পউলির [Wolfgang Pauli] 'অপবর্জন নীতি' [Exclusion Principle] অনুসরণ করে। ওঁরা বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নের পরিবর্তন করতে গিয়ে এই নতুন সংখ্যায়ন আবিষ্কার করেন। ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন এখন কেবল 'ফের্মি-সংখ্যায়ন' নামে পরিচিত।

বোস-আইনস্টাইন ও ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়নের মূল পার্থক্য এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে হবে 1-এর আগের চিহ্নটি ঋণাত্মক, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা ধনাত্মক। সে জন্য ফের্মি সংখ্যায়নের 0 থেকে ∝ -র মধ্যে A-র যে কোন মান নির্দিষ্ট হতে পারে। আবার A>>1 অবস্থায় অর্থাৎ উষ্ণতা বেশি ও ঘনত্ব কম অবস্থায় ফের্মির এই সূত্র থেকে সনাতন বন্টন সূত্রে পৌঁছানো যায়। গ্যাসের ক্ষেত্রে ফের্মি-বন্টন সূত্রকে পরীক্ষার মাপকাঠিতে যাচাই করতে যাওয়া এই কারণে অর্থহীন। কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণে 'বোস-আইনস্টাইন' সংখ্যায়নের যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এই পরিসংখ্যান থেকে প্ল্যাঙ্কের বন্টন সূত্রে আসা যায় তা আগেই বলা হয়েছে।

বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নে যে সব অনুসিদ্ধান্ত ধরে নেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল ঃ

"1. Particles are indentical and indistinguishable.

2. While (a) the Heisenberg's uncertainty relation applies to Bosons, they (b) do not obey the Pauli's exclusion principle.

3. As a consequence of 2, there exists a number of quantum states for a given energy level and any number of Bosons may occupy any given quantum state – there is no a *priori* restriction in this regard."

ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়নেও কতকগুলি অনুসিদ্ধান্ত ধরে নিতে হয়েছে। এই সংখ্যায়নে ধরে নেওয়া এই সিদ্ধান্তগুলি হল :

1. The particles are identical and industinguishable.
2. The Fermions obey (a) the Heisenberg's uncertainty relation and also (b) the exclusion principle of Pauli.
3. As a consequence of 2(b), there is a definite priori restriction onto the number of Fermions in a quantum state ; there can be simultaneously no *more than one* particle in any quantum state which, therefore, would either remain empty or can *at best* contain *one fermion.*"

বোসন এবং ফের্মিয়নদের মধ্যে পার্থক্য হল তাদের চক্রণে [Spin]। কোন্ কণা বোসন আর কোন্ কণা ফের্মিয়ন তা জানা যায় এইভাবে :

"Particles whose spin angular momenta are O, h, 2h, 3h, ... etc. thus obey the Bose's statistics and are called Bosons. Wave functions are symmetric on interchanging the coordinates of two Boson. The Pauli's exclusion principle is not applicable to bosons and there is, therefore, no a priori restriction to the number of Bosons in a given quantum state.

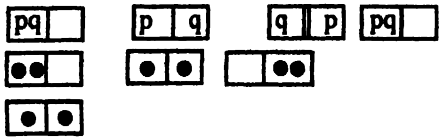
Examples of bosons are : photons and phonons with spin 1; deuterons with spin 1, π-mesons with spin 0, ∝-particles of He^4-nucleus with spin = 0.

Particles whose spin angular momenta are $^1/_2$ h, $^3/_2$ h, $^5/_2$ h... etc. obey the Fermi statistics and are called Fermions. Wave functions are antisymmetric on interchanging the coordinates of two fermions. Pauli's exclusion principle applies to fermions and this imposes the restriction that there could be at best only one Fermion per quantum state.

Example of Fermions : electrons with s = $^1/_2$, positrons with s = $^1/_2$, nucleons (neutrons or protons) with spin $^1/_2$, He^3, μ-meson or nuon with spin $^1/_2$ etc."

ডিরাকের এই সংখ্যায়নের প্রসঙ্গ শেষ করার আগে তিনটি সংখ্যায়নের পার্থক্য চিত্রের সাহায্যে বলে নেওয়া যাক :

1] সনাতন সংখ্যায়ন
2] বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন
3] ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন



মনে করা যাক, দুটি ফোটন আছে এবং মাত্র দুটি কোষ [Cell] আছে তাদের অবস্থানের জন্য। সনাতন সংখ্যায়ন অনুসারে দুটি ফোটনের একটি অন্যটির চেয়ে আলাদা বা পার্থক্যহীন নয়। ফোটন দুটি একসঙ্গে কিংবা আলাদা আলাদাভাবে ওই দুটি কোষে অবস্থান করতে পারে। এর ফলে, সনাতন সংখ্যায়নের নিয়মে এই দুই ফোটনের বিন্যাস [Arrangement] চার রকম হতে পারে। ধরা যাক, ফোটন দুটির একটি p এবং অন্যটি q। আর p ও q

পার্থক্যহীন নয়, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সনাতন সংখ্যায়নে p ও q প্রথম কোষটিতে অবস্থান করতে পারে এবং দ্বিতীয়টি ফাঁকা থাকতে পারে, কিংবা তারা দুটি কোষেই থাকতে পারে; প্রথমটিতে p এবং দ্বিতীয়টিতে q কিংবা প্রথমটিতে q এবং দ্বিতীয়টিতে q। আবার প্রথম কোষটি ফাঁকা থাকতে পারে এবং তারা একসঙ্গে দ্বিতীয়টিতে অবস্থান করতে পারে। এইভাবে সনাতন সংখ্যায়নে দুটি ফোটনের শক্তিস্তরের বিন্যাস মোট চার রকমের হতে পারে।

বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন অনুসারে p ও q পরস্পর পার্থক্যহীন [Indistinguishable]। ফলে তাদের আর আলাদা p কিংবা q সত্তা থাকে না। দুটি ফোটন তাই প্রথম কোষে কিংবা দ্বিতীয় কোষে যেমন থাকতে পারে তেমনি এরা এক একটি কোষে অবস্থান করতে পারে। এইভাবে এই সংখ্যায়নে এদের তিন ধরনের বিন্যাস সম্ভব।

ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়নে একটি কোষে একটির বেশি ফোটন থাকতেই পারবে না এবং তারা পরস্পর পার্থক্যহীন। ফলে, দুটি ফোটন এক্ষেত্রে দুটি কোষে অবস্থান করতে পারে। তাই দুটি ফোটন ও দুটি কোষের মধ্যে বিন্যাস কেবল এক রকমই হতে পারে।

বিশ্বের যাবতীয় কোয়ান্টাম কিংবা কণিকা হয় 'বোসন' নয় 'ফের্মিয়ন'। আগেই বলেছি, প্রশ্ন থেকেই যায় বিশ্বে এই দু'রকমের সংখ্যায়ন কেন? চক্রণ [Spin] এবং এই সংখ্যায়নের সম্পর্ক কি? এগুলির সুন্দর উত্তর দিয়েছেন অধ্যাপক ফেইনম্যান [Feynman]। তিনি বলেছেন :

"We cannot give an elementary explanaton. An explanation has been worked out by Pauli from complicated arguments of quantum field theory and relativity. He has shown that the two must go together, but we have not been able to find a way of reproducing his arguments on an elementary level. It appears to be one of the few places in physics where there is a rule which can be stated very simply, but for which no one has found a simple and easy explanation. The explanation is deep down in relativistic quantum mechanics. This probably means that we do not have a complete undestanding of the fundamental principle involved. for the moment, you will just have to take it as one of the rules of the world."

কোয়ান্টাম-সংখ্যায়নের গভীর তাৎপর্য নিয়ে আজকের বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধিৎসু। আজও জানা যায় নি কেন বাস্তবে মাত্র দু'রকমের সংখ্যায়ন পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, যতদিন পর্যন্ত বস্তুর কণাধর্ম ও তরঙ্গধর্মের যুগপৎ অস্তিত্ব স্বীকার করা হবে ততদিন এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে না। বস্তুর এই দ্বৈতসত্তার অন্তরালে যে অদ্বৈত ধর্ম আছে তা আবিষ্কৃত না হওয়া অবধি এইসব প্রশ্নের উত্তর হয়ত অব্যাখ্যাত থেকেই যাবে। ●

এনরিকো ফের্মি

[1901–1954]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধেকটাই হল পদার্থবিজ্ঞানের এক বিশাল অগ্রগতির যুগ। পদার্থবিজ্ঞানের এই সময়ের আবিষ্কারগুলির প্রাযুক্তিক প্রয়োগ ঘটিয়ে সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। মানুষ পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণের কাজের লাগাতে শিখেছে এই শতাব্দীতে। তারা আইনস্টাইন মারফৎ জেনেছে পরমাণুর বিশাল শক্তির কথা। সেই শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য পরমাণবিক চুল্লি [Atomic Reactor] বানানো হল এই শতাব্দীর প্রথমার্ধেই। পারমাণবিক শক্তির নির্বোধ প্রয়োগে যে ভয়াবহ ধ্বংস দেখা গেল জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে তাতে মনে হয়েছিল সভ্যতার যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা বুঝি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পদার্থবিজ্ঞানীরাই সভ্যতাকে সে ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা থেকে বাঁচালেন। পারমাণবিক চুল্লীর আবিষ্কার করে নিয়ন্ত্রিতভাবে পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের নানা কল্যাণকর কাজে লাগাতে সমর্থ হলেন পদার্থবিজ্ঞানীরা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই। পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগিয়ে সভ্যতার অগ্রগতিতে যিনি অভূতপূর্ব অবদান রেখেছিলেন, তিনি হলেন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মি [Enrico Fermi]। ফের্মিই আবিষ্কার করেছিলেন 'পারমাণবিক চুল্লি'।

1942 খ্রিস্টাব্দের 2রা ডিসেম্বর তিনি বানিয়ে ফেলেছিলেন পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক চুল্লি। আর প্রথম পারমাণবিক বোমার [Atomic Bomb] পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় 1945 সালের 16 ই জুলাই আমেরিকার দক্ষিণে নিউ মেক্সিকোর অ্যালমাগোর্ড [Almogordo] নামক জায়গাটির জনহীন প্রান্তরে। পারমাণবিক বোমার বিশাল ভয়াবহ ধ্বংস শক্তির চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েও একটা ওই ধরনের বোমা ফেলা হয় জাপানের হিরোশিমা শহরে 1945 সালের 6ই আগস্ট। অকল্পনীয় ভয়াবহ ধ্বংস দেখেও পূর্ব-পরিকল্পনা মত আবারো একটি বোমা ফেলা হয় জাপানেরই আরেকটি সমৃদ্ধ শহর নাগাসাকির উপর 1945 সালের 9ই আগস্ট। পারমাণবিক বোমায় হিরোশিমা-নাগাসাকির প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা আজ সকলেরই কম-বেশি জানা। অথচ পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণকর কাজে লাগানোর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল পারমাণবিক বোমা তৈরির অনেকটা আগেই। তবু মানুষের বিবেকহীন দুর্বুদ্ধি পারমাণবিক শক্তিকে লাগিয়েছিল ধ্বংসের কাজে, সভ্যতার অগ্রগতিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজে। বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধেকটায় মানুষ সভ্যতার অতি দ্রুত অগ্রগিত ঘটিয়েছে পারমাণবিক চুল্লির মাধ্যমে পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণকর কাজে লাগিয়ে, দৈনন্দিন জীবনে সে শক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে। মানব সভ্যতায় পদার্থবিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মির মহান অবদান এখানেই।

কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান হল 'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন' [Fermi-Dirac Statistics]। এই সংখ্যায়ন ফের্মি যেমন আলাদাভাবে বের করেছিলেন, তেমনি এককভাবে ডিরাকও [P.A.M. Dirac] এটি আবিষ্কার করেন। 1926 খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যায়ন প্রকাশিত হয়। প্রথমে এটি 'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন' নামে বিখ্যাত হলেও এখন এটি 'ফের্মি সংখ্যায়ন' নামেই খ্যাত। 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন', যেটি এখন কেবলমাত্র 'বোস সংখ্যায়ন' নামে খ্যাত, আবিষ্কৃত হয় 1924 সালে। তারই অনুসরণে পউলির 'অপবর্জন নীতি'-র [Pauli's Exclusion Principle] প্রয়োগ ঘটিয়ে ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন প্রকাশিত হয়। কোয়ান্টাম জগতে এখন দুটি সংখ্যায়ন—একটি 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' বা 'বোস সংখ্যায়ন' এবং অপরটি 'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন' বা 'ফের্মি সংখ্যায়ন'। যে সব কণিকার চক্রনী কৌণিক ভরবেগ [Spin Angular Momentum] 0, h, 2h, 3h, 4h ইত্যাদি, অর্থাৎ h [Planck's Constant]-এর পূর্ণ গুণিতক কিংবা শূন্য, তারা 'বোস সংখ্যায়ন' মেনে চলে। এই সব কণিকাদের বলা হয় 'বোসন' [Bosn]। আবার যেসব কণিকার 'চক্রণী কৌণিক ভরবেগ' $\frac{1}{2}$ h, $\frac{3}{2}$ h, $\frac{5}{2}$ h, $\frac{7}{2}$ h ইত্যাদি অর্থাৎ h-এর অর্ধেকের বিজোড় পূর্ণ-গুণিতক, তারা মেনে চলে 'ফের্মি সংখ্যায়ন'। এই সব কোয়ান্টামদের বলা হয় 'ফের্মিয়ন' [Fermion]।

1931 সালে 'কৃত্রিম বিশরণ' [Artificial Disintegration] ঘটাতে গিয়ে রাদারফোর্ডের ছাত্র ও সহকর্মী কক্‌ক্রোফ্‌ট [Cockcroft] ও ওয়ালটন [Walton] উচ্চশক্তি সম্পন্ন প্রোটন দিয়ে লিথিয়ামকে আঘাত করলেন। ফলে, আওয়াজ করে বিস্ফোরণ হয়ে আলোর ঝলক দেখা গেল। প্রবল তাপ উৎপন্ন হল। পারমাণবিক বিক্রিয়াটি হল ঃ

$$_3Li^7 + {_1H^1} \rightarrow {_2He^4} + {_2He^4} + 17.3\text{Mev}$$

উৎপন্ন তাপের পরিমাণ আইনস্টাইনের $E = mc^2$ সূত্র মেনেই পাওয়া গেল। একটি লিথিয়াম পরমাণুর প্রকৃত ভর হল $7.01822 \times 1.66 \times 10^{-24}$ গ্রাম এবং একটি প্রোটনের ভর $1.00812 \times 1.66 \times 10^{-24}$ গ্রাম। সুতরাং সংঘর্ষের আগে মোট ভর হল $8{\cdot}02634 \times 1{\cdot}66 \times 10^{-24}$ গ্রাম। আবার একটি হিলিয়াম কেন্দ্রকের ভর $4{\cdot}00390 \times 1{\cdot}66 \times 10^{-24}$ গ্রাম। সুতরাং উৎপন্ন দুটি হিলিয়াম পরমাণুর মোট $8{\cdot}00780 \times 1{\cdot}66 \times 10^{-24}$ গ্রাম। সংর্ঘষের পরে ভরের ঘাটতি হল $(8{\cdot}02634 - 8{\cdot}00780) \times 1{\cdot}66 \times 10^{-24}$ গ্রাম বা $0{\cdot}0307764 \times 10^{-24}$ গ্রাম। শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে এই ভরটুকু $E = mc^2$ সূত্র অনুসরণ করে। এই শক্তির পরিমাণ হল $0.0307764 \times 10^{-24} \times (3 \times 10^{10})^2$ আর্গ বা 0.2769876×10^{-4} আর্গ, যা অঙ্ক কষে দাঁড়ায় 17·3 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট [MeV]। এইভাবে 1905 সালে আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত $E = mc^2$ প্রযুক্তিগতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হল। বিজ্ঞানীরা এই সূত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগে ক্রমশঃ পরমাণু থেকে শক্তি পাবার উপায়ে সাফল্য লাভ করতে লাগলেন।

1932 সালে চ্যাডউইক [Chadwick] নিউট্রন আবিষ্কার করলেন। আধান নিরপেক্ষ এই কণিকাটি দিয়ে আঘাত করে পরমাণু বিভাজন আরও সহজ হবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা হল। 1934 সালে বিজ্ঞানী মাদাম কুরীর মেয়ে আইরিন কুরী ও তার স্বামী ফ্রেডরিক



মধ্য বয়সে এনরিকো ফের্মি [1901-1954]



প্রৌঢ় এনরিকো ফের্মি [1901-1954]

জোলিও কেন্দ্রককে আলফা কণিকার আঘাতে ভেঙে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় [Artificial Radioactive] পদার্থ সৃষ্টি করলেন, যা আজকাল চিকিৎসা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত। এই আবিষ্কারের জন্য তাঁরা 1935 সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন। 1935 সালেই জোলিও দম্পতি এবং ইতালির এনরিকো ফের্মি [Enrico Fermi] নিউট্রন দিয়ে U^{235} পরমাণুর কেন্দ্রককে আঘাত করলেন। কেন্দ্রকীয় বিভাজন হল। 1938 সালে ফের্মিকে নোবেল পুরস্কারও দেওয়া হল তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে বিভাজনের ব্যাপারটা তখন অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল।

1938 সালের শেষের দিকে বার্লিনের বিশিষ্ট রসায়নবিদ অটো হান [Otto Hahn] এবং তাঁর সহকর্মী স্ট্রাসমান [Strassmann] গবেষণাগারে ইউরেনিয়াম-U^{235}- কে নিউট্রন কণা দিয়ে আঘাত করে প্রায় দুটি সমান অংশে বিভক্ত করতে সমর্থ হলেন। ইউরেনিয়াম U^{235} পরমাণু দ্বিধা বিভক্ত হয়ে হল বেরিয়াম আইসোটোপ এবং ক্রীপটন [Krypton] আইসোটোপ। এর উপর উৎপন্ন হল দু'টি নিউট্রন কণা এবং প্রবল উত্তাপ। ওঁদের আবিষ্কার এক কথায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায় ঃ

$$_{92}U^{235} + _0n^1 \rightarrow _{56}Ba + _{36}Kr + 2_0n^1 + 200MeV$$

এই আবিষ্কারে অটো হানের মুখ্যসহায়িকা ছিলেন শ্রীমতী লীজে মেইটনার [Lise Meitner]। এই মহিলা বিজ্ঞানী জাতিতে ইহুদী। দীর্ঘ 25 বছর অটো হানের সঙ্গে কাজ করার পর 1938 সালের গ্রীষ্মকালে প্রাণ বাঁচাতে তিনি বার্লিন ছেড়ে স্টকহোমে চলে যান। প্ল্যাঙ্ক ও হান তাঁকে বার্লিনে থাকবার অনুমতি দিতে হিটলারকে অনুরোধ করেছিলেন। হিটলার শোনেন নি। যখন খবর পাওয়া গেল তাঁকে বন্দী করা হচ্ছেই, তখন হান এবং প্ল্যাঙ্কই তাঁকে স্টকহোম পাঠিয়ে দেন। এরই কিছুদিন পরে U^{235} পরমাণুর বিভাজন সম্ভব হল হানের গবেষণাগারে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 1939 সালের গোড়ার দিকে হান এই আবিষ্কার সবিস্তারে মেইটনারকে জানালেন তাঁর মূল্যবান অভিমতের জন্য। মেইটনার এবং ফ্রিসক [O. R. Frisch] কয়েকদিন পরে ওই ঘটনার তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা দিলেন। মেইটনারই এই ঘটনার নাম দিলেন পারমাণবিক বিভাজন [Atomic Fission] বা কেন্দ্রকীয় বিভাজন [Nuclear Fission]।

1938 সালে হানের গবেষণার ফলে U^{235}-এর কেন্দ্রকের বিভাজন সংক্রান্ত যে সব তথ্যাদি পাওয়া গেল সেগুলি ভালো করে বিচার করে দেখলেন মেইটনার। তিনি সিদ্ধান্ত এলেন যে বিজ্ঞানীরা এতোদিন যা চাইছিলেন হানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তা-ই পাওয়া গেছে। মেইটনার কোপেনহেগেন গেলেন এবং বোরকে [Neils Bohr] সব তথ্যাদি জানালেন। মেইটনার বোরের গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হানের মত একই ফল পেলেন। তিনি আরও জানালেন, একটি নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকটি প্রায় সমান দুটি ভাগে বিভক্ত হওয়া ছাড়াও দুটি নিউট্রনের সৃষ্টি হচ্ছে, যার অর্থই হল ধারাবাহিকভাবে পারমাণবিক বিক্রিয়ার সম্ভাবনা। কেননা, প্রথম একটি নিউট্রন কেন্দ্রককে আঘাত করার পর বিভাজন শেষে দুটো নিউট্রন বেরিয়ে আসছে। আবার ওই দুটো নিউট্রন অন্য দুটো কেন্দ্রককে আঘাত করে বিভাজন শেষে চারটি নিউট্রন উৎপন্ন করছে। এইভাবে চার থেকে

আট, আট থেকে ষোল এবং ধারাবাহিকভাবে উৎপন্ন হবে অজস্র নিউট্রন। প্রতিটি পরমাণু বিভাজনে উৎপন্ন শক্তি হবে 20 কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট। মেইটনার বোরকে এসব জানালেন। বোর আবার জানালেন ফের্মি ও স্ৎসিলার্ড বা ৎসিলার্ড [Szilard] প্রমুখ বিজ্ঞানীদের, যাঁরা তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছিলেন। গবেষণায় জানা গেল ইউরেনিয়ামের পরিমাণ যদি একটি বিশেষ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, যা বিজ্ঞানের ভাষায় 'সঙ্কট ভর' [Critical Mass], তবে মুহূর্তের মধ্যে ধারাবাহিক বিক্রিয়ায় ঘটবে প্রবল বিস্ফোরণ। সব কিছু ধ্বংস করে দেবে। ফের্মি চেষ্টা করলেন কী করে এই ধারাবাহিক বিক্রিয়াকে আয়ত্তাধীনে রাখা যায়। তিনি 1942 সালে 2রা ডিসেম্বর বানিয়ে ফেললেন পারমাণবিক চুল্লি [Atomic Reactor], যাতে ধারাবাহিক পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটতে থাকবে, কিন্তু তাকে আয়ত্তাধীন রাখা যাবে। ফলে, পরমাণু শক্তিকে মানুষের ব্যবহারে লাগানোর অসুবিধা থাকলো না আর। মানুষের কল্যাণে পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগানোর মহান কৃতিত্ব তাই ইতালির এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মির [Enrico Fermi]।

এনরিকো ফের্মি জন্মেছিলেন 29শে সেপ্টেম্বর, 1901 খ্রিস্টাব্দে। ইতালির বিখ্যাত রোম শহরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা আলবার্তো ফের্মি ছিলেন যোগাযোগ মন্ত্রকের মুখ্য-পরিদর্শক [Chief Inspector] এবং 'Ida de Gattis'। আলবার্তো ফের্মির [Alberto Fermi] তিন সন্তানের মধ্যে এনরিকো ছিলেন সবার ছোট। স্কুলে পড়ার সময় তিনি পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। এই সময় থেকেই তিনি ওই দুই বিষয়ে তাঁর প্রবল ব্যুৎপত্তি দেখান। স্কুলের সমস্ত শিক্ষকই তাঁর গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান দেখে খুবই প্রশংসা করতেন। তাঁর বাবার বন্ধুরাও এনরিকোর উচ্চ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন।

1918 সালে 17 বছর বয়সে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Reale Scuola Normale Superior' ফেলোশিপ নিয়ে এন্‌রিকো ফের্মি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শুরু করেন। চার বছর ধরে পড়াশুনা করার পর 1922 সালে মাত্র 21 বছর বয়সে তিনি পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণাপত্রের বিষয় ছিল এক্সরে। ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের পর তিনি কিছুদিন রোমে কাটান। 1923 সালে তিনি ইতালির শিক্ষা মন্ত্রকের ফেলোশিপ নিয়ে গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাক্স বর্নের অধীনে গবেষণা করতে যান। কয়েক মাস তাঁর অধীনে গবেষণা করার পর ফের্মি 1924 সালে রকফেলার ফেলোশিপ [Rockefeller Fellowhip] পান। এই ফেলোশিপ নিয়ে তিনি লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে [Leyden University] এহ্‌রেনফেস্টের [P. Ehrenfest] কাছে কিছুদিন গবেষণা করেন। 1924 সালেই তিনি ফিরে আসেন ইতালিতে। ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে [University of Florence] গাণিতিক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হয়ে ফের্মি দু'বছর [1924-1926] ফ্লোরেন্সেই কাটান। 1926 সালেই তিনি তাঁর সংখ্যায়ন প্রকাশ করেন, যা 'ফের্মি সংখ্যায়ন' নামে বিখ্যাত।

1923 সালে ফের্মি গবেষণা করেন ম্যাক্স বর্নের অধীনে। এই সময়ই তিনি কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ম্যাক্স বর্নই তাঁকে উৎসাহিত করেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের গবেষণায়। উপ-পারমাণবিক [Sub-atomic] ঘটনাসমূহের বাখ্যায়, কৃত্রিম উপায়ে ধারাবাহিক বিশরণে, পারমাণবিক চুল্লির আবিষ্কারে ফের্মি কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানকে

দিয়েছেন অভূতপূর্ব নতুন মাত্রা। নিয়ন্ত্রিত ধারাবাহিক কেন্দ্রকীয় বিভাজন [Controlled Chain Nuclear Fission] আবিষ্কারের জন্য ফের্মিকে 1938 সালের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তাঁর সম্মানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি দপ্তর চালু করে 'এনরিকো ফের্মি পুরস্কার' [Enrico Fermi Award]। এই পুরস্কার সর্ব প্রথম দেওয়া হয় ফের্মিকেই। এগুলি নিয়ে একটু পরেই আলোচনা করা হচ্ছে।

1926 সালে ফের্মি বিখ্যাত হয়ে উঠেন তাঁর 'ফের্মি সংখ্যায়ন' আবিষ্কারের সুবাদে। 1927 সালে তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 1938 সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়া অবধি ফের্মি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই অধ্যাপক পদেই আসীন ছিলেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তিনি ইতালি ছেড়ে পাকাপাকিভাবে চলে যান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। ফের্মির দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ হল, মুসোলিনীর [Mussolini] ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র। এই ফ্যাসিবাদ, এই একনায়কতন্ত্র সহ্য করতে পারলেন না ফের্মি। তাই তিনি জন্মভূমি চিরকালের মত ছেড়ে দিয়ে চলে যান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে।

রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন একদল তরুণ পদার্থবিজ্ঞানী ফের্মির অধীনে কাজ করতে থাকেন। এখানে প্রথমদিকে তিনি এবং তাঁর তরুণদল গবেষণা করতে থাকতেন তড়িৎ-গতিবিদ্যা [Electrodynamics] এবং বিভিন্ন রকমের বর্ণালি-বীক্ষণ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা নিয়ে। এরপর ফের্মি তাঁর গবেষণার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন ইলেকট্রনদের বহিরঙ্গ থেকে তাদের অভ্যন্তরে। তড়িৎ-গতিবিদ্যা ছেড়ে তিনি মন দেন পরমাণুর কেন্দ্রকের বিভাজনে। 1934 সালে, তিনি বের করলেন বিটা-ক্ষয় তত্ত্ব [β-decay Theory]। এটা আবিষ্কার করতে তিনি পূর্ববর্তী বিকিরণ-তত্ত্বের সঙ্গে পউলির নিউট্রিনো [Neutrino] ধারণাকে একীভূত করে ফেললেন। আগেই বলেছি, 1934 সালে আইরিন জোলিও-কুরী [Irene Joliot-Curie] এবং তাঁর স্বামী ফ্রেডরিক জোলিও [Frederic Joliot] দু'জনে মিলে পরমাণুর কেন্দ্রককে আলফা কণার আঘাতে ভেঙে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি করলেন। এর ফলে ধনাত্মক আধানযুক্ত হিলিয়াম নিউক্লিয়াসসমূহ পোলোনিয়াম [Polonium] থেকে নির্গত হয়। জোলিও দম্পতির এই কাজ ফের্মিকে খুবই প্রভাবিত করে। তিনি অন্য উপায়ে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হলেন।

অগেই বলেছি, 1932 সালে চ্যাডউইক নিউট্রন আবিষ্কার করেন। ফের্মি মনস্থ করলেন, ওই নিউট্রনের সাহায্যে বিভাজন ঘটিয়ে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি করবেন। তিনি গবেষণাগারে দেখালেন, তেজস্ক্রিয় বেরিলিয়াম [Beryllium] থেকে পাওয়া নিউট্রন দিয়ে আঘাত করিয়ে তেজস্ক্রিয় কণা বা পদার্থ তৈরি করা সম্ভব। তবে তিনি তেজস্ক্রিয় বেরিলিয়াম থেকে নির্গত নিউট্রনের গতিবেগ কমিয়ে ফেললেন প্যারাফিনের [Paraffin] মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ে গিয়ে পরমাণুকে আঘাত করবার আগে। তাঁর গবেষণায় এটা আবিষ্কৃত হল যে, ধীর গতিসম্পন্ন নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে বহু মৌলিক কণাকে সহজভাবেই তেজস্ক্রিয় কণায় পরিবর্তিত করা যায়। নিউট্রনের সাহায্যে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা এনরিকো ফের্মিই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করলেন। তাঁর এই পদ্ধতিতে আঘাত করার জন্য ব্যবহৃত হল ধীরগতির

নিউট্রন। বহু মৌলিক পদার্থের কৃত্রিম বিশরণ ঘটালেন ফের্মি। 238-পারমাণবিক ওজন [Atomic Weight]-সম্পন্ন ইউরেনিয়ামকে ধীরগতির নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে একটা নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া গেল যা পর্যায় সারণীতে [Periodioc Table] তখন ছিল না।

অনুরূপভাবে ফের্মি ধীরগতির নিউট্রন দিয়ে নানা পদার্থে আঘাত করিয়ে নতুন নতুন তেজস্ক্রিয় মৌল আবিষ্কার করলেন যেগুলি তখনকার পর্যায় সারণীতে ছিল না। ফের্মির সহকর্মীরা 92-পারমাণবিক সংখ্যার [Atomic Number] ইউরেনিয়ামে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে যে নতুন তেজস্ক্রিয় মৌল পেলেন সেটা একটা নতুন ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল [Transuramic Element], যার পারমাণবিক সংখ্যা 92 এবং পারমাণবিক ওজন 239। অর্থাৎ ইউরেনিয়াম-238 আঘাতকারী একটি নিউট্রন কণা আত্মসাৎ করে হয়ে যায় ইউরেনিয়াম-239। এই ইউরেনিয়াম-239 হল ইউরেনিয়াম-238 এরই একটা সমস্থানিক [Insotope]। এই সমস্থানিকটি অবশ্য ক্ষণস্থায়ী। অবিলম্বে এটি একটি বিটা-কণা হারিয়ে রূপান্তরিত হয় নেপচুনিয়াম [Neptunium] এবং প্লুটোনিয়ামে [Plutonium]। এদের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 93 এবং 94। ফের্মির সহকর্মীরা অবশ্য 93-পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট ওই তেজস্ক্রিয় মৌলের আবিষ্কার করার দাবী করেন। ফের্মি কিন্তু ওই নতুন তেজস্ক্রিয় মৌল আবিষ্কার করেও সে রকম কোনও দাবী রাখেন নি। তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন এই দেখে যে, ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বিশরণের ফলে নিউট্রনের আত্মসাৎ ঘটে, যা অন্যান্য মৌলের বেলায় ঘটে না। ফের্মি তখনও নিশ্চিত ছিলেন না যে, তিনি এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

এই আবিষ্কার নিয়ে তাঁর জীবনীকারদের বক্তব্য হল ঃ

"Fermi's Colleagues were inclined to believe that he had actually made a new, "transuranic" element of atomic number 93; that is, during bombardment, the nucleus of uranium had captured a neutron, thus increasing its atomic weight. Fermi did not make this claim, for he was not certain what had occurred; indeed, he was unaware that he was on the edge of a world-shaking discovery. As he modestly observed years later, 'We did not have enough imagination to think that a different process of disintegration might occur in uranium than in any other element. Moreover we did not know enough chemistry to separate the products from one another' One of his assistants commented that 'God, for His own inscrutable ends, made everyone blind to the phenomenon of atomic fission'.

ধীরগতির নিউট্রনদের সঙ্গে সংঘাত ঘটিয়ে মৌলের কৃত্রিম বিশরমের সাহায্যে নতুন নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলের প্রথম স্রষ্টা হলেন এনরিকো ফের্মি। পর্যায় সারণীর ফাঁকা জায়গার অনেকগুলিই ভর্তি হয়ে যায় এইসব কৃত্রিম বিশরণে উদ্ভুত নতুন নতুন তেজস্ক্রিয় মৌল দিয়ে।

আগেইবলেছি, 1927 সালে ফের্মি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান পড়াতেন তিনি সেখানে। 1928 সালে রোমে থাকাকালীনই ফের্মি বিয়ে করেন লারা ক্যাপন [Laura Capon]-কে। তাঁদের প্রথম সন্তান একটি কন্যা। নাম নেল্লা [Nella]। নেল্লা জন্মান 1931 সালে। তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান হল পুত্র সন্তান। নাম গিউলিও [Giulio]। মাত্র 28 বছর বয়সে 1929 খ্রিস্টাব্দে ফের্মি ইতালির রয়্যাল অ্যাকাডেমির [The Royal Academy of Italy] সদস্য নির্বাচিত হন। তিনিই ছিলেন অ্যাকাডেমির কনিষ্ঠতম সদস্য। ফের্মি ভালোবাসতেন হাঁটতে, বেড়াতে, পর্বতারোহণ করতে এবং শীতকালীন খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতে।

1938 সালে ফের্মি ছিলেন পৃথিবী-সেরা নিউট্রনবিদ। নিউট্রনের সাহায্যে কৃত্রিম বিশরণ ঘটানোয় অদ্বিতীয়। তিনি তখন রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে সময়ই তাঁকে 1938 সালের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কারের জন্য তাঁকে মনোনীত করা হয় দুটি কারণে - (1) নিউট্রন সংঘাত ঘটিয়ে নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির আবিষ্কার, এবং (2) ধীর গতির নিউট্রন দিয়ে নিউক্লীয় বিক্রিয়ার আবিষ্কার। 1938 সালে ফ্যাসিবাদী মুসোলিনী তখন ইতালির সর্বাধিনায়ক। ফের্মিকে অনুমতি দেওয়া হল সুইডেনে গিয়ে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করার। ফের্মি সপরিবারে পুরস্কার আনতে যান সুইডেনে। সেই যে তিনি ইতালি ছাড়লেন আর কোনও দিন ইতালিতে ফিরে আসেন নি। এরপর তিনি চলে যান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানেও তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান পারমাণবিক বিভাজন নিয়ে। 1939 সালে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের [University of Columbia] পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় অটো হান, [Otto Hahn], লিজে মেইটনার [Lise Meitner] এবং ফ্রিৎজ স্ট্রাসমান [Fritz Strassmann] যে সব গবেষণা চালাচ্ছিলেন তার ফলস্বরূপ জানা গেল যে, ধারাবাহিকভাবে পারমাণবিক বিক্রিয়া সম্ভব। এই নিয়ে কিছুটা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। লিজে মেইটনার এই ধারাবাহিক বিক্রিয়ার সম্ভাবনার কথা জানালেন বোরকে [Neils Bohr]। বোরের কাছ থেকে 1939 সালে জানলেন সৎসিলার্ড [Szilard] এবং ফের্মি। এই ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গেই ফের্মি তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ফের্মি চেষ্টা চালালেন এই ধারাবাহিক পারমাণবিক বিক্রিয়াকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। 1942 সালের 2 রা ডিসেম্বর শিকাগো স্টেডিয়ামের নিচে ভলিবল মাঠে তিনি প্রথম দেখালেন নিয়ন্ত্রিত ধারাবাহিক পারমাণবিক বিভাজন। পারমাণবিক চুল্লির পত্তন করে ফেললেন এনরিকো ফের্মি। পরবর্তীকালে তিনি পারমাণবিক বোমা বানানোর অনেকগুলি সমস্যার সমাধান করেন। পারমাণবিক শক্তির বিকাশ এবং পারমাণবিক বোমা বানানোর 'ম্যানহাট্টন প্রকল্প' [Manhattan Project] যে সব পদার্থবিজ্ঞানীর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল সেই দলে ফের্মিও ছিলেন। এই ম্যানহাট্টন প্রকল্প গ'ড়ে উঠার পিছনে ফের্মির বিশাল ভূমিকা ছিল।

1939 সালে অটো হানের পারমাণবিক বিভাজনের খবর বোরের মাধ্যমে পেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা। ফের্মি ও ৎসিলার্ড নিশ্চিতভাবে বুঝলেন পারমাণবিক বোমা

[Atom Bomb] এখন সম্ভবপর। চাই প্রচুর ইউরেনিয়াম এবং অর্থ। হিটলার এই সময় চেকোশ্লোভাকিয়ার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ অঞ্চল দখল করে নিয়ে ইউরেনিয়াম রপ্তানী বন্ধ করে দেন। ফের্মি প্রমুখ বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হলেন হিটলার পারমাণবিক বোমা বানানোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন। 1939 সালে জুলাই মাসের মাঝামাঝি একদিন ৎসিলার্ড ও ফের্মি কলম্বিয়া থেকে প্রিন্সটনে আইনস্টাইনের বাড়ীতে এলেন। ওঁরা ঠিক করেই এসেছিলেন, আইনস্টাইনকে ওঁরা অনুরোধ করবেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করতে, কিংবা একটি চিঠি লিখে দিতে যাতে সরকারী ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানীরা প্রচুর ইউরেনিয়াম এবং অর্থ পান পারমাণবিক শক্তির কার্যকর ব্যবহারের পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য।

ফের্মি ও ৎসিলার্ড আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করে অটোহানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, লিজে মেইটনারের গবেষণা ইত্যাদির কথা সবিস্তারে বললেন। তাঁরা এও জানালেন যে, নিজেদের গবেষণাতেও তাঁরা নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রককে বিভাজনের ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারাবাহিক পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটাতে সমর্থ হয়েছেন। আইনস্টাইন সব শুনে বুঝলেন তিনি যে ভয় করেছিলেন, সেই পরমাণু বোমার আবিষ্কার হতে চলেছে। তাঁর মনে এলো, 20 বছর আগে জার্মানীর এক তরুণ বিজ্ঞানী বার্লিনে তাঁর কাছে এসেছিলেন পরমাণু থেকে শক্তির মুক্তি ঘট্যানোর কাজে তাঁকে সাহায্য করতে, যাতে অভাবনীয় বিধ্বংসী বোমা বানানো যায়। আবার তাঁর মনে পড়ল বার্নের পেটেন্ট অফিসের ডেস্কের রাশিকৃত কাগজের কথা, যার একটি উপরে লেখা ছিল ওই বিখ্যাত সূত্র $E = mc^2$, যেটি তাঁর 1905 খ্রিস্টাব্দের আবিষ্কার।

আইনস্টাইন সব শুনে চুপ করে আছেন দেখে ৎসিলার্ড বললেন, "যতদূর খবর পাওয়া গেছে বার্লিনের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা চুপ করে বসে নেই। তাঁরা পরমাণুবোমা তৈরির চেষ্টায় আছেন এবং হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ইউরেনিয়াম রপ্তানী বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি ও ফের্মি পরমাণুবোমার রহস্য উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছি। কিন্তু এই বোমা বানাতে বহু কোটি টাকার প্রয়োজন। সেই জন্য আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে অনুরোধ করতে হবে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরমাণু বোমা বানাতে। এই বিষয়ে আমরা বিজ্ঞানীরা সাহায্য করব। তাছাড়া দরকার হবে আরও বহু বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার এবং কারিগরের। আপনি দয়া করে, তাড়াতাড়ি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করে কিংবা চিঠি লিখে তাঁকে এই বিষয়টি বুঝিয়ে পরমাণু-বোমা তৈরির একটি প্রকল্প গ'ড়ে তুলে সেটির সার্থক রূপায়ণ করতে অনুরোধ করুন, আর বেলজিয়ামের রাণীর (এলিজাবেথ) কাছ থেকে ইউরেনিয়াম আমদানির বন্দোবস্ত করুন।"

আইনস্টাইন সব শুনে একটু চুপ করে থেকে বেশ কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, "এতে কি কোন ফল হবে? প্রেসিডেন্ট তো আমাকে চেনেন না।"

বিজ্ঞানীদ্বয় তাঁকে হেসে বললেন, 'আপেক্ষিকতাবাদের স্রষ্টাকে পৃথিবীর প্রায় সব মানুষ, এমন কি প্রেসিডেন্টও চেনেন এবং শ্রদ্ধা করেন।' তবু আইনস্টাইন চুপ করে থাকলেন দেখে ৎসিলার্ড বললেন, "যে হিটলার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ নিরীহ ইহুদীকে

অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছে, সেই দানব হিটলার যদি পরমাণু-বোমা পায় তবে পৃথিবীর সব মানুষকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না। ইউরোপের পরিস্থিতি এখন এরূপ যে, যে কোনও সময় বিশ্ব বিধ্বংসী যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।" প্রকৃতপক্ষে হয়েছিলও তাই। মাসখানে পরে 1939 খ্রিস্টাব্দের 1লা সেপ্টেম্বর, হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

যাইহোক, ৎসিলার্ডের ওই কথায় কাজ হল। আইনস্টাইন রুজভেল্টের কাছে যে চিঠি লিখতে হবে তার মূলবিষয়গুলি লিখে ৎসিলার্ডের হাতে দিলেন। দুই বিজ্ঞানী সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেন কলম্বিয়ায়। তারপর আগস্ট মাসের প্রথমদিকে ৎসিলার্ড আইনস্টাইনের দেওয়া খসড়ার ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের জন্য একটি চিঠি টাইপ করে প্রিন্সটনে এলেন তাঁর সই করাতে। ফের্মিদের অনুরোধ রাখলেন আইনস্টাইন। সই করে দিলেন টাইপ করে আনা ওই চিঠিটিতে।

আইনস্টাইন এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক চিঠিতে সই দিলেন 2রা আগস্ট, 1939 খ্রিস্টাব্দ। এই চিঠির বঙ্গানুবাদ এই রকম ঃ

F. D. Roosevelt
President of the United States
White House,
Washington D. C. August 2, 1939

মহাশয়,

এনরিকো ফের্মি [Enrico Fermi] এবং ৎসিলার্ড [Leo Szilard] এই দুই বিজ্ঞানীর সাম্প্রতিক কতকগুলি বৈজ্ঞানিক গবেষণার তথ্য আমার হাতে এসেছে। এগুলি থেকে আমি বুঝতে পারছি যে, অদূর ভবিষ্যতে ইউরেনিয়াম পদার্থটি একটি নতুন এবং প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস হতে চলেছে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে, প্রশাসনিক দিক দিয়েই সত্ত্বর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। এই সব চিন্তা করে আপনার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আপনাকে জানানো কর্তব্য বলে মনে করলাম।

গত চার মাসে ফ্রান্সে জোলিও এবং আমেরিকাতে ফের্মি ও ৎসিলার্ডের গবেষণায় এটা সম্ভবপর হয়েছে যে, বৃহৎ পরিমাণে ইউরেনিয়াম ধাতুতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারাবাহিক পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রচণ্ড শক্তি ও নতুন ধরনের রেডিয়াম তুল্য পদার্থ সৃষ্টি করা যাবে। এখন এই রকম প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এটি সম্ভব হবে খুব শিগগির।

এই নতুন প্রক্রিয়াতে বোমা প্রস্তুত করাও সম্ভবপর হবে। যদিও খুব নিশ্চয় করে বলা যায় না, তবুও আমার অনুমান যে, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা সৃষ্টি করা যাবে। এই রকম একটি বোমা একটা জাহাজে নিয়ে গিয়ে কোন বন্দরে সেটির বিস্ফোরণ ঘটালে সমস্ত বন্দরটিও তার আশপাশের স্থানগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এই বোমাগুলি বয়ে নেবার পক্ষে হয়ত খুবই ভারী হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামান্য পরিমাণে নিকৃষ্ট ধরনের আকরিক ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। কানাডাতে ও পূর্বেকার চেকোশ্লোভাকিয়াতে উৎকৃষ্ট প্রকারের এই ধাতু পাওযা যায়। তবে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উৎসস্থল হল বেলজিয়ান কঙ্গো।

এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক বিভাগ ও আমেরিকাতে যে পদার্থবিজ্ঞানীর দলটি ধারাবাহিক পারমাণবিক বিক্রিয়ার বিষয়টি নিয়ে গবেষণারত—এই দুইয়ের মধ্যে একটি স্থায়ী যোগাযোগের কথা কাম্য বলে আপনি বিবেচনা করতে পারেন।

আমি জানতে পেরেছি যে, জার্মান সরকার তাদের অধিকৃত চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ইউরেনিয়াম বিক্রয় বন্ধ করে দিয়েছে। জার্মান সরকারের আন্ডার সেক্রেটারী [Under Secretary] ফন ডিজস্যাকারের ছেলে বার্লিনের কাইজার ভিলহেলেম ইনস্টিটিউটে কাজ করায়, এত তাড়াতাড়ি এই বিক্রয় বন্ধ করবার উদ্দেশ্য থেকে বোধ হয় ধারণা করা যেতে পারে যে, আমেরিকাতে ইউরেনিয়াম নিয়ে যে কাজটি হচ্ছে, সেখানেও সেই কাজটি হচ্ছে।

আপনার বিশ্বস্ত
এ. আইনস্টাইন

বিজ্ঞানীরা তখনও জানেন না পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের জন্য কতটা ইউরেনিয়াম লাগবে, বোমার আকার, আয়তন, ভর কতটা হবে। জানা ছিল না বলেই আইনস্টাইন লিখেছিলেন যে, বোমাটি হয়তো এতে ভারী হবে যে, সেটিকে জাহাজ করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে, বিমানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিছুদিন পরে বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন ধারাবাহিক বিক্রিয়ার জন্য U^{235} আইসোটোপের প্রয়োজনীয় 'সঙ্কট ভরের' [Critical Mass] পরিমাণ। এই সঙ্কটভরের অধিক ভর বিশিষ্ট কোনও U^{235} আইসোটোপের সবচেয়ে কম আকার ও আয়তন একাট টেনিস বলের সামান্য বড়ই হবে। ৎসিলার্ড অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করার পর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বিশিষ্ট বন্ধু ধনবান এবং বিদ্বান আলেকজাণ্ডার স্যাক্সের [Alexander Sachs] কাছে গিয়ে সব বিষয় আলোচনার পর চিঠিটি তাঁর হাতে দিলেন। স্যাক্স অক্টোবরের [1939] মাঝামাঝি রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ওই চিঠিটি দিয়ে সমস্ত বিষয়টি বুঝিয়ে বললেন। রুজভেল্ট সামরিক কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু সামরিক বিভাগ পরমাণু বোমা নিয়ে সে সময় মাথা ঘামালো না। তাঁদের বিজ্ঞান-জ্ঞান না থাকায় আইনস্টাইনের চিঠিটা ঠিক কী কাজে লাগানো হবে তা তাঁরা ঠিক করে উঠতে পারলেন না। ফলে, চিঠিটা সামরিক দপ্তরেই পড়ে রইল।

ফের্মি এবং ৎসিলার্ডের চেষ্টা তখনকার মত ধামা চাপা পড়ে গেল। ফের্মি কিন্তু গবেষণা চালিয়ে 1942 সালের 2রা ডিসেম্বর আবিষ্কার করে ফেললেন পারমাণবিক চুল্লি, যেখানে নিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটানো যাবে পারমাণবিক বিভাজন [Atomic Fission]।

এদিকে হিটলার অতি দ্রুত পোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস অধিকার করে ফ্রান্স আক্রমণ করলেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তিনি উত্তর ফ্রান্স অধিকার

করে নেওয়ার পর ফ্রান্স জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধাবসান চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। 1940 সালের 21শে জুন ফ্রান্সের ক্যাম্পেইন নামক স্থানে এক রেগলাড়ীর কামরায় বসে হিটলার ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধাবসানের ওই চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর হেরে যাওয়ার পর ঠিক ওই জায়গায়, ওই রেলকামরাতে বসে ফ্রান্স জার্মানীর আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল 1918 সালে। জার্মানী তার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল এইভাবে। সারা ইউরোপে বিভীষিকার সৃষ্টি হল। প্রায় গোটা ইউরোপের অক্ষশক্তির অধিকারে আসার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অক্ষশক্তিকে শায়েস্তা করার জন্য জাপানের সঞ্চিত যাবতীয় অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিল। দূর প্রাচ্যে শান্তি বজায় রাখবার আলোচনা চলাকালীন জাপান 1941 সালেই 7ই ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবার বন্দরটি বিমান আক্রমণে ধ্বংস করে ফেললো। ফলে, আমেরিকাও অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই সময় থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইনস্টাইনের সেই ঐতিহাসিক চিঠিটি খুঁজে বের করে, সেই চিঠির বক্তব্য অনুসারে কাজ শুরু করে। তৈরি হয় 'ম্যানহাট্টন পরিকল্পনা' [Manhattan Project]। লস অ্যালামসে [Los Alamos] তৈরি হল বিশাল গবেষণাগার। বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার [Robert Openheimer] নিযুক্ত হলেন সে গবেষণাগারের পরিচালক [Director]। এই পরিকল্পনার থেকেই তৈরি হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক বোমা। পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগানোর প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয় আইনস্টাইনের ওই বিখ্যাত চিঠিটির ভিত্তিতে। সেই জন্য রুজভেল্টকে লেখা মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ওই চিঠিটি এক 'ঐতিহাসিক পত্র'।

এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য একদল পদার্থবিজ্ঞানীকে অন্যান্যদের সঙ্গে নিযুক্ত করা হয়। ফের্মি ছিলেন এই দলের অন্যতম সদস্য। তাঁরই উদ্যোগে ওই ঐতিহাসিক পত্রের অবতারণা এবং ফলশ্রুতিতে পারমাণবিক বোমার উৎপাদনের লক্ষ্যে ম্যানহাট্টন প্রকল্পের স্থাপনা। ফের্মির উদ্দেশ্য ছিল না বোমা বানিয়ে নগর ধ্বংস করার, সভ্যতা নিশ্চিহ্ন করার। ফের্মি চেয়েছিলেন পরমাণুর প্রবলশক্তি মানুষের কল্যাণে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হোক। বিজ্ঞানীরা কখনও চান নি পারমাণবিক বোমা মানুষ ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করুক। 1945 সালের 16ই জুলাই প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের পরই বিজ্ঞানীরা পরমাণু বোমার বিশাল ধ্বংসের ক্ষমতার কথা জানলেন। তার আগে তাঁদের এই বোমার শক্তি উৎপাদন সম্পর্কিত জ্ঞান ছিল পুরোপুরি তত্ত্বীয়। পরমাণুবোমার প্রথম বিস্ফোরণের পর তার ধ্বংস শক্তির বহর দেখে আইনস্টাইন, ফের্মি প্রমুখ দিকপাল বিজ্ঞানীরা একবাক্যে এই বোমা ব্যবহার না করার অনুরোধ জানান আমেরিকার সামরিক কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু তাঁরা অনড় থাকেন তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্তে। ফলে, 'লিটল বয়' হিরোশিমায় ফেলা হয় 6ই আগস্ট, 1945 খ্রিস্টাব্দ। আর 'ফ্যাটম্যান' পড়েছিল 9ই আগস্ট, 1945 সালে নাগাসাকি শহরের উপরে।

চিঠিটি লেখার পর থেকেই আইনস্টাইন খুবই অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। তিনি ভাবলেন, বিজ্ঞানীরা পরমাণু বোমা বানাতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু তার মালিক হবে সামরিক

কর্তৃপক্ষ। আইনস্টাইন পৃথিবীর কোনও সামরিক কর্তৃপক্ষকে কখনই বিশ্বাস করতেন না, কেন না তারা নিষ্ঠুরভাবে মানবজাতির ধ্বংস সাধন করে। মানসিক অশান্তি নিয়ে আইনস্টাইন 1940 সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি তাঁকে জানালেন, হিটলার পরমাণু বোমা পেলে পৃথিবীর কী ভীষণ অবস্থা হবে সেই ভয়েই তিনি ওই চিঠিটি সই করেছিলেন। রুজভেল্ট তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে, ওই সাঙ্ঘাতিক বোমা যদি বিজ্ঞানীরা বানাতে সমর্থ হন, তবে সেগুলিকে অযথা অসামরিক নিরীহ মানুষকে মারবার জন্য ব্যবহৃত হবে না। আইনস্টাইন আশ্বস্ত হয়ে প্রিন্সটনে ফিরে এলেন।

জার্মানীর পরাজয়ের পর 1945 সালের 16ই জুলাই প্রথম পরমাণু-বোমাটির বিস্ফোরণের দিন ধার্য করা হল। স্থান নির্দিষ্ট করা হল আমেরিকার দক্ষিণে নিউ মেক্সিকোর অ্যালমাগোর্ড [Almogordo] নামে জায়গাটির এক জনহীন প্রান্তরে। বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য একটা লৌহস্তম্ভ বানানো হল। তার উপর ঘটানো হবে বিস্ফোরণ দূর-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে [Remote Control System]। স্তম্ভ থেকে দশ মাইল দূরে বানানো হল পর্যবেক্ষণ মঞ্চ। সুরক্ষিত এই পর্যবেক্ষণ মঞ্চে থাকলেন প্রকল্পের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তারা। তাঁরা আইনস্টাইনকেও আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। 16ই জুলাই নির্দিষ্ট সময় ওই স্তম্ভের উপর রাখা পরমাণু-বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটানো হল। রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপলেন স্বয়ং আইনস্টাইন। প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হল। বিস্ফোরণের পরের অবস্থা এই রকম ঃ

"এক উজ্জ্বলতম দিনের চেয়েও উজ্জ্বল এক আলোর ঝলকে সমস্ত জায়গাটা আলোকিত হয়ে উঠল। তিন মাইল দূরের পাহাড়শ্রেণী সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল। দীর্ঘকালব্যাপী এক কর্ণবিদারক গর্জনধ্বনি শোনা গেল। প্রচণ্ড চাপের এক ঝটিকাতরঙ্গ বৃত্তাকারে বাইরের দিকে ছুটে গেল। তারপরই অতি ধীরে স্ফীতকায় হয়ে ওঠা এক নানা রঙ বিশিষ্ট মেঘ মাটি থেকে উত্তাল তরঙ্গের মত উপরের দিকে উঠতে লাগল।

দেখে মনে হল, যেন এক বিশালকায় পশু শীতকালীন ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজেকে বিস্তার করছে। মেঘ যত উপরে উঠতে লাগল ততই অধিকতরভাবে স্ফীতকায় হতে থাকলো। তারপর ক্রমশঃ রঙগুলি ফ্যাকাশে হয়ে ভয়ঙ্কর রকমের এক ধূসর বর্ণ ধারণ করল। এক দুরন্ত বায়ু-প্রবাহ উত্তপ্ত হয়ে গলিত পদার্থগুলিকে ছড়িয়ে দিতে লাগল।"

বহুক্ষণ বাদে ধোঁয়ার আস্তরণ সরে গেলে পর্যবেক্ষকরা দেখলেন বিস্ফোরণের জায়গাটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। চারিদিকের বিস্তীর্ণ জায়গায় গাছ, ঘরবাড়ি, পাহাড় কিছুরই অস্তিত্ব নেই। শুধু আছে বিরাট আকারের এক গর্ত আর মাইলের পর মাইল জুড়ে ছড়ানো কালো পাথরের টুকরো। তত্ত্বমতে ধ্বংসের যে পরিমাণ ভাবা হয়েছিল বাস্তবে তার অনেক বেশি হওয়ায় এই বিশাল ধ্বংসলীলা দেখে উপস্থিত সবাই ভয়ে স্তব্ধ এবং হতবাক হয়ে গেলেন। এই সন্ত্রস্ত স্তব্ধতার মধ্যে আইনস্টাইন সবার আগে বলে উঠলেন, "প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের আগুন আবিষ্কারের পর আমাদের সমকালীন মানুষেরা বৃহত্তম বৈপ্লবিক শক্তিকে পৃথিবীতে নিয়ে এল"

ফের্মি আইনস্টাইনকে সভয়ে প্রশ্ন করলেন, "এই প্রলয়ঙ্কর মারণাস্ত্র কি কখনও শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে?" উপস্থিত সামরিক আধিকারিকদের একজন বলে উঠলেন, "যদি আমরা ব্যবহার না-ই করব, তবে অযথা করদাতাদের বহুকোটি ডলার মুদ্রা আমরা ব্যয় করলাম কেন, শুধু কি আপনাদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য?" আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মত ছিল যে, যদি এই অস্ত্রটি আমাদের কল্পনামত ধ্বংসাত্মক হয়, তবে এটিকে ব্যবহার করবার প্রয়োজন হবে না।' ওই সামরিক আধিকারিকটি বললেন, 'তিনি কি তাই বিশ্বাস করতেন?' আইনস্টাইন বললেন, "হ্যাঁ, শুধু যে এটি বিশ্বাস করতেন তাই নয়, তিনি আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, অন্য সব পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত এই অস্ত্রের ব্যবহার করা হবে না।" প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মারা গেলেন 12ই এপ্রিল, 1945 খ্রিস্টাব্দ। প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় ওই বছরের 16ই জুলাই। সামরিক কর্তৃপক্ষ তখন প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন যে, জাপানের হিরোসিমা শহরের উপর ফেলা হবে এই পারমাণবিক বোমা। কারণ জাপান তখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, আত্মসমর্পণ করে নি।

যাইহোক, ফের্মিই ছিলেন ম্যানহাট্টন প্রকল্পের অন্যতম নায়ক। আবিষ্কারের প্রয়োজনে তিনি চেয়েছিলেন এ রকম একটা প্রকল্প হোক। তাছাড়া তিনি ভাবতেন পরমাণু-শক্তিকে মানুষের কল্যাণে লাগাতে পারলে সভ্যতার প্রবল অগ্রগতি সম্ভব। তিনি কিংবা কোনও বিজ্ঞানীই চান নি পরমাণু বোমা বানিয়ে তা দিয়ে মানুষের ধ্বংস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হোক। পরমাণু শক্তিকে ধ্বংসের কাজে লাগিয়েছে রাজনীতির মানুষেরা। বিজ্ঞানকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে একদল মানুষের উপর যাঁরা রাষ্ট্র-পরিচালক।

1944 সালে ফের্মি আমেরিকার নাগরিক হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে 1946 সালে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ 'Institute for Nuclear Studies'-এ অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ফের্মি মাত্র 53 বছর বয়সে 1954 সালের 28শে নভেম্বর মারা যান। মৃত্যুর দিন অবধি তিনি উপরোক্ত অধ্যাপক পদে আসীন ছিলেন। এখানে এসে তিনি উচ্চশক্তির পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। পাইওন ও নিউক্লিয়ন [Pion-Nucleon] মিথস্ক্রিয়া নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা তিনি করেছিলেন।

জীবনের শেষের কয়েকটা বছর ফের্মি মহাজাগতিক রশ্মি [Cosmic Rays] নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। এ সম্পর্কে তিনি যে তত্ত্ব খাড়া করেন তা হল এই যে, এক সার্বিক চৌম্বক ক্ষেত্র [Universal Magnetic Field] বিশ্বজুড়ে একটা দৈত্যাকৃতি কণা-ত্বরায়ক [Accelerator] হিসাবে কাজ করছে এবং মহাজাগতিক রশ্মির কণাগুলিকে উচ্চশক্তি যোগান দিচ্ছে এই কণা-ত্বরায়ক চৌম্বক ক্ষেত্র।

ফের্মি তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে যেমন বহু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন তেমনি তিনি অনেকগুলি বইও লিখেছেন তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞানের উপর। তাঁর বইগুলির মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি হল ঃ

[1] 'Sulla quantizzazione del gas perfetto monoatomico'– বইটিতে ইলেকট্রন গ্যাস এবং কণাসমূহের গ্যাসের সংখ্যায়নের কথা বলা হয়েছে, যে সব কণা পউলি অপবর্জন নীতি মেনে চলে। প্রথম প্রকাশ 1926 খ্রিস্টাব্দ।

[2] 'Quantentheoric und Chemie' – বইটিতে বলা হয়েছে সাংখ্যিকীয় মডেল [Statistical Model]-এর কথা, যা টমাস-ফের্মি পরমাণু মডেল নামে খ্যাত। এছাড়া রয়েছে পরমাণুর গুণাবলীর হিসাবের অর্ধমাত্রিক পদ্ধতি [Semiquantitative Method]। প্রথম প্রকাশ 1928 খ্রিস্টাব্দ।

[3] "Uber die magnetischem Momente der Atomkerne" – বইটিতে আছে বর্ণালিরেখাসমূহের অতিসূক্ষ্ম গঠনের [Hyperfine Structure] মাত্রিক তত্ত্ব [Quantitative Theory]। এর থেকে কতকগুলি কেন্দ্রকের চৌম্বকীয় ভ্রামক নিরূপণ করা যায়। 1930 সালে প্রথম প্রকাশ।

[4] "Tentative di una teoria dei raggi β" – বইটি প্রকাশিত হয় 1933 খ্রিস্টাব্দে। এতে β-নিঃসরণ তত্ত্ব আছে পউলির নিউট্রিনো অনুসিদ্ধান্তের [Neutrino Hypothesis] পরিপ্রেক্ষিতে।

[5] 'Radioattivita indotta dal bombardamento di neutronı' – এটি প্রকাশিত হয় 1934 সালে। ইংরেজীতে রয়্যাল সোসাইটির প্রসিডিংসে প্রকাশিত হয় 'Artificial Radio-activity produced by neutron bombardment'—এই নামে 1934-1935 সালেই। 1936 সালে Physical Review পত্রিকায় বের হয় 'On the absorption and diffusion of slow neutrons'—এই নামে কিছু গবেষণাপত্র। নিউট্রন সংক্রান্ত তত্ত্বীয় সমস্যা নিয়ে তিনি বিশদ আলোচনা করেন তাঁর 'Sulmoto del neutroni Lenti'—নামের বইটিতে। এটি প্রকাশিত হয় 1936 সালে। আগেই বলা হয়েছে, 1938 সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ফের্মিকে 'for his work on the artificial radioactivity produced by neutrons and for nuclear reactions brought about by slow neutrons'। এগুলিই রয়েছে তাঁর 1934 থেকে 1936 সালের মধ্যে প্রকাশিত এই প্রবন্ধসমূহে এবং বইগুলিতে।

[6] তাঁর গবেষণাপত্রগুলির একটা সংকলন বের করা হয় 1959 সালে তাঁর মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বছর পরে। এগুলি সংকলনের যে কমিটি করা হয় তার চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক ই. সেগ্রেই [Prof. E. Segré], যিনি পরা-প্রোটন [Antiproton] আবিষ্কার করে ও. চেম্বারলেনের [O. Chamberlain] সঙ্গে একযোগে 1959 সালে নোবেল পুরস্কার পান। এই সেগ্রেই ছিলেন ফের্মির ছাত্র এবং বন্ধুও।

ফের্মি বহু অ্যাকাডেমির সদস্য পদে মনোনীত হয়েছিলেন। কি ইতালি, কি আমেরিকা উভয় দেশেই তিনি বহু অ্যাকাডেমি কিংবা সংস্থার সম্মানিত সদস্য মনোনীত হন। 1929 সালে তিনি ইতালির রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র 28

বছর। তিনি ছিলেন ওই সোসাইটির প্রথম 30 জন সদস্যের একজন। অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রদের কাছে তিনি খুব প্রিয় ছিলেন। তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন কয়েকটি কোর্স পড়ান মিশিগান, আন আরবর [Ann Arbor] এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। আগেই বলেছি, ফের্মির সম্মানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি দপ্তর একটা পুরস্কার চালু করে 50,000 ডলার মূল্যের। এই পুরস্কারের নাম ছিল 'এনরিকো ফের্মি পুরস্কার'। এই পুরস্কারের প্রথম প্রাপক ছিলেন ফের্মি নিজেই। তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল পরমাণুর উপর তাঁর বিভিন্ন কাজের স্বীকৃতিতে।

1954 সালের 29শে নভেম্বর মাত্র 53 বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতেই। তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর সেরা বিজ্ঞানীদের অন্যতম। নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর দান অপরিসীম। তিনি তখনই কল্পনা করতেন বিশাল বিশাল কণা-ত্বরায়ক যন্ত্রের। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, একদিন এমন একটা কণা-ত্বরায়ক যন্ত্র তৈরি হবে যা পৃথিবীর পুরো নিরক্ষরেখা বেষ্টন করে অবস্থান করবে।

"Fermi is recognized among physicist as one of the great scientists of the 20th century. Every college physics student sees his name in textbooks as a major contributor to important ideas, not just in nuclear physics, but in many aspects of physical science. He worked always at the forefront of knowledge, and loved the excitement of being involved in breakthroughs in physics.

To Fermi high energy physics was the most exciting area of physics. He accurately predicted that giant accelerators (such as Fermilab's) would be built in the future. In lighter moments, he even dreamed of an accelerator that would be built at the equator and encircle the globe!"

1969 সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তাঁর নামে এক বিশাল পরমাণু পরীক্ষাগার নির্মাণ করে। তার নাম দেওয়া হয় 'Fermilab'। এই পরীক্ষাগারটি তাঁর নামে উৎসর্গ করে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের [US Atomic Energy Commission] চেয়ারম্যান গ্লেন টি. সীবর্গ [Glem T. Seaborg] বলেছিলেন ঃ "It is particular fitting that we honour Dr. Fermi in this manner, for in so doing we further acknowledge his many contributions to the progress of nuclear science, particularly his work on nuclear processes."

তিনি বলতেন ঃ "There are two possible outcomes : If the result confirms the hypothesis, then you've made a measurement. If the result is contrary to the hypothesis, then you've made a discovery."

আবারো বলি, 1954 সালে 29 শে নভেম্বর ক্যান্সার রোগে মারা যান এনরিকো ফের্মি। মৃত্যুর আগের বছর 1953 সালে তিন একবার জন্মভূমি ইতালি পরিক্রমা করে আসেন। এটাই ছিল তাঁর শেষ স্বদেশ যাওয়া। ফের্মিকে বলা হয় 'পরমাণুবোমার জনক' [Father of Atomic Bomb]।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী লারা [Laura] ফের্মি একটা বই লেখেন। বইটির নাম 'Atoms in the Family : My life with Enrico Fermi'। এটি এনরিকো ফের্মির একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ।

শেষ করার আগে আবার একটু ফিরে আসা যাক ফের্মির আবিষ্কারের কথায়। নতুন তেজস্ক্রিয় মৌল আবিষ্কারের ব্যাপারে ফের্মির অবদানের কথা বলা হয়েছে আগেই। আবার ফিরে আসি সে কথায়।

মেন্ডালীয়েভের [Mendeleyev] পর্যায় সারণী 92 নম্বরের ধাতু ইউরেনিয়ামে পৌঁছেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। 92-এর পরবর্তী অর্থাৎ 93, 94, 95, 96 প্রভৃতি নম্বরের ধাতুগুলির বা মৌলগুলির কোন উল্লেখ পর্যায় সারণীতে ছিল না। তাই পর্যায় সারণীর ছকটি একদিন বিস্মিত করল ইতালির এই পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক এনরিকো ফের্মিকে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে প্রশ্ন এল, পর্যায় সারণী 92 নম্বর ধাতুতে এসে কেন থেমে গেল? 93, 94 প্রভৃতি নম্বরের ধাতুগুলির কী পৃথিবীতে কোন অস্তিত্ব নেই? তাই যদি হয়, তাহলে ওদের কি কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করা কোনমতেই সম্ভব নয়? এই প্রশ্ন ফের্মির মনে অনেকদিনই জাগরূক ছিল।

সেদিন অধ্যাপক এনরিকো ফের্মি মনে মনে প্রশ্ন করেই ক্ষান্ত হলেন না। কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে তিনি বসে গেলেন গবেষণা করতে। ততদিনে অবশ্য নিউট্রন আবিষ্কৃত হয়েছে। আলফা কণার আঘাতে রাদারফোর্ড পরমাণুর কেন্দ্রককে এর অগেই বিভাজিত করেছেন। পৃথিবীজুড়ে বিজ্ঞানীরা চালাচ্ছেন কেন্দ্রক সম্বন্ধে গবেষণা। ফের্মি ভাবলেন, নিউট্রনের আঘাতেই ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রককে তিনি বিভাজিত করবেন। কারণ, নিউট্রনরা তড়িৎ নিরপেক্ষ বলে ধনাত্মক তড়িৎবিশিষ্ট পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক কর্তৃক বিকর্ষণের কোন সম্ভাবনা নেই। আগেই বলেছি, কিছুদিন গবেষণার পর একদিন ফের্মি এবং তাঁর সহকর্মী ছাত্রদের প্রচেষ্টা সার্থক হল। ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে একে একে লাভ করলেন নেপচুনিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম নামক দুটি ধাতু যাদের পারমাণবিক নম্বর যথাক্রমে 93 ও 94। ফের্মি এবং তাঁর সহকর্মীদের গবেষণা এইখানে থেমে গেল না। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করল 95 ও 96 পারমাণবিক সংখ্যার [Atomic Number] তেজস্ক্রিয় মৌল বা ধাতুগুলি। স্বাভাবিক অবস্থায় যে ইউরেনিয়ামকে পাওয়া যায় তার পারমাণবিক ওজন 238। 238 পারমাণবিক ওজনের ইউরেনিয়াম ছাড়াও ইউরেনিয়ামের আরও দুটি আইসোটোপ বা সমস্থানিক পাওয়া যায়, সে দুটি হল, ইউরেনিয়াম-235 এবং ইউরেনিয়াম-234। স্বাভাবিক ইউরেনিয়ামের মধ্যে ওরা অবস্থান করলেও তার পরিমাণ অতি নগণ্য। খনি থেকে পাওয়া স্বাভাবিক ইউরেনিয়ামে ইউরেনিয়াম-238 থাকে 19.3% ইউরেনিয়াম-235 থাকে মাত্র 0.7% এবং ইউরেনিয়াম-234 থাকে মাত্র .008%। বিভাজনের জন্য ইউরেনিয়াম-235 বেশি কার্যকর। তাই ওর স্বল্পতা বিজ্ঞানীদের আশাহত করেছিল। ফের্মির আবিষ্কার নতুন করে আশা জাগাল বিজ্ঞানীদের মনে।

নীল্‌স্ বোরের গবেষণা থেকে প্রথম প্রমাণিত হয়, ইউরেনিয়াম-235-এর কেন্দ্রককে মন্দগামী নিউট্রনরা বিভাজিত করতে পারে। ইউরেনিয়াম-238-এর কেন্দ্রককে বিভাজিত

করতে হলে প্রয়োজন হয় দ্রুতগামী নিউট্রনের। ফের্মি দেখালেন, যদি মাঝামাঝি গতিশক্তিবিশিষ্ট নিউট্রনের দ্বারা ইউরেনিয়াম -238-এর কেন্দ্রককে আঘাত করা যায় তাহলে কেন্দ্রকটি বিভাজিত না হয়ে ওটি নিউট্রনকে আত্মসাৎ করে নেয়। তারফলে জন্মলাভ করে ইউরেনিয়ামের আর একটি আইসোটোপ বা সমস্থানিক, যার নাম ইউরেনিয়াম-239।

ইউরেনিয়াম-239 এর স্থায়িত্ব কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। অনতিবিলম্বে একটি একটি করে বিটা কণা হারিয়ে এটি উৎপন্ন করে নেপচুনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম। নেপচুনিয়ামের স্থায়িত্বও বেশ কম। তবে প্লুটোনিয়ামের স্থায়িত্ব নেপচুনিয়াম অপেক্ষা অনেক বেশি। পর্যায় সারণীতে এরা যথাক্রমে 93 নম্বর এবং 94 নম্বরের ধাতু।

এনরিকো ফের্মি 94 নম্বরের ওই মৌলটি আবিষ্কার করার পর তৎকালীন ইতালির সর্বময় কর্তা মুসোলিনীর নামানুসারে নামকরণ করতে চেয়েছিলেন "মুসোলিনিয়াম"। কিন্তু ধাতুটির জীবনকাল যেহেতু খুবই অল্প তাই স্বয়ং মুসোলিনীই উক্ত বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করেন। পরে ধাতুটির নামকরণ করা হয় 'প্লুটোনিয়াম' [Plutonium]।

পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে ওই প্লুটোনিয়ামের গুরুত্ব অনেকখানি। কারণ ইউরেনিয়াম-238 কে সহজভাবে পাওয়া গেলেও ইউরেনিয়াম-235-কে সহজভাবে পাওয়া যায় না। আবার মন্দগামী নিউট্রনের সাহায্যে ইউরেনিয়াম-235 -কেই সহজে ভাঙ্গা যায়। ইউরেনিয়াম -238-কে ভাঙ্গতে হলে চাই দ্রুতগামী ও শক্তিমান নিউট্রন। তেমন শক্তিমান নিউট্রন সহজলভ্যও নয়। প্লুটোনিয়াম কার্যকর। অর্থাৎ মন্দগামী নিউট্রনের সাহায্যে প্লুটোনিয়ামের কেন্দ্রককে অনায়াসে বিভাজিত করা যায়। সেই কারণে পারমাণবিক বোমার ক্ষেত্রে তো বটেই, অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্লুটোনিয়ামের কেন্দ্রককে বিধ্বস্ত করে শক্তি উৎপন্ন করার পরিকল্পনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। অথচ এই প্লুটোনিয়াম ধাতুটি একেবারে কৃত্রিম ধাতু। পৃথিবীর কোন খনিতে একে পাওয়া যায় না। বিশেষ চেষ্টার দ্বারা গবেষণাগারেই প্লুটোনিয়ামকে প্রস্তুত করে নিতে হয়। ফের্মির পরে বিখ্যাত জাপানী বিজ্ঞানী ডঃ নিশিনা এবং মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ ই. ও. লরেন্স, যিনি সাইক্লোট্রন যন্ত্রের আবিষ্কর্তা হিসাবে 1939 খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, পৃথক পৃথকভাবে নেপচুনিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম প্রস্তুত করতে সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে, সেই থেকেই পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা জোরদার হয় এবং অচিরে এই শক্তিকে মানুষের কল্যাণকর কাজে লাগানোর আগেই তাকে ধ্বংসের কাজে লাগানো হয়। এই অপকর্মটি অনুষ্ঠিত হয় রাজনীতিবিদদের মদতে। এসব কথা আগেই বলা হয়েছে।

আগেই বলেছি, ফের্মি 1938 সালে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করতে সপরিবারে সুইডেন যান এবং আর ইতালি ফিরে আসেন নি, চলে যান আমেরিকায়। তাঁর এই দেশত্যাগের কারণ হল তিনি সে সময় ইতালির ফ্যাসিবাদীদের রোষের শিকার হতে চলেছিলেন। তার মুল কারণ হল তাঁর স্ত্রী লারা ছিলেন ইহুদি বংশোদ্ভুত। মুসোলিনী তথা হিটলারের কোপ থেকে পরিবারকে বাঁচাতে গিয়েই ফের্মি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

'পরমাণু বোমার জনক' ফের্মি কিন্তু আজীবন চেয়েছেন পরমাণুর সুবিশাল শক্তিকে মানব কল্যাণের কাজে লাগানো হোক। পারমাণবিক চুল্লি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তিনি

সভ্যতার নতুন সমৃদ্ধ দিগন্তের সূচনা করেন। ফের্মি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী। শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে তাঁকে সম্ভবতঃ আইনস্টাইনের পরেই স্থান দেওয়া যেতে পারে।

ফের্মি আবিষ্কৃত সংখ্যায়ন নিয়ে আগেই বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে ডিরাকের জীবনী নিয়ে আলোচনা করার সময় ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন নিয়ে মৌটামুটি বিস্তৃতভাবেই সব কিছু বলা হয়েছে। শেষ করার আগে ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন নিয়ে সামান্য কিছু বলে নিই। ফের্মি 1926 সালে তাঁর নতুন সংখ্যায়ন প্রকাশ করেন। ডিরাকও একই সময়ে ওই একই সংখ্যায়ন পেশ করেন। তাই এই সংখ্যায়নের নাম হয় 'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন'। পরবর্তীকালে এই সংখ্যায়ন 'ফের্মি সংখ্যায়ন' নামে পরিচিত হয়। যেসব কণা 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' বা 'বোস-সংখ্যায়ন' মেনে চলে তারা যেমন এখন 'বোসন' [Bosson], নামে অভিহিত হয়, তেমনি যারা 'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন' বা 'ফের্মি সংখ্যায়ন' মেনে চলে তাদের এখন বলা হয় 'ফের্মিয়ন' [Fermion]।

সনাতন সংখ্যায়ন, বোস সংখ্যায়ন এবং ফের্মি সংখ্যায়নের বন্টন সূত্রগুলি এই রকম ঃ

$$n_s = \frac{A_s}{fe^{\beta E_s}} \quad \text{[ম্যাক্সওয়েল-বোল্ৎজমান]}$$

$$n_s = \frac{A_s}{fe^{\beta E_s} - 1} \quad \text{[বোস-আইনস্টাইন]}$$

$$n_s = \frac{A_s}{fe^{\beta E_s} + 1} \quad \text{[ফের্মি-ডিরাক]}$$

যেখানে,

n_s = s-তম Sheet-এ কণা সংখ্যা

A_s = s-তম Sheet-এ কোষসংখ্যা

$\beta = \frac{1}{kT}$ = ধ্রুবক

k = বোল্ৎজমান ধ্রুবক [Boltzmann's Constant]

T = চরম তাপমাত্রা

E_s = s-তম Sheet-এ কণার শক্তি

f = অপেক্ষক [Function] $= \frac{V}{nh^3}(2\pi mkT)^{3/2}$

ফের্মিয়নদের চক্রণী কৌণিক ভরবেগ [Spin Angular Momentum] হল $^1/_2$ h-এর পূর্ণ বিজোড় গুণিতক অর্থাৎ $^1/_2$ h, $^3/_2$ h, $^5/_2$ h, $^7/_2$ h ইত্যাদি। বোসনদের ক্ষেত্রে এটা o, h, 2h, 3h, প্রভৃতি। কণা জগতে কণারা কেন কেবলমাত্র এই দু'ধরনের সংখ্যায়ন মেনে চলে তা আজও অজানা। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলে হয়ত আপেক্ষিকতাবাদ এবং কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানকে মিলিয়ে ফেলা যেত। একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব হয়ত পেতে পারতো আরও দৃঢ়তর ভিত্তিভূমি। ●



যৌবনে আবদুস সালাম [1926-1996]



সাধনারত আবদুস সালাম [1926-1996]

আবদুস সালাম

[1926–1996]

অবিভক্ত ভারতবর্ষের লাহোর শহর থেকে প্রায় 200 কিলোমিটার দূরে 'ঝাঙ' [Jhang] নামের ছোট্ট একটা শহর। জায়গাটা এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত। এই ঝাঙয়েই 1926 খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন আবদুস সালাম। জন্মসূত্রে তিনি ভারতীয়। তবে স্বাধীনতার সময় দেশভাগের ফলে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর লাহোর অঞ্চল চলে যায় পাকিস্তানে। ঝাঙ এখন পাকিস্তানে। সালামকে তাই বলা হয় পাকিস্তানী। জন্মসূত্রে সালাম কিন্তু ভারতীয়ই। তিনি যখন জন্মান তখন ঝাঙ ভারতেই ছিল।

সালামের বাবা মহম্মদ হোসেন ছিলেন সরকারের শিক্ষা দপ্তরের কর্মচারী। ঝাঙ অঞ্চলটা ছিল কৃষি প্রধান। এখানকার অধিবাসীদের মুখ্য জীবিকাই ছিল কৃষিকাজ। সালাম পরিবার কয়েক পুরুষ ধরেই ছিল ধর্মানুরাগী। সালামের বাবাও ছিলেন প্রবল ধর্মানুরাগী। এঁদের পরিবারে শুধু ধর্মানুরাগই নয়, শিক্ষা চর্চাও ছিল। সুতরাং এক শিক্ষিত, ধর্মানুরাগী পরিবারে 1926 খ্রিস্টাব্দে জন্মেছিলেন আবদুস সালাম। তাঁর জন্মদিন 29 শে জানুয়ারী। তাঁর মায়ের নাম হাজিরা বেগম।

ছেলেবেলা থেকেই সালাম খুবই মেধাবী ছিলেন। স্কুলে কিংবা কলেজে তিনি সব সময়ই রেকর্ড নম্বর পেয়ে পাশ করেছিলেন। আর সে সব রেকর্ড আজও অম্লান। স্কুলে কিংবা কলেজে পাওয়া তাঁর নম্বরগুলির রেকর্ড আজও কেউ ভাঙতে পারে নি। ভবিষ্যতে সে সব রেকর্ড কেউ ভাঙ্গতে পারবে বলেও মনে হয় না। স্কুলের শেষ পরীক্ষা তখন ছিল ম্যাট্রিকুলেশন [Matriculation]। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সে সময় লাহোর অঞ্চলের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত। মাত্র 14 বছর বয়সে রেকর্ড নম্বর পেয়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন আবদুস সালাম।

রেকর্ড নম্বর পেয়ে পাশ করায় সালামকে দেখতে সারা শহর ভেঙ্গে পড়ে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে স্কলারশিপ দেয়। তিনি লাহোরে এসে ভর্তি হন সেখানকার গভর্নমেন্ট কলেজে। কলেজের পরীক্ষায়ও তিনি রেকর্ড নম্বর পান। 1946 সালে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে এম. এ. [M.A.] পাশ করেন, রেকর্ড নম্বর পেয়ে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ওই বছরই তাঁকে একটা স্কলারশিপ দেয় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জন্স কলেজে [St. John's College] উচ্চতর শিক্ষালাভ করবার জন্য। 1949 সালে তিনি পদার্থবিদ্যা এবং অঙ্কে প্রথম শ্রেণীতে বি. এ. [অনার্স] পাশ করেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

সালামের ইচ্ছা ছিল তিনি লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে সিভিল সার্ভিসে যোগ দেবেন। সে ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয় নি। কারণ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে স্কলারশিপ দিয়ে কেম্ব্রিজে

পড়ার ব্যবস্থা করে। সে সময় সিভিল সার্ভিসের চাকুরি ছিল খুবই লোভনীয় এবং সম্মানেরও। কিন্তু কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে তাঁর মত বদলে যায়। এই সময় তিনি নোবেল-বিজ্ঞানী ডিরাক প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসেন। সালামের মধ্যে অনন্য প্রতিভা রয়েছে, তাঁরা তা বুঝতে পারেন। এই সব বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে অধ্যাপক ডিরাক তাঁকে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী হওয়ার উপদেশ দেন। এই পরামর্শ সালামের ভালো লাগে। তা ছাড়া তিনি ক্রমশঃ তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিলেন। এই সময়ই তিনি সিভিল সার্ভিসে যাওয়ার কথা ভুলে পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। গভীর গবেষণায় মগ্ন হন নিজেকে বিজ্ঞানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার আন্তরিক তাগিদে। কেম্বিজের মহারথী পদার্থবিজ্ঞানীরাই তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটান। সরকাবী চাকুরে হওয়ার বদলে সালাম হয়ে উঠেন পদার্থবিজ্ঞানের একনিষ্ঠ গবেষক এবং পরবর্তীকালে নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী। ডিরাক প্রমুখেরা তাঁকে উৎসাহিত না করলে তিনি যেমন নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী হতেন না, তেমনি পদার্থবিজ্ঞান সমৃদ্ধ হত না তাঁর বিশাল আবিষ্কারে। আইনস্টাইনের একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব [Unified Field Theory] লাভ করতে পারতো না এক ধাপ অগ্রগতি।

সালামের গবেষণা ডক্টর ফ্রেড হোয়েল [Dr. F. Hoyle]-এর অধীনে শুরু হয়। হোয়েল যে সময় নামকরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি অবশ্য বিখ্যাত হন 1964 সালে তাঁদের হোয়েল-নারলিকার তত্ত্বের জন্য, যেটি 'স্থির-অবস্থা-তত্ত্ব' [Steady State Theory] নামে খ্যাত। সালাম সাফল্য পান অল্প সময়ের মধ্যেই। 1950 সালে কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় সালামকে স্মিথ পুরস্কার [Smith Prize] দেয় প্রাক-ডক্টরেট গবেষণায় পদার্থবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার জন্য। এই সময় তিনি গবেষণা করছিলেন 'কোয়ান্টাম তড়িৎ-গতিবিদ্যা' [Quantum Electrodynamics] নিয়ে। 1951 সালে এ বিষয়ে তাঁর গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়। উচ্চমানের এই গবেষণাপত্রটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। কেবল কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় নয়, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের দিকপাল বিজ্ঞানীরা এই গবেষণাপত্রটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। 1951 সালে তাঁর এই গবেষণার জন্য সালামকে পি. এইচ. ডি [Ph D] ডিগ্রী দেওয়া হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র 25 বছর।

1951 সালেই সালাম লাহোরে ফিরে আসেন। ভারতবর্ষ তখন ভাগ হয়ে গেছে, স্বাধীন হয়েছে। তৈরি হয়েছে পাকিস্তান। তিনি পাকিস্তানে ফিরে এসে লাহোরের গবর্নমেন্ট কলেজে অঙ্কের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন। 1952 সালে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। সালাম পাকিস্তানে ফিরে এসেছিলেন এই ইচ্ছা নিয়ে যে, তিনি এখানে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা করবেন এবং একদল গবেষক তৈরী করবেন যাঁরা বিশ্বখ্যাত হয়ে উঠবেন। বহু চেষ্ট করেও সালাম তাঁর গবেষণা চালাতে পারলেন না। আর গবেষকের দল তৈরী করাটা তাঁর স্বপ্নই রয়ে গেল। সহযোগিতা, আর্থিক সাহায্য, ব্যবস্থাপনার অভাবে পাকিস্তানে তিনি কিছুই গড়ে তুলতে পারলেন না। আসলে পাকিস্তানে তখন তেমন গবেষণাগার গড়ে তোলার পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল না। ফলে, ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সালাম আবার বিদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সালাম সে সময় দেখেছিলেন, উন্নয়নশীল দেশ পাকিস্তানে নেই স্নাতকোত্তর আধুনিক গবেষণার উপযুক্ত গবেষণাগার, নেই কোনও আলোচনা সভার ব্যবস্থা, এমন কি নতুন গবেষণাসংক্রান্ত বিদেশী পত্র-পত্রিকা, জার্নালও তখন আনা হত না অর্থাভাবে। এই রকম একটা বিরূপ পরিবেশে সালাম একটা দোটানায় পড়লেন। তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তানে বিজ্ঞানের তথা পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার উন্নতি ঘটাতে। কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতি ছিল তাঁর প্রতিকূল। এতটাই প্রতিকূল ছিল যে, সালাম তাঁর নিজের গবেষণার অগ্রগতি নিয়েও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সুতরাং দেশাত্মবোধ ও বিজ্ঞান-গবেষণা এই দুটির মধ্যে কোন্‌টিকে তিনি বেছে নেবেন তাই নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হল তাঁর মধ্যে। কট্টর দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেই সারাজীবন স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর অন্তরের সত্তায় পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণার প্রবল স্পৃহা তাঁকে আবার বিদেশে নিয়ে গেল বৃহত্তর গবেষণার প্রয়োজনে। দেশের ওই প্রতিকূল পরিবেশ থেকে বেরিয়ে বিদেশের গবেষণা-অনুকূল পরিবেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন সালাম।

1954 সালে তিনি পাকিস্তান ছেড়ে আবার গেলেন কেম্ব্রিজে অধ্যাপক হয়ে। এরপর থেকে তিনি মাঝে মাঝে পাকিস্তান আসতেন পাকিস্তানের বিজ্ঞান নীতির উপদেষ্টা [Adviser] হিসাবে। পাকিস্তানে বিজ্ঞান প্রসার সম্পর্কে তাঁর কার্যাবলী ছিল সুদুরপ্রসারী প্রভাবসম্পন্ন। তিনি এরপর থেকে পাকিস্তানে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য নানা কাজ করেছিলেন। পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তি কমিশনের [Pakistan Scientific Commission] সদস্য ছিলেন সালাম। আবার 1961 থেকে 1974 সাল অবধি তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের মুখ্য বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা [Chief Scientific Adviser] ছিলেন।

1957 সালে সালাম লন্ডনের ইম্পিরিয়েল কলেজের তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের পূর্ণ-অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। তাঁর মধ্যে তখনও জাগরূক ছিলো নিজের দেশের ছেলে-মেয়েদের জন্য গবেষণাগার তৈরি করার প্রবল বাসনা। নিজের জাতির ছেলে-মেয়েরা যাতে প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী হতে পারে তার জন্য একটা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করার প্রবল ইচ্ছা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। পাকিস্তানে এ ধরনের গবেষণাগার তৈরি করতে না পেরে মনে মনে বেশ কষ্ট পাচ্ছিলেন সালাম। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন কোথাও একটা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করার যেখানে পাকিস্তানী ছাত্ররা উচ্চতর এবং আধুনিক তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা করার সুযোগ পাবে। তাঁর এই মহতী ইচ্ছা ফলপ্রসূ করার উপায় হিসাবে তিনি তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের এক আন্তর্জাতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন 1960 খ্রিস্টাব্দে। তাঁর এই আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্রে শুধু পাকিস্তানের গবেষকদের জন্য নয়, তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্য দ্বার উন্মুক্ত থাকবে এমন সিদ্ধান্তও নেওয়া হল। এই মহতী উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স' [International Centre for Theoretical Physics] ইতালির ত্রিয়েস্তে [Trieste] শহরে। এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠে আন্তর্জাতিক সাহায্যে। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সংস্থার দানে প্রতিষ্ঠিত হয় এই আন্তর্জাতিক কেন্দ্রটি। সালাম সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে সেই সব দেশের বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের

বুঝিয়ে ওই কেন্দ্রটি স্থাপনের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করেন। সালামের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়ই ত্রিয়েস্তে শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের ওই আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্র 'International Centre for Theoretical Physics' [ICTP]। সালাম এই সংস্থার ডিরেক্টর হন 1964 খ্রিস্টাব্দে এবং 1993 সালের ডিসেম্বর মাস অবধি এই কেন্দ্রের ডিরেক্টর ছিলেন। দীর্ঘ 30 বছর ধরে তিনি তাঁর নিজের হাতে গড়া এই সংস্থা তথা প্রতিষ্ঠানটির নানান উন্নতি করে গেছেন এটিকে একটি আদর্শ গবেষণাগার হিসাবে গড়ে তুলতে। ত্রিয়েস্তের এই গবেষণাগারটি এখন পৃথিবী বিখ্যাত।

আবদুস সালামের নাম চিরকালের জন্য এই আন্তর্জাতিক কেন্দ্রটির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এই কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠা করে তিনি যে শুধু আধুনিক ও উচ্চতর মানের গবেষণার পথ প্রশস্ত করেছে‌ন তা নয়, অন্যান্য দেশের কাছে, এই সংস্থাটি একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। অন্য সব দেশ এই ধরনের একটি করে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপন করুক এটাই এখন পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাম্য। ত্রিয়েস্তের এই আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্রটি বিশ্বের অধিকাংশ দেশের কাছেই আদর্শস্থানীয়। অধ্যাপক সালাম তাঁর ব্যক্তিত্বে এবং কর্মকুশলতায় পৃথিবীর বহু রাজনীতিবিদ এবং বিজ্ঞানীর শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে সালাম সেখানকার রাজনৈতিক প্রধান এবং বিজ্ঞান সংস্থাগুলির কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ রাখেন ত্রিয়েস্তের ওই আন্তর্জাতিক গবেষণাগারটি নির্মাণের জন্য। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সব দেশেই মানব কল্যাণের জন্য একটি করে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব তিনি এই সব দেশের নেতাদের বোঝাতে সমর্থ হন।

তৃতীয় বিশ্বকে বিজ্ঞান গবেষণায় আরো উন্নত করার জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন অধ্যাপক সালাম। উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বিজ্ঞান গবেষণার মেলবন্ধনে বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন সালাম। এই সব দেশের সরকার এবং নেতাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন, শান্তির জন্য, পারস্পরিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ত্রিয়েস্তের মত গবেষণাগার প্রতি দেশেই অন্ততঃ একটি করে গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। তিনি আবেদন করেছিলেন, এই ধরনের একটি করে গবেষণাগার প্রতি দেশেই নির্মিত হোক। পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে, শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান নিশ্চিত করতে ত্রিয়েস্তের গবেষণাগারের অনুকরণে পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই একটি করে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা দরকার। বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে ত্রিয়েস্তের ICTP এখন এক তীর্থস্থান। ত্রিয়েস্তের মডেলকে অনুসরণ করে পৃথিবীর আরও কয়েকটি দেশে নির্মিত হয়েছে গবেষণাগার। এই সব গবেষণাগার থেকে গত 30 বছরে প্রায় 150 টি দেশের 60,000 বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণার কাজ শেষ করেছেন। এ এক বিশাল কর্মযজ্ঞ।

ত্রিয়েস্তের এই গবেষণাগারে ব্যবস্থা আছে 'অ্যাসোসিয়েটশিপ'-এর [Associateship]। তরুণ অথচ প্রতিভাবান পদার্থবিজ্ঞানীরা এই অ্যাসোসিয়েটশিপ নিয়ে আসেন ত্রিয়েস্তের ICTP-তে। এখানে তাঁরা তাঁদের ছুটি কাটান নিজেদের গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে। বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণায় দিকপাল বিজ্ঞানীদের এনে তাঁদের তত্ত্বাবধানে রাখা হয় এই সব তরুণ গবেষকদের। ধরা যাক, যাঁরা অ্যাসোসিয়েটশিপ নিয়ে ত্রিয়েস্তে এলেন তাঁদের

সাত জন পদার্থবিজ্ঞানের একই বিষয়ে গবেষণা করবেন বা করছেন। এই সাতজনকে রাখা হবে ওই বিষয়ের কোন বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে। আলাপ-আলোচনার নিবিড় পরিবেশে, বিখ্যাত বিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে এগিয়ে চলে তাঁদের গবেষণা। নিজেদের মধ্যে নানান পারস্পরিক আলোচনার ফলে কোন গবেষকের একাকীত্ব বোধ যেমন দূর হয়ে যায়, তেমনি ওই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী তাঁকে বা তাঁদেরকে 'গাইড' করতে পারেন গবেষণায়। অ্যাসোসিয়েটশিপের প্রথম তিন মাস তরুণ গবেষকদের সময় তাই কাটে উত্তেজনার এক উৎসাহজনক পরিবেশে। প্রত্যেকেই তাঁর নিজ গবেষণা-ক্ষেত্রের জ্ঞান সংগ্রহ্ করে উদ্দীপিত হয়ে ফিরে যান নিজের দেশে কিংবা কর্মক্ষেত্রে। সেখানে তাঁরা বছরের বাকী নয় মাস গবেষণার বিষয় নিয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তাভাবনা, প্রয়োগ ইত্যাদি করতে পারেন। এইভাবে গবেষণা এগিয়ে চলে। তরতাজা ভাবনা-চিন্তা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গবেষকরা পরের পঠন-বর্ষে নতুন অ্যাসোসিয়েটশিপ গ্রহণ করে আবার তিন মাসের জন্য চলে আসেন ত্রিয়েস্তেতে।

সালাম 1957 সাল থেকে লন্ডনের ইম্পিরিয়েল কলেজে অধ্যাপনা করছিলেন। 1964 সালে তিনি ত্রিয়েস্তের ICTP-র ডিরেক্টর হন। দুটি কাজই তিনি চালিয়ে যান একই সঙ্গে। 1993 সালের ডিসেম্বর মাস অবধি তিনি ডিরেক্টার ছিলেন ICTP-র। তাঁর গবেষক জীবন চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে বিস্তৃত ছিল। এই গবেষক জীবনের প্রায় সবটাই তাঁর কেটেছে মৌলিক কণাদের গবেষণায়। তাঁর গবেষণা ছিল 'তত্ত্বীয় মৌলিক-কণা পদার্থবিজ্ঞান' [Theoretical Elementary Particle Physics]। বিংশ শতাব্দীর তিন ভাগ জুড়ে যে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব [Unified Field Theory] নিজের শক্ত ভিত্তিভূমি খুঁজে পাচ্ছিল না, তাকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন সালাম তাঁর 'ইলেকট্রোউইক তত্ত্ব' দিয়ে [Electro-weak Theory]। কণা-পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান অসামান্য। আইনস্টাইনের বহু আকাঙ্ক্ষিত একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বকে তিনি এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন তাঁর অনন্য সাধারণ মেধায় এবং প্রতিভায়।

প্রায় 35 বছর ধরে তিনি অধ্যাপনা করেন। ছাত্রদের কাছে, গবেষকদের কাছে তিনি খুবই প্রিয় ছিলেন। সারাজীবনে তিনি বহু বিজ্ঞান-সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন কমিটিতে তিনি সদস্য হয়েছিলেন। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সংক্রান্ত ওই কমিটিগুলির সদস্য থাকাকালীন সালাম ওই সব দেশের উন্নয়নে নানা প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করেন। সালাম সারাজীবন নিজেকে কর্মব্যস্ত রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছুটির দিন বলতে কিছুই ছিল না। রবিবার কিংবা অন্যান্য ছুটির দিনেও তিনি সমানে কাজ করতেন। তিনি নিজে এতা বেশী কাজ করতেন যে, তাঁর কাজ দেখে ICTP-র অন্যান্য কর্মীরা কখনও বলতে সাহস পেতো না যে তারা অনেক বেশী কাজ করছে। সমস্ত কর্মচারীর তুলনায় তিনি অনেক বেশী কাজ করতেন। আর তাই তাঁর অধস্তন কর্মচারীরা কখনও এমন অনুযোগ করতে পারে নি যে, তাদের কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী।

অধ্যাপক সালাম বিখ্যাত হয়েছেন তাঁর ইলেকট্রোউইক তত্ত্বের [Electroweak Theory] জন্য। তত্ত্বীয় গবেষণায় তিনি আবিষ্কার করেন তড়িচ্চুম্বকীয় বল এবং দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার

[Weaker Interaction] গাণিতিক সম্পর্ক। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বকে একধাপ এগিয়ে দেয় এই আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের জন্য অধ্যাপক সালামকে স্টিভেন ভিনবার্গ [Steven Weinberg] এবং শেলডন গ্লাসো [Sheldon Glashow]-দের সঙ্গে একত্রে 1979 সালের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এই তত্ত্ব পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয় 1983 সালে। সালামদের কল্পিত $W^{\pm}$ ও Z^{0} কণা দুটিই আবিষ্কৃত হয় সের্ন [CERN]-এর পরীক্ষাগারে। কার্লো রুব্বিয়া ও সাইমন ভ্যানডার মির জেনিভার সের্নের বিখ্যাত সুপারপ্রোটোসিন্ক্রোট্রন [Superprotosynchrotron] যন্ত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ করেন $W^{\pm}$ ও Z^{0} কণা দুটির অস্তিত্ব। ফলে, ইলেকট্রোউইক তত্ত্ব পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয়। এক ধাপ এগিয়ে যায় একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব। সালামদের এই তত্ত্ব আজও উচ্চশক্তি সম্পন্ন কণা-পদার্থবিজ্ঞানের 'স্ট্যান্ডার্ড মডেল' [Standard Model]-এর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে।

সালাম তাঁর গড়ে তোলা ICTP-র পরিচালন ব্যবস্থাকে সব সময় সজীব রেখেছিলেন। এই সংস্থার গবেষণা ছিল মূলতঃ তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতি উপর। তৃতীয় বিশ্বের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখেই এই সব গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতেন অধ্যাপক সালাম। ICTP-র সমস্ত কর্মী, গবেষক অধ্যাপক সালামকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁরা সালামের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে মনের আনন্দে কাজ করতেন। সংস্থার যে কোন কর্মীর চেয়ে অধ্যাপক সালাম অনেক বেশী কাজ করতেন। 1968 সালে সালাম 'অ্যাটমস্ ফর পীস' পুরস্কার পান। এই 'Atoms for Peace Medal' পুরস্কারে যত টাকা পেয়েছিলেন তা দিয়ে তিনি একটা ফান্ড [Fund] বানান। তরুণ পাকিস্তানী পদার্থবিজ্ঞানীদের এই ফান্ড থেকে স্কলারশিপ দেওয়া হয় ICTP-তে গবেষণা করতে আসার জন্য। নোবেল পুরস্কারে তিনি যে টাকা পেয়েছিলেন তা তিনি খরচ করেন উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে ICTP-তে আসা গবেষকদের জন্য। এর একটা পয়সাও তিনি নিজের জন্য খরচ করেন নি।

অধ্যাপক সালাম ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। এই নোবেলবিজ্ঞানীটির হৃদয় ছিল ধর্মভীরু মুসলমানের। তাঁর বিজ্ঞানের গবেষণায়, তাঁর পারিবারিক জীবনে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তিনি কোরানের নির্দেশ মেনে প্রতিদিন নিয়মিত নামাজ পাঠ করতেন। একবার তিনি লিখেছিলেন ঃ

"The Holy Quran enjoins us to reflect on the verities of Allah's created laws of nature, however, that our generation has been privileged to glimpse a part of His design is a bounty and a grace for which I render thanks with a humble heart."

ধর্মপ্রাণ সালামের কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। ধর্মকে তিনি তাঁর জীবন-চর্যায় মিলিয়ে নিয়েছিলেন। এই মিলিয়ে নেওয়ার সঙ্গে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ ঘটে নি। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি কার্যকারণ সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছেন। কণা জগতের বিশৃঙ্খলা, অনিশ্চয়তাকে দূর করতে চেয়েছেন। একেশ্বরবাদের মতই একীভূত করতে চেয়েছেন মৌল বলগুলিকে। সে আলোচনায় একটু পরেই আসছি।

অধ্যাপক সালামের গুরুভক্তি কিংবদন্তী হয়ে আছে। একালে এমন গুরুভক্তির নিদর্শন একেবারেই বিরল। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর 1981 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক সালামকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে দীক্ষান্ত ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। অধ্যাপক সালাম একটি শর্তে ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত হন। সেই শর্তটি হলো—কলকাতায় আছে তাঁর শিক্ষাগুরু অধ্যাপক শ্রীঅনিলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সম্মানিত করতে হবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই শর্ত মেনে নিয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্মানিত করেন। তারপর সালাম আসেন কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীক্ষান্ত ভাষণ দিতে এসে প্রথমেই তিনি সাক্ষাৎ করেন তাঁর গুরু শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে পাওয়া নোবেল পদকটি শিক্ষাগুরুকে দেখান। তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নেন। তারপর বলেন, "স্যার, লাহোর কলেজে আপনার কাছ থেকে অঙ্কশাস্ত্র যেটুকু শিখেছিলাম কেম্ব্রিজে গিয়ে তার থেকে বেশী কিছু শিখতে পারিনি।" ধর্মপ্রাণ এই নোবেলবিজ্ঞানীর গুরুভক্তি সত্যিই আদর্শস্থানীয়।

অধ্যাপক সালাম দীর্ঘ রোগ ভোগের পর দেহত্যাগ করেন 1996 সালে 21শে নভেম্বর। তিনি মারা যান অক্সফোর্ডে। তাঁর মরদেহ অক্সফোর্ড থেকে নিয়ে আসা হয় পাকিস্তানের ঝাঙ-এ। এই শহরেই তিনি জন্মেছিলেন। ঝাঙয়েই তাঁকে পূর্ণ মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় 71 বছর। কণা-পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের ইতিহাসে তাঁর দান অবিস্মরণীয়।

আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির বিভিন্ন সত্য ব্যাখ্যা করা যাবে একটি বা খুব সামান্য কয়েকটি তত্ত্ব থেকে। তিনি বলতেন, "সমস্ত বিজ্ঞানের আসল লক্ষ্য হল যথা সম্ভব কম সংখ্যক কল্পনা বা তত্ত্ব থেকে যুক্তিপূর্ণ বিচারের দ্বারা বৃহত্তর সংখ্যক অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যাপারের নিষ্পত্তি সাধন করা।" প্রকৃতির বিভিন্নতার মধ্যে আছে এক মহৎ সমন্বয়। সেই সমন্বয় সূত্রটি খুঁজে বের করাটাই হল বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য। বহুর মধ্যে ঐক্যে ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। আইনস্টাইনের জীবনের প্রথম দিকটায় বিজ্ঞান বিশ্বের মূল উপাদান বলেছিল, মহাকাশ [Space], সময়, বস্তু, শক্তি এবং মহাকর্ষ। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে তিনি দেখালেন মহাকাশ ও সময়ের অবিচ্ছিন্নতা, সময়ের পর-নির্ভরতা, বস্তু ও শক্তির তুল্যতা। 1916 সালের পর থেকে তাঁর চেষ্টা হল চরম সূত্রটি বের করে সমস্ত বিচ্ছিন্নভাবকে একীভূত করা। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে মহাকর্ষ-তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের তত্ত্ব। ম্যাক্সওয়েল প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র। আইনস্টাইন চাইলেন, মহাকর্ষ ও তড়িচ্চুম্বকত্ব—বিশ্বের এই দুই প্রধান ব্যাপারের নিয়মাবলীকে একীভূত করতে বা এক করে ফেলতে। তাঁর মতে, মহাকর্ষ ক্ষেত্র যেমন মহাকাশ-সময়-সন্ততির বা দেশ-কাল-সন্ততির জ্যামিতিক গুণ, তেমনি তড়িচ্চুম্বক বলও ওই রকম কোন জ্যামিতিক গুণ হবে এবং দুই ক্ষেত্রকে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। তিনি বলেছেন, "মহাকাশের একটি মহাকর্ষীয় ও অপরটি তড়িচ্চুম্বকীয়—এই রকম দুটি বাস্তব বিষয়ের পরস্পরের অনন্যাগত গঠন থাকতে পারে, এই কল্পনা তত্ত্বীয় জ্ঞানে মেনে নেওয়া অসম্ভব।"

আগেই বলা হয়েছে 1924 সালে ব্রগলি কণাবাদভিত্তিক একটি গাণিতিক সূত্র বের করলেন যার সাহায্যে কোনো চলন্ত বস্তুর ভর ও বেগ জানা থাকলে বস্তুর বস্তু-তরঙ্গদৈর্ঘ্য জানা যাবে। 1927 সালে হাইজেনবার্গ দিলেন তাঁর অতি বিখ্যাত 'অনিশ্চয়তা নীতি' [Uncertainty Principle]। এই নীতি অনুসারে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কোনো কণিকার ভরবেগ ও অবস্থান [Momentum and Position] একসঙ্গে নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। ভরবেগ সঠিকভাবে নির্ণয় করলে সেই মুহূর্তে ওই কণাটির সঠিক অবস্থান বলা যেমন প্রায় অসম্ভব, তেমনি কণাটির অবস্থান সম্বন্ধে কোনো মুহূর্তে সঠিকভাবে জানা গেলেও তার সঠিক ভরবেগ নির্ণয় করা অসম্ভব। সরল করে বললে দাঁড়ায় যে, পারমাণবিক স্তরের ঘটনাগুলির সঠিক কারণ নির্ণয় করা অসম্ভব। সুতারং পারমাণবিক স্তরে কার্য-কারণ সম্পর্কের এতাবৎ প্রচলিত ধারণা বাতিল হয়ে গেল। চতুর্দিকে দেখা গেল সম্ভাব্যতা [Probability]। শ্রোয়েডিঙ্গারের তরঙ্গ বলবিজ্ঞানের গাণিতিক সূত্র কাজে লাগিয়ে ম্যাক্স বর্ন [Max Born] তাঁর সূত্রে বস্তুর তরঙ্গকে বললেন, 'সম্ভাব্যতার তরঙ্গ' [Waves of Probability]। এভাবে বস্তুর তরঙ্গ হয়ে গেল সম্ভাব্যতার তরঙ্গ। শেষে দাঁড়াল এই যে, আমরা একটি তরঙ্গপূর্ণ বিশ্বে বাস করছি কিংবা বলা যায় বস্তুপূর্ণ বিশ্বে বাস করছি। এই বিশ্ব হল 'Universe of Wavicles', যেখানে 'Wavicles' হল Wave এবং Particles-এর মিশ্রণ। আগেও বলেছি, আবারো বলছি, আমরা একটি 'তরণিকা' কিংবা 'তরঙ্গণিকা' পূর্ণ বিশ্বে বাস করছি। আর এই বিশ্ব কার্য-কারণ সম্পর্কহীন এবং এর তরঙ্গ হল সম্ভাব্যতার তরঙ্গ। 'তরণিকা' বা 'তরঙ্গণিকা' হল 'তরঙ্গ' এবং 'কণিকা'-র মিশ্রিত রূপ। 'Wavicles'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'তরণিকা' বা 'তরঙ্গণিকা'।

এইভাবে ওই সময় কণিকা জগতে এল অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতা, বিশৃঙ্খলা এবং কার্যকারণ সম্পর্কের অভাব। আইনস্টাইন সারা জীবন কার্যকারণ সম্বন্ধের উপর এই বিশ্বের ঘটনাবলী নির্ভরশীল, এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি কার্যকারণ সম্পর্কের বাইরে কখনও এক পা বাড়ান নি। সারা জীবন একেবারে শক্ত করে আঁকড়ে থেকেছেন এই মতবাদ। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, কণিকা জগতের চিন্তাধারায় কোথাও একটি গলদ রয়ে গেছে কোনোভাবে, তাই বিশৃঙ্খলা। আসল সত্য একদিন জানা যাবেই। ফলে, আইনস্টাইন শেষজীবনে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণায় একেবারে একা হয়ে গিয়েছিলেন। বোর ,হাইজেনবার্গ, দ্য ব্রগলি, শ্রোয়েডিঙ্গার প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের থেকে একেবারে আলাদা হয়ে সরে গিয়েছিলেন আইনস্টাইন। তবু মৃত্যুর বছর চারেক আগে, 1951 সালে তিনি একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের ক্ষেত্রসমীকরণগুলি [Field Equations] নতুন ধাঁচে [Strong Form] প্রকাশ করেন। এই সমীকরণগুলির সমাধান প্রায় অসম্ভব ছিল বলেই শ্রোয়েডিঙ্গার মন্তব্য করেছিলেন, "এগুলির সমাধান এত জটিল, চেষ্টা না করলে বিশ্বাস করা যায় না।" আইনস্টাইন নিজেও সমাধান করতে পারেন নি। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্বকল্পিত ম্যাট্রিকস্ প্রক্রিয়ায় [Matrix Method] সাধারণভাবে এগুলির সমাধান করে দেন, কিন্তু তাতে মহাকর্ষ ও তড়িচ্চুম্বকীয় বলের সমন্বয়ের কোনো নির্দেশ পাওয়া গেল না। আজও পাওয়া যায়নি। আবদুস সালামদের আবিষ্কারের পর একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব এক ধাপ এগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু

এখনও মৌল বল রয়েছে তিনটি এবং এগুলি আজও একীভূত হতে বাকী। বিজ্ঞানীরা এখন আবার জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন এই ক্ষেত্রগুলিকে একীভূত করার।

জীবনের শেষ ত্রিশ বছর আইনস্টাইন মৌলিক ক্ষেত্র বা শক্তিগুলি একীভূত করতেই ব্যয় করেছেন। কঠোর পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারেন নি নানা কারণে। তিনি তাঁর একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বে [Unified Field Theory] প্রথমে মহাকর্ষ ক্ষেত্রকে তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে মিলিতে দিতে চাইলেন। এদের মধ্যে সম্পর্ক বের করে একটার থেকে আরেকটায় রূপান্তরণের চেষ্টা করলেন। এটা সম্ভব হলে, তারপর তিনি চেয়েছিলেন, পরমাণুর কেন্দ্রকের সবল মিথস্ক্রিয়া [Strong Inter-action] এবং কেন্দ্রকের বাইরের অঞ্চলের দুর্বল মিথস্ক্রিয়া [Weak Inter-action] বল দুটিকেও ওদের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে। আইনস্টাইন প্রথম দুটিকে একীভূত করে তারপর পরমাণুর অভ্যন্তরের দুটি ক্ষেত্রের দিকে নজর দেবেন ঠিক করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল চারটি মৌলিক ক্ষেত্রকেই একীভূত করা। তিনি সারা জীবন বিশ্বাস করতেন কার্য-কারণ সম্পর্কে। অনিশ্চয়তায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। এর জন্য আইনস্টাইনকে তরুণ বিজ্ঞানীদের কাছে প্রায় একঘরে হয়ে থাকতে হয়। বোর বহুবার আইনস্টাইনকে কণাবাদের এই সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তার দিকে আনতে চেষ্টা করেন। আইনস্টাইন কার্য-কারণ সম্পর্কহীন এই পথে যেতে রাজী হন নি। অবিচ্ছিন্নতা [Continuity] এবং দ্বৈতরূপ [Duality] নিয়ে তর্কাতর্কির সময় নীল্‌স বোর একবার বেশ রেগেমেগেই আইনস্টাইনকে বলেছিলেন, "আপনি কী আশা করেন? আপনি নিজে যে পদার্থবিদ্যায় আলোর দ্বৈতরূপ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই পদার্থবিদ্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে যদি উদ্বিগ্ন হন যে, আলোর একটি রূপ থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং সেটি তার তরঙ্গ রূপ হওয়াই উচিত, তবে জার্মান সরকারকে আলোকবৈদ্যুৎ সেল [Photoelectric Cell] ব্যবহার করতে বারণ করে দিন, আর যদি মনে করেন যে, আলো হল কণিকা তবে ডিফ্রাকসন গ্রেটিং [Diffraction Grating] বন্ধ করে দিন।"

আইনস্টাইন মারা যান 1955 সালে। সে সময় বিশ্বের মৌল বল রয়ে যায় চারটি ঃ

(1) তড়িৎচ্চুম্বকীয় বল [Electromagnetic Force],

(2) মহকর্ষীয় বল [Gravitational Force],

(3) দুর্বল মিথস্ক্রিয়া [Weak Interation] বা দুর্বল বল [Weak Force] এবং

(4) সবল মিথস্ক্রিয়া [Strong Interaction] বা সবল বল [Strong Force]।

এই চারটি বলকে বা ক্ষেত্রকে একীকরণ করতে পারলেই একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব সর্বতোভাবে প্রমাণিত হয়। আইনস্টাইন সাফল্য পান নি। তাঁর মৃত্যুর সময় মৌলবলগুলি মৌলিকই রয়ে যায়। তাঁর ব্যর্থতার কারণ হিসাবে 1959 খ্রিস্টাব্দে আইনস্টাইনের মৃত্যুর প্রায় চার বছর পরে হাইজেনবার্গ বলেছিলেন, "আবিষ্কৃত মৌলিক কণাগুলির ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির সম্বন্ধে দ্রুত জ্ঞান বেড়ে যেতে থাকাই আইনস্টাইনের ব্যর্থতার কারণ।" কিন্তু আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বীয় মতবাদে যে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল আরও কিছুটা পরে—1979 খ্রিস্টাব্দে।

আবারো বলি, জীবনের শেষ ত্রিশ বছর আইনস্টাইন অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেছেন মৌলিক ক্ষেত্র বা বলগুলিকে একীভূত করতে। কঠোর পরিশ্রম করেছেন, সাফল্য লাভ করেন নি নানা কারণে। তাই বলে তাঁর 'একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্ব' [Unfied Field Theory] বাতিল হয়ে যায় নি। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে আবদুস সালাম, কার্লো-রুব্বিয়া প্রভৃতিরা একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্বের সত্যতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। 1955 সালের 18ই এপ্রিল আইনস্টাইন মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর 'একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব' বিষয়টি বিজ্ঞানীদের কাছে প্রায় 'মৃত বিষয়' [Dead Subject] হয়ে যায়।

আইনস্টাইন যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, সেটি 'একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব' [Unified Field Theory]। 1955 খ্রিস্টাব্দের পর অর্থাৎ আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর এই তত্ত্বটিকে অনেক বিজ্ঞানীই 'মৃত বিষয়' বলে ভাবতে শুরু করেন এবং অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এর থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন। এই সময় পদার্থবিজ্ঞানে তথা সমগ্র বিশ্বে চারটি মৌল বলের ধারণা থেকে যায়। আগেই বলেছি, এগুলি হল তড়িচ্চুম্বকীয় বল, মহাকর্ষ বল, দুর্বল বল বা দুর্বল মিথস্ক্রিয়া এবং সবল বল বা সবল মিথস্ক্রিয়া।

1979 খ্রিস্টাব্দে আবদুস সালাম, স্টিভেন ভিনবার্গ ও শেলডন গ্লাসোকে তাঁদের ইলেকট্রোউইক তত্ত্বের [Electro-Weak Theory] জন্য পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকাবার তাগিদ অনুভব করলেন বিজ্ঞানীরা। এঁরা এঁদের ইলেকট্রোউইক তত্ত্ব [Electro-Weak-Theory] দিয়ে প্রমাণ করলেন, তড়িচ্চৌম্বক বল ও দুর্বল বল বা দুর্বল মিথস্ক্রিয়া, যা নানা ধরনের নিউক্লীয় ক্ষয় বা তেজস্ক্রিয়তার (বিটাক্ষয়) জন্য দায়ী—এক ও অভিন্ন। তাঁরা এই বলের নাম দিলেন 'ইলেকট্রোউইক বল' [Electro-Weak Force]। কোন নিউক্লিয়াস যেমন একটি বিশেষ অবস্থায় গামারশ্মি বা উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফোটন বের করতে পারে, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'গামাক্ষয়', তেমনি আরেক অবস্থায় তা ইলেকট্রন বের করে থাকে, যাকে বলা হয় 'বিটাক্ষয়'। প্রথমটি ঘটে তড়িচ্চুম্বকীয় বলের প্রভাবে আর দ্বিতীয়টি ঘটে দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার প্রভাবে। সালাম-ভিনবার্গ-গ্লাসো বললেন, এ দুটি ঘটনা একই বলের প্রকাশ মাত্র, আলাদা কিছু নয়।

ইলেকট্রোউইক তত্ত্বে অপেক্ষাকৃত বিপুল ভর সম্পন্ন ডব্লিউ [W] কণা ছাড়াও আরেক ধরনের তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণার কথা ভাবা হল। তার নাম দেওয়া হল Z কণা। 1973 খ্রিস্টাব্দে নিউট্রাল কারেন্ট [Neutral Current] বা নিরপেক্ষ স্রোতের আবিষ্কারের পর Z-এর ধারণা পদার্থবিদ্যায় সুদৃঢ় হয়। এই $W^{\pm}$ কণা ও নিরপেক্ষ Z^0 কণার অস্তিত্ব প্রমাণের উপরই ইলেকট্রোউইক তত্ত্বের সত্যতা নির্ভর করছিল। নিরপেক্ষ স্রোতের আবিষ্কার ও পরবর্তী কয়েকটি অনুকূল পরীক্ষার ফল দেখেই সালামরা তাঁদের ওই নতুন তত্ত্ব খাড়া করেন। 1979 খ্রিস্টাব্দে সালাম-ভিনবার্গ-গ্লাসো-কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়—অনেকটা দুঃসাহসিকভাবে। কারণ তখনও Z^0 কিংবা $W^{\pm}$ কণার অস্তিত্ব পরীক্ষাগারে কিংবা বাস্তবে অপ্রমাণিত। W-কণা পরীক্ষাগারে পেতে হলে যে প্রচণ্ড শক্তিশালী কণাত্বরায়ক যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল, তা তখন ছিল না। এই কারণে গ্লাসো 'ইন্টারন্যাশন্যাল হেরাল্ড ট্রিবিউনে'

16 অক্টোবর [1979] বলেই ফেললেন, "নোবেল কমিটি আমাদের পুরস্কার দিয়ে একটা চান্স নিয়েছেন। কেন না, আমাদের প্রস্তাবিত কণিকাগুলি পরীক্ষা করে দেখবার মতো কোন যন্ত্র এখনও কেউ তৈরি করতে পারেনি নি।" কিন্তু তাঁদের পাঁচ বছরও অপেক্ষা করতে হল না। কার্লো রুব্বিয়া ও সাইমন ভ্যানডার মির দুজনে মিলে ওঁদের স্বপ্নকে সত্যরূপ দিলেন। এঁরা দুজন $W^{\pm}$ ও Z^{0} কণার অস্তিত্ব পরীক্ষাগারে ভালোভাবেই প্রমাণ করে দিলেন। এঁদেরও 1984 সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ইলেকট্রোউইক তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ হল সব দিক দিয়েই। ফলে মৌল বল রইল তিনটি— মহাকর্ষ বল, সবল বল এবং তড়িচ্চুম্বকীয় ও দুর্বল বলের মিলিতরূপ ইলেকট্রোউইক বল।

আইনস্টাইন জীবনের শেষ পর্যায়ে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কণাবাদ-ভিত্তিক মতবাদে কিসের অভাবে ওই বিশৃঙ্খলা তার কারণ খুঁজতে লেগেছিলেন। জীবনের শেষ 30 বছর তিনি একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে লেগে রইলেন। সাফল্য পান নি। কিন্তু সত্যের সন্ধানে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। আংশিক সাফল্য এসেছে সালামদের হাত ধরে। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান এবং আপেক্ষিকতাবাদকে মিলিয়ে ফেলতে। সাফল্য আজও আসে নি। পদার্থ বিজ্ঞান আজও দ্বৈত-সত্তায়। কণাজগতে সে প্রতিষ্ঠা করেছে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান আর বহির্জগতে সে প্রতিষ্ঠা করেছে আপেক্ষিকতাবাদ।

আইনস্টাইন কণা-জগতের ওই সব আবিষ্কারকে অবহেলা করতেন না, কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন কণা-জগতের চিন্তাধারায় নিশ্চয় কোথাও গলদ রয়ে গেছে যার জন্য সত্যকে জানা যাচ্ছে না। তিনি মনে করতেন আসল সত্য একদিন জানা যাবেই। যতদিন না সে সত্য জানা যাচ্ছে ততদিন এই অনিশ্চয়তা, এই বিশৃঙ্খলা থাকবেই। বোর কয়েকবার কণাবাদ নিয়ে তথা এই নতুন মতবাদ নিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে নানা আলোচনা করেছেন। কিন্তু আইনস্টাইন তাঁর বিশ্বাস থেকে একচুলও সরেন নি। তিনি কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের কঠোর সমালোচনা করতেন। এইসব সমালোচনায় তিনি চাইতেন কণাবাদ নীতির একটা সীমা নির্দেশ করতে এবং এই সীমার বাইরে অধিকতর বৈপ্লবিক তত্ত্বাদির আবিষ্কারের ধারণা পোষণ করতে। তাঁর সমালোচনায় কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের যে সব ভুলের কথা থাকতো, এই মতবাদের স্রষ্টারা চেষ্টা করতেন সেই ভুলগুলি শোধরাতে। ফলে, এই মতবাদ আরও উন্নততর হয়ে উঠল আইনস্টাইনের এই সমালোচনায়। আইনস্টাইন কিন্তু এই মতবাদ কখনও মেনে নেন নি। আমৃত্যু তিনি বিজ্ঞান জগতে বিচরণ করলেন সঙ্গীহীন একাকী হয়ে। আপেক্ষিকতাবাদের আবিষ্কারের সময় তিনি যেমন সঙ্গীহীন ছিলেন, কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের রমরমার কালেও তেমনি একাকী রইলেন তিনি। তাঁর শেষ জীবনে সমকালীন তরুণ বিজ্ঞানীরা তাঁকে পথ হারানো এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে না পারা এক বিজ্ঞানী ভাবতেন।

তরুণ-বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনকে প্রবল শ্রদ্ধা করতেন। তবু ওই একাকীত্বে বিজ্ঞানীরা ধারণা করলেন, তিনি বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না। "আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কারের সময় তাঁর যে একাকীত্বকে মনে করা হত তাঁর সমকালীন চিন্তাজগৎ থেকে অনেক দূর অগ্রগামী এক চিন্তাশীলের মনোভাব, সেই একাকীত্বকে মনে

করা হতে লাগলো পথ হারিয়ে ফেলা এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অসমর্থ এক বিজ্ঞানীর বিচ্ছিন্নতা।" তিনি একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব নিয়ে একাকীই চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর সংগ্রাম। তাঁর কার্য-কারণ বিশ্বাসের সংগ্রাম। তাঁর মৃত্যুর পর বোর আরও বলেছিলেন, "আইনস্টাইন আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। আমি এই কথা আজ বলতে চাই যে, তিনি তাঁর পূর্ণতার আদর্শের জন্য অদম্য আগ্রহ, ঘটনা-তত্ত্বাবলীতে সনাতন বিজ্ঞানের নিয়মাদির প্রযুক্তি এবং সমস্ত বাস্তব বিশ্বকে জানবার একীভূত পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়াসের ভিতর দিয়ে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের অশেষ কল্যাণ করেছেন।"

একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের জনক ছিলেন আইনস্টাইন। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের ওই বিশৃঙ্খলা, কার্যকারণহীনতা কোনোদিনই মানতে পারেন নি এই মহাবিজ্ঞানী। মহাজাগতিক অণ্ড [Cosmic Egg] থেকে যদি বিশ্ব নিঃসৃত হয়ে থাকে তবে সেখানে নিয়ম একটাই হবে দুটি নয়, মৌলিক বল একটিই হবে দুটি নয়—আইনস্টাইন এটাই বিশ্বাস করতেন। সেই বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়েছিল অধ্যাপক সালামের মনে। তিনি তাই তাঁর গবেষণা শুরু করেন ওই তথাকথিত 'মৃত বিষয়' [Dead Subject] নিয়ে।

আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর যখন অধিকাংশ বিজ্ঞানী একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তখন অধ্যাপক সালাম একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব নিয়ে তাঁর গবেষণা শুরু করেন। সম্ভবতঃ 1957 সালে তাঁর এই গবেষণার শুরু, যখন তিনি লন্ডনের ইম্পিরিয়েল কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। ভিনবার্গ এবং গ্লাসো অবশ্য আলাদ করে অনুরূপ গবেষণা করেন। এঁরা দুজনে 1978 সালে সালামের মতই ইলেকট্রোউইক বলের আবিষ্কার করেন। তাই তিনজনকে একসঙ্গে 1979 সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় পদার্থবিজ্ঞানে। ভিনবার্গ ও গ্লাসোরা ছিলেন আমেরিকাবাসী বিজ্ঞানী। আর সালাম লন্ডনে থাকলেও তিনি পাকিস্তানী।

আইনস্টাইন কণাজগতের সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা, কার্যাকারণ সম্পর্কহীনতার তথাকথিত সত্য মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি চাইছিলেন একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করে এই অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতা এবং কার্যকারণ সম্পর্কহীনতা দূর করতে। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের এই বিশৃঙ্খলা সারা জীবনই তিনি মানতে পারেন নি। প্রবল প্রতিবাদও করেছেন, করেছেন সমালোচনাও। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় কোয়ান্টামবাদকে আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা সম্ভব হয় নি। অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতা, কার্যকারণহীনতা রয়ে যায় কণা জগতে।

1944 সালে ম্যাক্সবর্ণকে তিনি লিখেছিলেন, "আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় আমরা দু'জনে উল্টো পথে গিয়েছি। আপনি পাশা-ক্রীড়ক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন আর আমি বিশ্বাস করি শৃঙ্খলাপূর্ণ বিশ্বে সব কিছুর বাস্তব অস্তিত্বে এবং সেই সত্য জানবার জন্য আমাকে অদ্ভুত কল্পনার সাহায্য নিতে হয়। আমি আশা করি যে, একদিন কোন একজন বিজ্ঞানী আমার উপলব্ধির চেয়ে অধিকতর বাস্তব পদ্ধতিতে কিংবা অধিকতর বোধগম্য ভিত্তিতে এই সত্যকে আবিষ্কার করতে পারবেন। কণাবাদের প্রথম বিরাট সাফল্য আমাকে ওই পাশা খেলাতে বিশ্বাস করাতে পারবে না।" তিনি বলতেন, 'ঈশ্বর পাশা খেলেন না'।

ঈশ্বর বলতে তিনি বুঝিয়েছেন প্রকৃতির শক্তির কার্য-কারণ ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকাশ। তাঁর ঈশ্বর, স্পিনোজার ঈশ্বর, রামানুজের 'ব্রহ্ম'। প্রাকৃতিক সত্যের তত্ত্বগুলি পাশার দান নয় যে, এটিও হয় আবার ওটিও হয়। সত্যের এই অনিশ্চয়তা আইনস্টাইন মানতেন না।

মহাজাগতিক সত্যকে জানতে বিজ্ঞানীরা দু-ভাবে চেষ্টা করেছেন, এক, যন্ত্রের দ্বারা—যথা, উচ্চশক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্র, আর অপরটি হল গাণিতিক সূত্রের দ্বারা। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষভাগ থেকেই পদার্থবিদ্যার দুটি মূল ভিত্তি হল আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। বহির্জগতের ধারণা পেতে হলে নির্ভর করতে হবে আপেক্ষিকতাবাদের উপরে। মহাকাশ, সময়, মহাকর্ষ এবং অন্যান্য যে সব প্রাকৃতিক সত্যের অস্তিত্ব, যা এত দূরে যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নাগালের বাইরে কিংবা যা কল্পনাতীতভাবে বৃহৎ, এই সবের জ্ঞান লাভ করা যায় আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারা।

পরমাণু ধারণা, বস্তু ও শক্তির মূল কণিকা, এবং যে সব প্রাকৃতিক সত্য এত ক্ষুদ্র যে, ধরাছোঁয়ার বাইরেই শুধু নয়, কোন রকম অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যেগুলির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় না—এই সব সত্যের ধারণা পাওয়া যায় কণা-বলবিজ্ঞানে বা কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে। আইনস্টাইন গভীরভাবে চেষ্টা করেছিলেন এই দুইকে এক করে ফেলতে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের মাধ্যমে। এই জন্য হাইজেনবার্গ প্রমুখেরা এক সময় আইনস্টাইনের প্রবল সমালোচনাও করেছেন।

আইনস্টাইনের একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের আবিষ্কারের চেষ্টাকে সমালোচনা করে হাইজেনবার্গ বলেছিলেন, "এই সব কণিকার উপর বিভিন্ন প্রকার বলের ক্ষেত্রের জটিল ক্রিয়া কাজ করছে। সে জন্য এটা বোঝা কঠিন যে কিভাবে তাদের আচরণাদিকে একটি বিশিষ্ট সহজ তত্ত্বের দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে।" এর জবাব দিতে পারে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব। আইনস্টাইনের জীবদ্দশায় সে জবাব দেওয়া সম্ভব হয় নি। তার জবাব বেশ কিছুটা দিয়েছেন আবদুস সালামরা। আরও অনেকটাই বাকী। তিনটি মৌল বল বা সবল মিথস্ক্রিয়া, তড়িচ্চুম্বকীয় বল এবং মহাকর্ষ বলকে একীভূত করতে হবে। এই নিয়ে গবেষণা চলছে। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে তড়িচ্চুম্বকীয় বলের ক্ষেত্রকে এবং সবল বলকেও তড়িচ্চুম্বকীয় বলের সঙ্গে একীভূত করতে পারলেই একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব পুরোপুরি প্রমাণিত হবে। দূর হয়ে যাবে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের অনিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতা এবং কার্যকারণ সম্পর্কহীনতা। জাগতিক সমস্ত মৌলিক ঘটনাবলীই একটা নিয়মেই বিধৃত হবে, ব্যাখ্যাত হবে। আলোর দ্বৈতসত্তাও চলে যাবে। প্রতিষ্ঠিত হবে তার একক সত্তা।

আবারো বলি, আইনস্টাইন সারাজীবন বিশ্বাস করতেন কার্যকারণ সম্পর্কে। ম্যাক্স বর্নের কাছে লেখা 1944 সালের ওই চিঠিতে তিনি কার্যকারণ সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের কথা জানিয়েছিলেন। প্রকাশ করেছিলেন অনিশ্চয়তায় অসীম অবিশ্বাস। এই চিঠির কথা একটু আগেই বলা হয়েছে। আইনস্টাইন কণিকা-জগতের কল্পনাতীত বিশৃঙ্খলাকে কখনোই সত্য বলে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু আবিষ্কৃত মৌলিক কণিকাগুলির এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির সম্বন্ধে দ্রুত জ্ঞান বেড়ে যেতে থাকায় আইনস্টাইন একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। ফলে, আইনস্টাইনের জীবদ্দশায় চারটি মৌলিক ক্ষেত্র মৌলিকই রয়ে যায়।

এরপর আসরে এলেন আবদুস সালাম, স্টিভেন ভিনবার্গ, শেলডন গ্লাসো, কার্লো রুবিয়া, সাইমন ভ্যানডার মির ও তাঁদের সহকর্মীরা। কার্লো-সাইমনেরা এক বিলিয়নের চেয়েও বেশি সংখ্যক প্রোটন-অ্যান্টিপ্রোটন সংঘর্ষ ঘটিয়ে এবং যথাবিহিত পরীক্ষা করে মাত্র শ'খানেক $W^{\pm}$ এবং Z^{0} কণার ঘটনা নথিবদ্ধ করেছেন। দেখা গেছে, এই ভেক্টর বোসনরা [Vector Bosons] পরে ক্ষয় পেয়ে লেপটন ও নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

এঁদের এই আবিষ্কারের ফলেই বিশ্বে আর তিনটি মৌল বলের অস্তিত্ব রইলো। এক, তড়িচ্চৌম্বক ও দুর্বল বলের মিলিত রূপ ইলেকট্রোউইক বল, দুই, সবল বল এবং তিন, মহাকর্ষ বল। অদূর ভবিষ্যতে এই তিনটি বলও সম্ভবত তাদের মৌলিকত্ব হারাবে, কারণ যে 'কসমিক এগ' [Cosmic Egg] বা 'মহাজাগতিক অণ্ড' থেকে এই বিশ্ব নিঃসৃত, সেই মহাডিম্বে একটি মাত্র মৌলিক বলই ছিল, তিনটি নয়—আজকের বিজ্ঞানীদের তাই-ই বিশ্বাস। সুতরাং আইনস্টাইন সঠিক পথই দেখিয়েছিলেন, কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের সেই রমরমার কালে। সে পথ সালামদের আবিষ্কারে আজ প্রশস্ত রাজপথ হয়ে ঝলমল করছে। 'মৃত বিষয়' আজ সজীব, সঞ্জীবিত ও উজ্জীবিত। সে বিষয় এখন এগিয়ে চলেছে মহামিলনের দিকে। আর সে মহামিলন হল কোয়ান্টামবাদের সঙ্গে আপেক্ষিকতাবাদের বহু প্রত্যাশিত একীকরণ।

আবদুস সালাম 1966 সালে একটি বই লেখেন। বইটির নাম 'সিমিট্রি কনসেপ্ট ইন মডার্ন ফিজিক্স' [Symmetry Concept in Modern Physics]। এছাড়া তিনি ইউজিন ভিগনারের সঙ্গে একটি বইয়ের সম্পাদনাও করেন। বইটি হল, 'অ্যাসপেক্টস অফ কোয়ান্টাম মেকানিক্স' [Aspects of Quantum.Mechanics]। শেষ করি সালামের লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে—"প্রতিবাদহীন লক্ষ লক্ষ মানুষ....যাঁরা খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে শিশুদের জন্য বই কিনতে পারেন না। এমন দারিদ্র্য ইউরোপ বা আমেরিকায় চোখে পড়ে না। নীরব 'গণহত্যা' চলেছে প্রতিনিয়ত, তবু মানুষের অদম্য আকাঙ্ক্ষার কোনও ছেদ পড়ছে না।"●

স্টিফেন উইলিয়াম হকিং

[1942–]

সময়টা 1974 সালের বসন্ত কাল। সেবার বিখ্যাত বিজ্ঞানী কার্ল সেগান [Carl Segan] এসেছেন লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে বহির্বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্বের অন্বেষণ নিয়ে এক আলোচনা সভায় যোগ দিতে। ওই সভার কফি-বিরতির সময় সেগান দেখলেন তাঁদের আলোচনা সভা যে ঘরে হচ্ছিল তার পাশের ঘরেই বেশ বড়সড় একটা সভা হচ্ছে। কৌতূহলী সেগান দেখলেন সেই সভায় হুইল চেয়ারে বসা এক যুবককে সোসাইটির নতুন সদস্য করে নেওয়ার জন্য একটা খাতা সই করানো হচ্ছে। যুবকটি অত্যন্ত ধীরে সেই খাতায় তাঁর নাম লিখছেন, যে খাতার প্রথম দিকের পাতায় স্বাক্ষর রয়েছে মহামতি স্যার আইজাক নিউটনেরও। প্রতিবন্ধী ওই যুবকটি তাঁর স্বাক্ষর শেষ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোটা সভাকক্ষ ফেটে পড়ল উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনে। এই প্রতিবন্ধী যুবকটি হলেন স্টিফেন উইলিয়াম হকিং [Stephen William Hawking], যিনি স্টিফেন হকিং বা শুধু মাত্র হকিং নামেই সমধিক পরিচিত। আর ওই সভা ছিল তাঁকে রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ [FRS] প্রদানের সভা।

কার্ল সেগান লিখেছেন, "In the spring of 1974, about two years before the Viking spacecraft landed on Mars, I was at a meeting in England sponsored by the Royal Society of London to explore the question of how to search for extraterrestrial life. During a coffee break I noticed a much larger meeting was being held in an adjacent hall, which out of curiosity I entered. I soon realized I was witnessing an ancient rite, the investiture of new fellows into the Royal Society, one of the most ancient scholarly organizations on the planet. In the front row a young man in a wheelchair was, very slowly, signing his name in a book that bore on its earliest pages the signature of Isaac Newton. When at last he finished, there was stirring ovation. Stephen Hawking was a legend even then."

হকিং জন্মেছিলেন 1942 সালের ৪ই জানুয়ারী। তাঁর জন্মদিনটা ছিল গ্যালিলিও-র [Galileo] মৃত্যুদিন। গ্যালিলিওর মৃত্যুর ঠিক 300 বছর পর জন্মেছিলেন স্টিফেন হকিং। তাঁর বাবা অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্ক [Prof. Frank] ছিলেন ক্রান্তীয় ঔষধ [Tropical Medicine] বিশেষজ্ঞ। তিনি তাঁর কাজের জন্য প্রায়শই পরিবার থেকে দূরে থাকতেন। তাঁর মা ছিলেন ইসোবেল [Isobel]। তিনি ছিলেন রাজনীতির লোক। ইসোবেল ব্যস্ত থাকতেন নানান রাজনৈতিক কাজকর্মে। হকিংয়ের উপর তাঁর পিতামাতার প্রবল প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু তাঁর পিতামাতা যেমনটি আশা করেছিলেন, তেমটি তিনি করেন নি। তবে তাঁর গড়ে উঠার পিছনে ওঁদের অবদান ছিল অসামান্য। প্রতিবন্ধী হয়েও যে তিনি বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী হতে

পেরেছেন তার অনেকটাই সম্ভব হয়েছে তাঁর পিতামাতার চেষ্টায়। হকিং কিন্তু জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী ছিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে প্রতিবন্ধী হতে থাকেন এবং তা হতে থাকেন তাঁর 21 বছর বয়স থেকে। এই আলোচনায় পরে আসছি।

স্টিফেন হকিং যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। তাঁর বাবা-মা সে সময় থাকতেন উত্তর লন্ডনের 'হাইগেট' [Highgate] অঞ্চলে। সে সময় লন্ডন মোটেই নিরাপদ জায়গা ছিল না। যে কোন সময় বোমা পড়বার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল লন্ডনে। নিরাপত্তার কথা ভেবে সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে ফ্র্যাঙ্ক অক্সফোর্ডে পাঠিয়ে দেন সাময়িকভাবে। স্টিফেন তখনও জন্মান নি। ইসোবেলের অক্সফোর্ডে থাকার সময়ই স্টিফেন জন্মগ্রহণ করেন। স্টিফেনের জন্মের কিছুদিন পর যুদ্ধের অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় লন্ডন কিছুটা নিরাপদ হয়ে উঠে। ইসোবেল স্টিফেনকে নিয়ে আবার হাইগেট-এ ফিরে আসেন ফ্র্যাঙ্কের কাছে। এখানেই শুরু হয় স্টিফেনের স্কুল জীবন।

1950 সালে স্টিফেনের বাবা ফ্র্যাঙ্ক গবেষণার জন্য 'মিলহিল'-এর [Mill Hill] 'ইনস্টিটিউট ফর মেডিকেল রিসার্চ' [Institute for Medical Research]-এ যোগ দেন। স্টিফেনের পুরো পরিবার চলে আসে সেন্ট আলবানস-এ [St. Albans]। এখান থেকে ফ্র্যাঙ্কের গবেষণাগার খুব কাছেই ছিল। যাতায়াতও ছিল সুবিধাজনক। সবাই মিলে তাই তাঁরা সেন্ট আলবানস চলে আসেন। স্টিফেন এখানে এসে ভর্তি হন সেন্ট আলবানস হাইস্কুলে। স্কুলটা মেয়েদের। কিন্তু এখানে দশ বছর অবধি বয়সের ছেলেদেরও ভর্তি করা হত। স্টিফেন এই স্কুলেই ভর্তি হন 1950 সালে। এরপর তাঁর বয়স দশ বছর পেরিয়ে গেলে তাঁকে ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করা হয়। ফ্র্যাঙ্ক এই সময় স্টিফেনকে স্কলারশিপ পরীক্ষা দেওয়ানোর জন্য ওয়েস্ট মিনস্টার পাবলিক স্কুলে ভর্তি করার মনস্থ করেন। কিন্তু সেখানে ভর্তির পরীক্ষার সময় স্টিফেন অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে, ওয়েস্ট মিনস্টারের ওই স্কুলে ভর্তি হওয়া হয় নি স্টিফেনের। তিনি সেন্ট আলবানসের ছেলেদের স্কুলেই থেকে যান। এগারো বছর বয়স থেকেই সেন্ট আলবানসের ওই ছেলেদের স্কুলে স্টিফেনের পড়াশুনা চলতে থাকে। ওই স্কুলে পড়াশুনা সম্পর্কে পরবর্তীকালে স্টিফেন বলেছেন, 'সেখানে আমি যে শিক্ষা পেয়েছিলাম তা ওয়েস্ট মিনস্টারের চেয়ে যদি উন্নততর নাও হয়, তবে তার মত ভালই ছিল। আমার সামাজিক সৌষ্ঠবের খামতিকে কখনও বাধা হতে দেখি নি।' তিনি লিখেছেন, "I got an education there that was as good as, if not better than, that I would have had at Westminster. I have never found that my lack of social graces has been a hindrance."

স্কুলজীবনের শেষ কয়েকটি বছর হকিং গণিত নিয়ে বিশেষ অধ্যয়ন করেন। তাঁর অঙ্কের মাস্টারমশাই তাঁকে খুবই উৎসাহিত করতে থাকেন, গণিত নিয়ে গভীরভাবে পড়াশুনা করবার জন্য। হকিং অঙ্ককেই তাঁর মুখ্য বিষয় নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু তাঁর বাবা চাইছিলেন হকিংয়ের স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে রসায়নই হোক তাঁর মুখ্য বিষয়। ফ্র্যাঙ্কের যুক্তি ছিল হকিং অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজে রসায়ন নিয়ে পড়বেন। ফ্র্যাঙ্কও ওখানেই পড়েছিলেন। তাছাড়া অক্সফোর্ডের ওই কলেজে গণিত নিয়ে পড়বার ব্যবস্থা ছিল না।



স্টিফেন হকিং [1942-]



হকিংয়ের জীবনী চিত্রায়নের একটি দৃশ্যে হকিং স্বয়ং, আইনস্টাইন (সজ্জিত) ও নিউটন (সজ্জিত)

ফ্যাঙ্ক চাইছিলেন হকিং তাঁর পুরাতন কলেজে রসায়ন নিয়েই পড়াশুনা করুন। তাই স্কুল থেকেই হকিংকে রসায়ন বিশেষভাবে পড়াশুনার কথা বলেছিলেন ফ্র্যাঙ্ক। হকিং কিন্তু বাবার কথা শোনেন নি। তিনি গণিতকেই প্রাধান্য দেন তাঁর স্কুলজীবনের পড়াশুনার সময় থেকেই।

1959 সালের মার্চ মাসে অক্সফোর্ডে প্রকৃতি বিজ্ঞান পড়বার জন্য তিনি স্কলারশিপ পরীক্ষা দেন। পরীক্ষা তাঁর ভাল হয় নি। তবু তিনি স্কলারশিপ পেলেন এবং ভর্তি হলে অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের ডিগ্রী নিতে তিনি বিশেষ বিষয় হিসাবে বেছে নিলেন পদার্থবিদ্যাকে। 1961 সালে তিনি অক্সফোর্ড থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণী নিয়ে ডিগ্রী লাভ করেন। অক্সফোর্ডের পড়াশুনার ব্যবস্থা, পড়াশুনার প্রতি দৃষ্টি -ভঙ্গি স্টিফেন হকিংয়ের মনঃপূত ছিল না। তিনি বলেছেন যে, অক্সফোর্ডে তখন গবেষণা করার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। তিনি লিখেছেন ঃ

"The prevailing attitude at Oxford at that time was very anti-work. You were supposed to be brilliant without effort, or accept your limitations and get a fourth-class degree. To work hard to get a better class of degree was regarded as the mark of a grey man–the worst epithet in the Oxford vocabulary."

অক্সফোর্ড ছেড়ে হকিং তাই কেমব্রিজে গেলেন গবেষণার জন্য। অক্সফোর্ডে তিনি পদার্থবিদ্যা ভালো করে পড়াশুনা করলেও তাঁর অঙ্কের পশ্চাদ্‌পট তেমনভাবে তৈরি হয় নি। অঙ্কশাস্ত্রটা তিনি ভালো করে পড়েছিলেন স্কুল জীবনে। উচ্চতর গণিতের জ্ঞান তিনি অর্জন করতে পারেন নি পদার্থবিদ্যা নিয়ে অক্সফোর্ডে পড়বার সময়। সুতরাং উচ্চতর গণিতে তাঁর জ্ঞান তখন সামান্যই ছিল। এই সামান্য জ্ঞান নিয়েই তিনি কেমব্রিজে গবেষণা করতে গেলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় হল—সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এবং বিশ্বতত্ত্ব [Cosmology]।

তাঁর কেম্ব্রিজে ভর্তি হওয়া নিয়ে একটা গল্প প্রচলিত আছে। স্নাতক পরীক্ষায় আপাতভাবে তাঁর মনে হয়েছিল তিনি প্রথম শ্রেণীতে পাশ করতে পারবেন না। পরীক্ষকদের তাই তিনি জানালেন যে, তিনি যদি প্রথম শ্রেণী পান তবে তিনি কেম্ব্রিজে গবেষণা করতে যাবেন অক্সফোর্ডে থাকবেন না। ঠিক সেই কারণে কি না জানি না প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক পরীক্ষায় পাশ করে তিনি কেম্ব্রিজে চলে গেলেন, অক্সফোর্ডে থাকেন নি। অক্সফোর্ডে তখন অবশ্য কেউ বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতেন না। হকিং চেয়েছিলেন কেম্ব্রিজে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হোয়েলের [Fred Hoyle] কাছে গবেষণা করতে। কিন্তু তাঁর গবেষণার গাইড হয়েছিলেন অধ্যাপক ডেনিস স্কিয়ামা [Denis Sciama]। হকিং প্রথমে এতে বিরক্ত হলেও পরে দেখেছিলেন এতে তাঁর ভালই হয়েছে।

স্নাতক শ্রেণীতে পড়ার শেষ বছরে অর্থাৎ 1962 সালেই তিনি শারীরিক অসুস্থতা বোধ করতে শুরু করেন। ওই বছরের খ্রিস্টমাসের ছুটিতে তিনি অক্সফোর্ড থেকে বাড়ী গেলে তাঁর মা তাঁকে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করেন। 1963 সালের গোড়ার দিকে তাঁকে প্রায়

দু'-সপ্তাহ হাসপাতালে রেখে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তিনি 'মোটর নিউরোন' [Motor Neurone] রোগে আক্রান্ত। এই রোগের অন্য নাম 'লাও গেরিগ রোগ' [Lou Gehrig's Disease]। রোগটি বিরল স্নায়ুঘটিত রোগ এবং এটি মারক রোগও। ডাক্তারেরা বললেন যে, তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না। এমন কি তিনি ডক্টরেট [Ph. D] শেষ করতে পারবেন কিনা তাও সন্দেহের। আশ্চর্য হল, ডাক্তারদের এই ভবিষ্যৎ-বাণী হকিংকে মোটেই প্রভাবিত করে নি। উল্টে তিনি লিখেছেন যে, এই সময়টাই তিনি আরও নিবিড়ভাবে জীবনকে উপভোগ করতে পেরেছেন। আগের জীবনের চেয়ে এই সময় তাঁর দিন কেটেছে অনেক আবেগে, অনেক উত্তেজনায়, অনেক উপভোগ্যভাবে। এই সময় তিনি একটি মেয়েকে ভালোবাসতে শুরু করেন। তাঁকে বিয়ে করে তিনি ঘরসংসার পাতবেন এমন বাসনাও তাঁর মনে আসে। আর তিনি সিদ্ধান্ত নেন এই বিয়ে করার জন্যই তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রীটা নিতে হবে এবং একটা চাকুরি পেতে হবে। তিনি লিখেছেন ঃ "... I therefore started working for the first time in my life. To my surprise I found I liked it."

মৃত্যুর পরোয়ানা পাওযার পর হকিং কিছুটা মর্মাহত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভেঙ্গে পড়েন নি। এই রোগে ডাক্তারদেরও কিছুই করার ছিল না। হকিং কিন্তু মৃত্যু ভয়ে কাতর না হয়ে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান কেম্ব্রিজে। তাঁর নিজেরও মাঝে মাঝে মনে হত তিনি আব বেশিদিন বাঁচবেন না। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েন নি। মৃত্যুভয় মনে এলে তিনি ভাবতেন হাসপাতালে তাঁর বিপরীত দিকের বেডে থাকা একটি কিশোরের মৃত্যুর কথা, যার লিউকেমিয়া [Leukaemia] হয়েছিল। নিজেকে তার তুলনায় ভালো অবস্থায় মনে হত হকিংয়ের। মৃত্যুভয় চলে যেতো তাঁর। এই রোগে আক্রান্ত মানুষ বেশিদিন বাঁচে না। এই রোগের চিকিৎসাও নেই। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে হকিং আজও বেঁচে আছেন। বেঁচে আছেন পুরোপুরি প্রতিবন্ধী হয়ে, হুইল চেয়ার নির্ভর হয়ে। এটা আমাদের কাছে মহা সৌভাগ্যের যে তিনি আজও বেঁচে আছেন।

ফ্র্যাঙ্ক ও ইসোবেলের এক পুত্র এবং দুই কন্যা। সে পুত্র হলেন স্টিফেন হকিং। হকিংয়ের দুই বোনের নাম মেরী এবং ফিলিপ্পা [Philippa]। তারা দুজনেই হকিংয়ের ছোট বোন। হকিংয়ের পিতামাতা এডোয়ার্ড [Edward] নামে একটি ছেলেকে দত্তক নেন। সুতরাং এডোয়ার্ড হল হকিংয়ের ছোটভাই। আবার হকিং এবং তাঁর স্ত্রী জেনের তিনটি সন্তান। বড় ছেলে রবার্ট জন্মান 1967 সালে, মেয়ে লুসি জন্মান 1970-এ এবং এঁদের ছোট ছেলে টিমোথি জন্মেছেন 1979 খ্রিস্টাব্দে। এঁদের কেউই প্রতিবন্ধী নন কিংবা হকিংয়ের ওই মারাত্মক রোগের শিকার নন। জেনের আত্মত্যাগ, সেবা এবং অনুপ্রেরণাই হকিংয়ের বিশ্বখ্যাত হওয়ার প্রধান কারণ। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অতুলনীয় অবদান বিস্ময়ের। তিনি এখনও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পৌত্রদের নিয়ে যৌথ পরিবারে বাস করেন। যৌথ পরিবারই তাঁর সবচেয়ে বেশি পছন্দের।

হকিং যে রোগে ভুগছেন তা যেমন মোটর নিউরোন রোগ, তার তেমনি একটা গালভরা নাম আছে —Amyotrophic Lateral Sclerosis। সংক্ষেপে এটি ALS। এ রোগে মানুষ বেশি দিন বাঁচে না। এ রোগের কারণ অজানা। এর চিকিৎসাও নেই। এই রোগে আক্রান্ত

মানুষ যতদিন বাঁচে ততদিন শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়েই বাঁচে। হকিংয়ের ক্ষেত্রে এগুলির ব্যতিক্রম ঘটেছে। উপরন্তু প্রবল প্রতিবন্ধকতা তাঁর মননশীলতার বিকাশকে রুদ্ধ করতে পারে নি। শারীরিক প্রবল প্রতিবন্ধকতা যেন তাঁর মানসিক বিকাশকে বিশাল বিস্তার দিতে পেরেছে অনেকটা অলৌকিকভাবেই।

ছোটবেলা থেকেই হকিংয়ের শরীর খুব খারাপ ছিল। তিনি খেলাধুলা করতেও খুবএকটা ভালোবাসতেন না। অক্সফোর্ডে ভর্তি হওয়ার পর 17 বছর বয়স থেকে তিনি রোয়িং' [Rowing] এবং 'কক্সিং' [Coxing] করতে থাকেন। এমন কি আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবার মত দক্ষতাও তিনি অর্জন করেন। তারপর 1962 সালের শেষের দিকে তাঁর কালরোগ ধরা পড়ে এবং তারপর তিনি ক্রমশঃ শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'My Experience with ALS' নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

"It was a great shock to me to discover that I had motor neurone disease. I had never been very well co-ordinated physically as a child. I was not good at ball games, and my handwriting was the despair of my teachers. May be for this reason, I didn't care much for sports or physical activities. but things seemed to change when I went to Oxford, at the age of 17. I took up coxing and rowing. I was not Boat Race standard, but I got by at the level of inter-College competition.

In my third year at oxford, however, I noticed that I seemed to be getting more clumsy and I fell over once or twice for no apparent reason. But it was not untill I was at Cambridge, in the following year, that my father noticed, and took me to the family doctor. He referred me to a specialist, and shortly after my 21st birthday, I went into hospital for tests. I was in for two weeks, during which I had a wide variety of tests. They took a muscle sample from my arm, stuck electrodes into me, and injected some radio opaque fluid into my spine, and watched it going up and down with x-rays, as they tilted the bed. After all that, they didn't tell me what I had, except that it was not multiple sclerosis, and that I was an a-typical case. I gathered, however, that they expected it to continue to get worse, and that there was nothing they could do, except give me vitamins. I could see that they didn't expect them to have much effect. I didn't feel like asking for more details, because they were obviously bad.

The relisation that I had in incurable disease, that was likely to kill me in a few years, was a bit of a shock. How could something like that happen to me? Why should I be cut off like this? However, while I had been in hospital. I had seen a boy I vaguely knew die of leukaemia, in the bed opposite me. It had not been a pretty sight. Clearly there were people who were worse off than me. At least my condition didn't make me feel sick. Whenever I feel inclined to be sorry for myself I remember that boy".

নিজের অসুস্থতার কথা জানতে পেরে হকিংয়ের কাছে সারা পৃথিবীটাই বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। এই সময় তাঁর জীবনে এসেছিলেন জেন ওয়াইল্ডে [Jane Wilde]। এঁর জন্যই মন দিয়ে Ph. D করে হকিং চাকুরির চেষ্টা করলেন। 1966 সালে তিনি ডক্টরেট হন। ওই

বছরই তিনি কেম্ব্রিজের গণভিল [Gonville] এবং কীজ [Caius] কলেজে রিসার্চ ফেলো হিসাবে কাজে যোগ দেন। কাজ পাওয়ার কয়েক মাস পরেই তিনি জেনকে বিয়ে করে। 1967 সালে তাঁদের প্রথম সন্তান রবার্ট জন্মগ্রহণ করেন। আগেই বলেছি তাঁদের ছেলেমেয়ের সংখ্যা তিনটি—রবার্ট [1967], লুসি [1970] এবং টিমোথি [Timothy] [1979]। জেনের সেবা-যত্ন, প্রেম-ভালোবাসাই হকিংয়ের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা, আবিষ্কারের প্রেরণা, বিশ্বখ্যাত হওয়ার মূল মন্ত্র। হকিং পরবর্তীকালে লিখেছেন ঃ

"My dreams at that time were rather disturbed. Before my condition had been diagnosed, I had been very bored with life. There had not seemed to be anything worth doing. But shortly after I came out of hospital, I dreamt that I was going to be executed. I suddenly realised that there were a lot of worthwhile things I could do if I were reprieved. Another dream, that I had several times, was that I would sacrifice my life to save others After all, if I were going to die anyway, it might as well do some good. But I didn't die. In fact, although there was a cloud hanging over my future, I found, to my surprise, that I was enjoying life in the present more than before. I began to make progress with my research, and I got engaged to a girl called Jane Wilde, whom I had met just about the time my condition was diagnosed. That engagement changed my life. It gave me something to live for. But it also meant that I had to get a job if we were to get married. I therefore applied for a research fellowship at Gonville and Caius (pronounced Keys) college, Cambridge. To my great surprise, I got a fellowship, and we got married a few months later."

রিসার্চফেলোশিপটা পেয়ে হকিংয়ের চাকুরি সমস্যা মিটলো। শরীর ক্রমশঃ খারাপ হয়ে পড়ছিল। কিন্তু তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার খ্যাতি ক্রমশঃ বাড়ছিল। গবেষণার উন্নতির সঙ্গে শরীরের ক্রমাবনতি হচ্ছিল। কিছুদিন পরে তিনি অধ্যাপকীয় ফেলোশিপ [Professorial Fellowship] পান ওই একই কলেজে। এই সময় তাঁর পারিবারিক জীবনও সুখেরই ছিল। জেনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। তবে জেন তখনও স্নাতক হন নি। তাই জেন সাপ্তাহিক কলেজ-দিনগুলিতে লন্ডন যেতেন ওয়েস্টফিল্ড [Westfield] কলেজে ক্লাশ করার জন্য। হকিং চাইছিলেন তাঁর নিজের কলেজের কাছাকাছি থাকতে, কারণ এই সময় তিনি বেশি দূর হাঁটতে পারতেন না। তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন রাখলেন কলেজের কাছাকাছি তাঁকে একটা বাসা দেওয়ার জন্য। কর্তৃপক্ষ জানালেন ফেলোদের জন্য বাসার বন্দোবস্ত করার কোনও ব্যবস্থাই নেই তাঁদের নিয়মে। কলেজের কাছাকাছি একটা বাজারের পাশে কিছু নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছিল, তারই একটা ভাড়ায় নেওয়ার জন্য হকিং নাম লেখালেন। অনেক বছর পরে হকিং জেনেছিলেন ওই ফ্ল্যাটগুলির মালিক তাঁর নিজের কলেজ কর্তৃপক্ষ। এরপর তিনি গ্র্যাজুয়েট হোস্টেলের একটা ঘরে প্রতিদিন পঁচিশ শিলিং [Shilling] ভাড়া দিয়ে মাত্র তিন দিন থাকেন। তারপর তিনমাসের জন্য থাকেন আরেকটি ফ্ল্যাটে, যেটি অন্য একটি কলেজ কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ছিল। এরপর তাঁরা একটা খালি বাড়ী ভাড়ায় পেয়ে যান। সেখানে কয়েক বছর কাটানোর পর হকিং একটা বাড়ী কেনার কথা ভাবলেন এবং তা কলেজে কর্তৃপক্ষকে জানালেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ অনেক ভেবেচিন্তে কোনও সাহায্য

করলেন না, কারণ হকিং কতদিন বাঁচবেন তার স্থিরতা ছিল না। অবশেষে তিনি এক সোসাইটির তৈরি একটা ফ্ল্যাট কিনলেন। টাকা দিয়ে সাহায্য করলেন তাঁর মাতাপিতা ইসোবেল ও ফ্র্যাঙ্ক। এই নতুন বাড়ীতে তাঁরা চার বছর কাটান। হকিং তখন বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন। তাঁর কলেজ কর্তৃপক্ষেরও পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন 'বার্সার' [Bursar] হকিংয়ের জন্য একতলায় একটা সুন্দর ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিলেন। এই ফ্ল্যাটটি কলেজ কর্তপক্ষের মালিকাধীন ছিল। এর ঘরগুলি ছিল বড়সড় এবং দরজাগুলি যথেষ্ট চওড়া। এর সামনে ছিল সুন্দর সাজানো বাগান। ছেলেমেয়েদের খেলার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। ঘরের দরজাগুলি বড়সড় হওয়ায় হুইলচেয়ার নিয়ে এঘর থেকে ওঘরে যাতায়াত করতে তাঁর অসুবিধা ছিল না। এছাড়া ফ্ল্যাটটি এমন একটা জায়গায় অবস্থিত ছিল যে, সেখান থেকে কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট দুটোই প্রায় সমান দূরে ছিল এবং সেগুলি যেতে তাঁর তেমন কোনও অসুবিধাই হত না। সব মিলিয়ে তিনটি ছেলেমেয়ে এবং জেনকে নিয়ে হকিংয়ের দিনগুলি এই সময় বেশ ভালই কেটেছিল, যদিও তাঁর বেঁচে থাকার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। হকিং লিখেছেন ঃ

".....By this time, the College appreciated me rather more, and there was a different Bursar. They therefore offered us a ground floor flat in a house that they owned. This suited me very well, because it had large rooms and wide doors. It was sufficiently central that I could get to my University department, or the College, in my electric wheel chair. It was also nice for our three children, because it was surrounded by garden, which was looked after by the College gardeners."

1973 সালে তিনি ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোনমি ছেড়ে যোগ দেন কেম্ব্রিজের ফলিত গণিত ও তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা বিভাগে। 1977 সালে তিনি ওই কেম্ব্রিজেরই মহাকর্ষীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 1979 সালে হকিং কেম্ব্রিজে অঙ্কের 'লুকাসীয় অধ্যাপক' [Lucasian Professor of Mathematics] নিযুক্ত হন। লুকাসীয় অধ্যাপকের এই পদটি সৃষ্টি করা হয়েছিল 1663 খ্রীস্টাব্দে। রেভারেণ্ড হেনরি লুকাস [Reverend Henry Lucas] ওই সময় যে অর্থ দান করেন তারই আয় থেকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ওই অধ্যাপক পদটি তৈরি করে। 1663 সালে ওই পদটি সৃষ্টি হলে এই পদে প্রথম যিনি যোগ দেন তিনি হলেন আইজাক ব্যারো [Isaac Barrow]। 1669 খ্রিস্টাব্দে লুকাসীয় অধ্যাপকের পদটি অলঙ্কৃত করেন মহামতি আইজাক নিউটন [Isaac Newton]। রেভারেণ্ড লুকাস ছিলেন পার্লামেন্টের সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তিনি এই সদস্যপদ পান। গণিত শাস্ত্রের লুকাসীয় অধ্যাপকের পদটি পাওয়া হকিংয়ের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেউ জানে না তিনি কখন মারা যাবেন, তিনি নিজেও তা জানেন না। তবু এই গৌরবময় পদটি তিনি পেলেন। গ্যালিলিওর 300-তম মৃত্যুদিনে জন্ম হওয়া এই বিজ্ঞানীটি তাঁর অনিশ্চিত জীবন নিয়ে বসলেন অধ্যাপনার সেই চেয়ারে যে চেয়ারে একদিন বসেছিলেন স্বয়ং নিউটন।

1974 সাল পর্যন্ত হকিং নিজে নিজে খেতে পারতেন, বিছানায় শুতে কিংবা বিছানা থেকে উঠতে পারতেন। জেন তাঁকে সাহায্য করতেন, আবার ছেলেমেয়েদেরও মানুষ

করতে থাকেন। কিন্তু হকিং ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি তাঁর এক গবেষক ছাত্রকে সঙ্গে রাখেন তাঁকে শোয়া-বসায় সাহায্য করার জন্য। 1980 সাল থেকে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়। নার্সের বন্দোবস্ত করা হয়। এই নার্স সকালে ঘন্টা দুয়েক এবং সন্ধ্যায় ঘণ্টা দুয়েক তাঁকে সাহায্য করতো। 1985 সাল অবধি এই ব্যবস্থাই চলে। ওই বছর হকিংয়ের নিউমোনিয়া [Pneumonia] হয় এবং তাঁর 'Tracheotomy Operation' করতে হয়। এরপর থেকেই তিনি 24 ঘন্টার নার্স রাখতে বাধ্য হন। সেই থেকে গত 20 বছর তিনি সারাক্ষণ নার্সের পরিচর্যাতেই আছেন।

1985 সালের ওই অপারেশনের পর থেকেই তাঁর কথা বলা চিরকালের মত বন্ধ হয়ে যায়। এর আগে তিনি জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলতে পারতেন। সেগুলি তাঁর সচিব বুঝতে পারতেন এবং লিখে ফেলতেন। এইভাবে তিনি বহু সেমিনার করেছিলেন। কিন্তু 1985-র ওই অপারেশনের পরে তাঁর কথা বলার ক্ষমতা চিরকালের মত নষ্ট হয়ে যায়। এই সময় তিনি খুবই মুশকিলে পড়েন। না পারছেন তিনি লিখতে, না পারছেন তিনি কথা বলতে। এই সময় চোখের ইশারায় তিনি নিজেকে প্রকাশ করতেন অক্ষর লেখা কার্ডের মাধ্যমে। এই অসুবিধার কথা জেনে ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়ালট ওয়ালটজ [Walt Woltosz] নামের এক কম্পিউটার বিজ্ঞানী তাঁর জন্য একটা ভিন্ন ধরনের কম্পিউটার বানিয়ে দেন। এটিকে মাথা কিংবা চোখ দিয়ে চালানো যায়। এর সাহায্যে হকিং তাঁর বক্তব্য বোঝাতে পারলেন, বক্তৃতা দিতে পারলেন, সেমিনার করতে পারলেন। এরপর ডেভিড ম্যাসন [David Mason] আরেকটি উন্নত মানের ছোট কম্পিউটার বানিয়ে দেন। এই কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে প্রতি মিনিটে তিনি 15টি শব্দ চয়ন করতে পারেন। এইভাবে কথা বলতে না পারা, লিখন ক্ষমতা হারানো এই বিজ্ঞানীটি কম্পিউটারের সাহায্যে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ঃ

"Before the operation, my speech had been getting more slurred, so that only a few people who knew me well, could understand me. But at least I could communicate. I wrote scientific papers by dictating to a secretary, and I gave seminars through an interpreter, who repeated my words more clearly. However, the traheotomy operation removed my ability to speak altogether. For a time, the only way I could comunicate was to spell out words letter by letter, by raising my eyebrows when someone pointed to the right letter on a spelling card. It is pretty difficult to carry on a conversation like that, let alone write a scientific paper. However, a computer expert in California, called Walt Woltosz, heard of my plight. He sent me a computer program he had written, called Eqalizer. This allowed me to select words from a series of menus on the screen, by pressing a switch in my hand. The program could also be controlled by a switch, operated by head or eye movement. When I have built up what I want to say, I can send it to a speech synthesizer. At first, I just ran the Equalizer program on a desk top computer.

However David Mason, of Cambridge Adaptive Communication, fitted a small portable computer and a speech synthesizer to my wheel chair. This system

allowed me to communicate much better that I could before. I can manage up to 15 words a minute. I can either speak what I have written, or save it to disk. I can then print it out, or call it back and speak it sentence by sentence. Using this system, I have written a book, and dozens of scientific papers. I have also given many scientific and popular talks. They have all been well received. I think that is in a large part due to the quality of the speech synthesiser, which is made by Speech Plus. One's voice is very important. If you have a slurred voice, people are likely to treat you as mentally deficient : Does he take sugar? This synthesiser is by far the best I have hear, because it varies the intonation, and doesn't speak like a Dalek. The only trouble it that it gives me an American accent."

হকিংয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি অত্যন্ত ধীরগতিতে হওয়ায় পারিবারিক জীবনে এবং কর্মজীবনে সাফল্য পেতে তাঁর কিছুটা অসুবিধা হলেও, সে সাফল্য তিনি পেয়েছেন। পেয়েছেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি, বিপুল পরিচিতি। এটা সৌভাগ্যের যে, তিনি এই রোগ নিয়ে এতদিন বেঁচে আছেন এবং এটা আশ্চর্যের যে, এই রোগ তাঁর মননশীলতা এবং চিন্তা-ভাবনাকে নষ্ট করতে পারে নি।

1965 থেকে 1970 সালের মধ্যে হকিংয়ের মুখ্য গবেষণার বিষয় ছিল সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে অনন্যতা [Singularities]। বিশ্বতত্ত্বের প্রেক্ষিতে এই অনন্যতার জন্য তিনি কতকগুলি গাণিতিক প্রয়োগ কৌশল আবিষ্কার করেন। তাঁর এই সময়ের বেশির ভাগ আবিষ্কারই তিনি করেছিলেন রজার পেনরোজের [Roger Penrose] সহযোগে। পেনরোজ এই সময় বার্কবেক কলেজের [Birkbeck College] সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লন্ডনের বার্কবেক কলেজ থেকে পেনরোজ পরে অক্সফোর্ডে চলে যান। হকিং লিখেছেন ঃ

"1970 সাল পর্যন্ত আমার গবেষণা ছিল বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে। এই সময় আমার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ছিল অন্যতা [Singularities]। দূরতম নীহারিকাগুলি নির্দেশ করে তারা আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাবিশ্বের বিস্তার বেড়ে চলেছে। এর অর্থ হল অতীতে তারা নিকটর ছিল। এরপর প্রশ্ন ওঠে এমন কি কোনও সময় ছিল, যখন নীহারিকাগুলি পরস্পরের উপর চাপানো ছিল এবং মহাবিশ্বের ঘনত্ব ছিল অসীম? নাকি অতীতে আর একটি সংকোচন দশা [Contracting Phase] ছিল যখন নীহারিকাগুলি পরস্পরকে আঘাত করা এড়াতে পেরেছিল? হয়ত তারা পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে আবার পরস্পর থেকে দূরে অপসরণ শুরু করেছিল। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে নতুন গাণিতিক সমাধানের প্রয়োজন ছিল। এগুলি বিকাশ লাভ করে 1965 সাল থেকে 1970 সালের মধ্যে। এ কাজ করেছিলাম প্রধানত আমি আর রজার পেনরোজ। পেনরোজ তখন ছিলেন বার্কবেক কলেজে, এখন তিনি আছেন অক্সফোর্ডে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সত্য হলে অতীতে নিশ্চয়ই একটা অসীম ঘনত্বের অবস্থা ছিল। এ তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য ওইসব গাণিতিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিলাম।"

1970 সালের পর হকিং তাঁদের এই অনন্যতা তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়ে কৃষ্ণগহ্বরের

[Black Hole] যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন। কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষণা শুরু করেই তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে ফেললেন। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে তিনি দেখালেন, কৃষ্ণগহ্বর বিকিরণ নিঃসৃত করতে পারে। এই সাফল্যের পর থেকেই তিনি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টামবাদের মেলবন্ধন করার গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। 1971 সালে হকিং বিশ্বসৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে ভবিষ্যদ্বাণীকে করেন যে, মহাবিস্ফোরণের [Big Bang] পর বহু বস্তুকণা উৎপন্ন হয়েছিলো যেগুলির আকার প্রোটনের আকার হলেও তাদের প্রত্যেক ভর ছিল 10^9 কোটি বা 100 কোটি মেট্রিক টন। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষ বল বা মহাকর্ষ ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত হয় সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে, কিন্তু তাদের উপর কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের সূত্রগুলিও সমানভাবে প্রযোজ্য।

হকিং লিখেছেন ঃ "অসীম ঘনত্বের অবস্থাকে বলা হয় 'মহাবিস্ফোরণ অনন্যতা'। এর অর্থ হল সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ যদি নির্ভুল হয় তবে মহাবিশ্ব কি করে শুরু হল বিজ্ঞান সে বিষয়ে কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু আমার আরও আধুনিক গবেষণা নির্দেশ করে যে, কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে মহাবিশ্বের আরম্ভ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।

"সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী হল 'পারমাণবিক জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে বেশি ভরের নক্ষত্রগুলি নিজেদের মধ্যে চুপসে যাবে। আমার এবং পেনরোজের গবেষণায় দেখা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অসীম ঘনত্বের অনন্যতায় না পৌঁছাবে ততক্ষণ তারা চুপসে যেতেই থাকবে। এই অনন্যতায় ঘটবে কালের সমাপ্তি, অন্ততপক্ষে ওই নক্ষত্র এবং তার উপরে অবস্থিত বস্তুর সাপেক্ষে। অনন্যতার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এতই শক্তিশালী হবে যে, আলোক তার নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে বেরোতে পারবে না, বরং সেই আলোককে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র পিছনে টেনে রাখবে। যে অঞ্চল থেকে আলোর নিষ্ক্রমণ সম্ভব নয়, তার নাম কৃষ্ণগহ্বর [Black Hole] এবং তার সীমানাকে বলা হয় 'ঘটনা দিগন্ত' [Event Horizon]। যে কোন বস্তু কিংবা ব্যক্তি ঘটনা দিগন্ত দিয়ে এই কৃষ্ণগহ্বরে এসে পড়লে অনন্যতায় এসে সে কালের সমাপ্তিতে পৌঁছাবে।"

কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষণা শুরুর সময়ের একটা ঘটনার কথা হকিং লিখেছেন তাঁর 'Oxford and Cambridge' প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন ঃ "1970 সালে আমার মেয়ে লুসির জন্মের কয়েকদিন পর এক রাত্রে বিছানায় শুতে যাওয়ার সময় কৃষ্ণগহ্বরের কথা ভাবছিলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম, আমি আর পেনরোজ অনন্যতা প্রমাণ করার জন্য যে গাণিতিক প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছি সেগুলি কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে ঘটনা দিগন্তের এলাকা অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরের সীমানা কালে কালে হ্রাস পেতে পারে না এবং দুটি কৃষ্ণগহ্বরের সংঘর্ষের পর তারা সংযুক্ত হয়ে যদি একটি কৃষ্ণগহ্বর গঠন করে তবে এই গহ্বরের দিগন্ত প্রাথমিক কৃষ্ণগহ্বরগুলির দিগন্তের এলাকার চাইতে বেশি হবে। সংঘর্ষে কতটা শক্তি বিচ্ছুরিত হবে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ সীমা এর ফলে তৈরি হল। আমি এতই উত্তেজিত হয়েছিলাম যে, সে রাত্রে বিশেষ ঘুমোতে পারি নি।"

হকিং তাঁদের এই গাণিতিক প্রযুক্তি কৌশল তথা প্রয়োগ কৌশল কাজে লাগিয়ে 1983 সলে সান্টা বারবারার [Santa Barbara] জিম হার্টলের [Jim Hartle] সঙ্গে প্রকাশ করলেন না-সীমানা প্রস্তাব [No Boundary Proposal]। হকিং নিজেই এই প্রস্তাব সম্পর্কে বলেছেন ঃ "...that both time and space are finite in extent, but they don't have any boundary or edge. ... there would be no singularities, and the laws of science would hold everywhere, including at the beginning of the universe."

হকিংয়ের আশ্চর্যজনক আবিষ্কার হল কৃষ্ণগহ্বর পুরোপুরি কালো নয়। কৃষ্ণগহ্বরও কণিকা এবং বিকিরণ নিঃসরণ করতে পারে। তাঁর এই আবিষ্কার কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা বদলে দেয়। তেমনি তাঁর না-সীমানা প্রস্তাবও বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে পূর্বাপর ধারণার পরিবর্তন ঘটায়। তাঁর লেখা থেকেই বলি ঃ

"1970 সাল থেকে 1974 সাল পর্যন্ত আমি কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষণা করেছি। কিন্তু 1974 সালে বোধ হয়, সব চাইতে আশ্চর্যজনক আবিষ্কার করেছিলাম। কৃষ্ণগহ্বর সম্পূর্ণ কৃষ্ণ নয়। পদার্থের কোয়ান্টামের আচরণ বিচার করলে দেখা যায় কৃষ্ণগহ্বর থেকে কণিকা এবং বিকিরণ নিঃসৃত হতে পারে। কৃষ্ণগহ্বর তপ্ত বস্তুপিণ্ডের মতো বিকিরণ নিঃসৃত [Emit] করতে পারে।"

না-সীমানা প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ "1974 সাল থেকে আপেক্ষিকতাবাদ এবং কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের সমন্বয় করে একটি সঙ্গতিপূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি। সান্টা বারবারাতে [Santa Barbara] আমি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জিম হার্টলের কাছে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম সেই প্রস্তাব এরই ফলশ্রুতি। প্রস্তাবটা হল, সময় এবং মহাকাশ [Space] দুটিই সীমিত। কিন্তু এদের কোনও সীমানা বা কিনারা [Edge] নেই। এরা অনেকটা পৃথিবীপৃষ্ঠের মতো কিন্তু এদের আরও দুটি মাত্রা [Dimension] থাকবে। পৃথিবীপৃষ্ঠের এলাকা সীমিত। কিন্তু এদের কোনও সীমানা নেই। আমার সমস্ত ভ্রমণেও কখনো আমি পৃথিবীর কিনারা থেকে পড়ে যেতে পারি নি। এ প্রস্তাব যদি সত্য হয় তাহলে কোনও অনন্যতা থাকবে না এবং বিজ্ঞানের নিয়মগুলি সর্বত্রই প্রযোজ্য হবে, এমন কি মহাবিশ্বের শুরুতেও। মহাবিশ্ব কেমন করে শুরু হল সেটাও স্থির করবে বিজ্ঞানের নিয়ম। আমার উচ্চাশা হল, মহাবিশ্ব কি করে শুরু হল তা আবিষ্কার করা। হয়ত সে প্রচেষ্টায় আমি সাফল্য লাভ করতাম কিন্তু আমি এখনও জানি না কেন পৃথিবী শুরু হল।"

1982 সালে হকিং ঠিক করলেন তিনি বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে বই লিখবেন। 1984 সালে তিনি তাঁর অতি বিখ্যাত বই 'A Brief History of Time'-এর প্রথম পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেন। এই সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আগেই বলেছি, 1985 সালে তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন এবং তাঁর 'Tracheotomy Operation' করতে হয়। তিনি প্রাণে বাঁচলেও তাঁর বাকশক্তি হারান চিরকালের জন্য। ফলে, তাঁর 'A Brief History of Time' শেষ করতে অনেকটা দেরীই হয়।

হকিংয়ের ভাষায় ঃ

"I was in Geneva, at CERN, the big particle accelerator, in the summer of 1985. ... I caught pneumonia and was rushed to hospital. The hospital in Geneva suggested to my wife that it was not worth keeping the life support machine on. But she was having none of that. I was flown back to Addenbrooke's Hospital in Cambridge, where a surgeon called Roger Grey carried out a tracheotomy. That operation saved my life but took away my voice."

এরপর হকিংকে দেওয়া হয় এক বিশেষ ধরনের কম্পিউটার যার সাহায্যে তিনি তৈরি করতে পারেন ইলেকট্রনিক স্বর [Electronic Voice]। এসব করে উঠতে অনেকটা সময় চলে যায়। কথা বলতে না পারা এবং লিখতে অক্ষম একেবারে প্রতিবন্ধী হকিং তাই তাঁর ওই বিখ্যাত বইটি প্রকাশ করতে অনেকটা সময় নেন। 1988 সালে বইটির পাণ্ডুলিপিকে পরিমার্জন করে প্রকাশ করা হয়। 'A Brief History of time' অবশেষে প্রকাশিত হয় 1988 সালের এপ্রিল মাসে। বইটির বিক্রি সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। 1995 সালের মে মাসের মধ্যে The Sunday Times হিসাব করে জানায় যে, বইটি 237 সপ্তাহ ধরে বেস্ট সেলার তালিকায় ছিল। এর আগে বেস্ট-সেলার [Best Seller] রেকর্ড ছিল 184 সপ্তাহের। 1998 সালের 'গিনিস বুক অফ রেকর্ডস' [Guinness Book of Records]-এ উঠে আসে রেকর্ড-বিক্রি হওয়া এই বইটির নাম। 1995 সালের 6ই এপ্রিল বইটির পেপার-ব্যাক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তিন দিনের মধ্যেই এটি আবার বেস্ট সেলারের তালিকার এক নম্বরে উঠে আসে। 1993 সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে অর্থাৎ মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই 'A Brief History of Time'-এর মলাট বাঁধাই সংস্করণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয় 40 বার এবং ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয় 39 বার। হকিং বহু বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধগুলির কয়েকটি নিয়ে 1993 সালে আমেরিকাতে প্রকাশিত হয় হকিংয়ের দ্বিতীয় বই 'Black Holes and Baby Universes and other Essays'। এই বইটিও বিখ্যাত, তবে তা 'A Brief History of Time'-এর মত বিখ্যাত নয়। দ্বিতীয় বইটি প্রকাশিত হয় 1993 সালের অক্টোবর মাসে। এই বইটিও বহুল বিক্রীত। এছাড়াও তাঁর বহু গবেষণাপত্র যথানিয়ম প্রকাশিত হয়েছে। হকিংয়ের লেখাগুলি সত্যি সত্যিই অনন্য এবং অসাধারণ।

1974 সালে মাত্র 33 বছর বয়সেই হকিং লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য [FRS] নির্বাচিত হন। সে কথা দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে এই লেখার শুরু করেছি। আইজাক নিউটনের স্বাক্ষর-ধন্য এই সোসাইটির খাতায় হকিংয়ের স্বাক্ষর নেওয়ার সময় এতো কালের নিয়ম ভেঙে ফেলা হয়। নব-নির্বাচিত সদস্যেরা এতাবৎ নিজেরা হেঁটে স্টেজে উঠে ওই খাতায় স্বাক্ষর করতেন। হকিংয়ের বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটানো হয়। 1974 সালে প্রতিবন্ধী হকিং যেখানে বসেছিলেন সেখানেই খাতাটি বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর স্বাক্ষরের জন্য। আর সে খাতাটি বয়ে নিয়ে যান রয়েল সোসাইটির সভাপতি স্যার অ্যালান হজকিন [Sir Alan Hodgkin] স্বয়ং। ডাক্তাররা মনে করতেন হকিং 25 বছরের বেশি বাঁচবেন না। কিন্তু যেভাবেই হোক তিনি আজও বেঁচে আছেন এবং যান্ত্রিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতেও পারছেন। তিনি বলেছেন, FRS হওয়াটা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান।

হকিং সারাজীবনে বহুভাবে সম্মানিত হয়েছেন। বহু পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন। এই সব পুরস্কারের কয়েকটি হল ঃ অ্যালবার্ট আইনস্টাইন পুরস্কার [1978], অ্যাডম্‌স পুরস্কার [1966], এডিংটন পদক [1975], হপকিনস্‌ পুরস্কার [1976], ড্যান্নি হেইনেমান পুরস্কার [Dannie Heinemann Prize] [1976], ম্যাক্সওয়েল পুরস্কার [1976], হিউজেস পদক [Hughes Medal] [1976], ইজরায়েলের উলফ ফাউন্ডেশন পুরস্কার [Israeli wolf Foundation Prize] [1988]। এই পুরস্কারটি তিনি পেয়েছিলেন রজার পেনরোজের সঙ্গে। এই পুরস্কারটি দেওয়া হয় পদার্থবিজ্ঞানে তাঁদের অবদানের জন্য।

প্রাক্তন লুকাসীয় অধ্যাপক পল ডিরাকের নামাঙ্কিত 'পল ডিরাক পদক' পান হকিং 1987 সালে। বৃটেনের রাজ পরিবার তাঁকে 'Commander of the British Empire' (CBE) উপাধিতে ভূষিত করেন। 1989 সালে রাণী এলিজাবেথ তাঁকে 'Companion of Honour' সম্মান দিয়ে সম্মানিত করেন। হকিং মোট এগারোটি সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হল ঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় [1978], শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় [1981], নোটারড্যাম বিশ্ববিদ্যালয় [1982], প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় [1982], নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় [1982], লীডস [Leeds] বিশ্ববিদ্যালয় [1987], নিউ ক্যাসল্‌ [New Castle] বিশ্ববিদ্যালয় [1987], টাফ্‌ট্‌স [Tufts] বিশ্ববিদ্যালয় [1989], ইয়েল [Yale] বিশ্ববিদ্যালয় [1989], কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় [1989], এবং হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয় [1990]।

বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানীরা অনেক সময় ভুল করতে পারেন। সে সম্ভাবনা তাঁদের ক্ষেত্রে খুবই প্রবল। এই সব ভুলগুলি কিছুদিনের মধ্যেই নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় এবং ভ্রান্তিসমূহের নিরসন করা হয় বা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এমন কিছু ভুল আছে যেগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়। সেগুলির সংশোধন হতে কয়েকশো বছর লেগে যায়। এই সব ভুলের সেরা উদাহরণ হল নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্ব। এই তত্ত্ব দিয়ে বুধগ্রহের কক্ষপথের অয়নচলন [Precession] সঠিকভাবে নির্ণয় করা গেল না বহুদিন। কিন্তু আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এবং মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রতত্ত্ব দিয়ে এই অয়ন চলন সঠিকভাবে নির্ণয় করা গেল। এটাকে নিউটনের ভুল না বলে, মহাকর্ষকে আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে—এটা বলাই যুক্তিসঙ্গত। আইনস্টাইন তাঁর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রতত্ত্ব দিয়ে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বকে প্রতিস্থাপিত করলেন। আইনস্টাইনের তত্ত্বকে বলা যায় নিউটনের তত্ত্বের পরিশোধন [Refinement]। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ কিংবা বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সরাসরি কোন প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব রাখে না। বুধের অয়নচলনের পরিশোধন সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের জীবনে কোনওভাবেই কোন প্রভাব ফেলে না। কিন্তু তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে এই সব আবিষ্কার বিশেষ করে আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রতত্ত্ব মহাকর্ষকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে এবং অব্যাখ্যাত ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে। বিজ্ঞানজগতে এই সব পরিশোধনের প্রয়োজন আছে। আর এগুলি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও কাজে লাগতে পারে গভীরভাবে, যেমন কাজে লাগছে $E = mc^2$ সূত্র

পারমাণবিক চুল্লিতে এবং অন্যত্র। হকিংও এই রকম পরিশোধন করাব আশা করেছেন। আবার কিছু ভুলও করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ বুধের কক্ষপথের অয়নচলনের কথা বলে নিই, তারপর হকিংয়ের নানা পরিশোধন কাজের কথায় আসবো। সূর্যের থেকে যে গ্রহ যত বেশি দূরে তার কক্ষপথ হবে তত বেশি বৃত্তাকার। কাছাকাছি থাকা গ্রহদের সূর্য পরিক্রমণ পথ উপবৃত্তাকার। বুধ গ্রহ যেহেতু সূর্যের খুব কাছাকাছি আছে তাই তার কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা [Eccentricity] অত্যন্ত বেশি। নিউটনের সূত্রে বুধগ্রহের কক্ষপথের অয়নচলন সঠিক করে নির্ণয় করা যাচ্ছিল না। পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে মিল ছিল না সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা ফল। এই ফলাফল দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব কেন সূর্যের কাছাকাছি গ্রহদের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার এবং দূরে অবস্থিত গ্রহগুলির কক্ষপথ কেন অনেকটা বেশি বৃত্তাকার। নিউটনের সূত্রানুসারে কোন গ্রহের সূর্যের চারদিকে ঘোরার অবকল সমীকরণ [Differential Equation] হল ঃ

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{\alpha}{h^2u^2}$$

আইনস্টাইন তাঁর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রতত্ত্ব থেকে এই সমীকরণকে বদলে দিলেন ঃ

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{\alpha}{h^2u^2} + 3\alpha$$

যেগুলিতে, $u = \frac{1}{r}$ = Radius Vector

$\alpha = Mu^2$, যেখানে,

M = গুরুবস্তুটির ভর; বুধের বেলায় তা সূর্যের ভর।

h = ক্ষেত্রীয় গতি [বুধের]।

বহুদিন বুধের অনুসূরের [Perihelion] তথা কক্ষপথের অয়নচলন [Precession] নিউটনের সূত্র দিয়ে সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় নি। এই অয়নচলন গতি বাস্তবে প্রতি 100 বছরে 574 সেকেন্ড [কৌণিক]। নিউটনের সূত্র দিয়ে এই মান পাওয়া গেল 532 সেকেন্ড। পার্থক্য হল 42 সেকেন্ডের। নিউটনের সমীকরণের সঙ্গে আইনস্টাইনের সমীকরণের পার্থক্য হল 3α এবং এর থেকে আইনস্টাইন দেখালেন বুধের কক্ষপথের অয়নচলনের ওই পার্থক্য $\varepsilon = \frac{6\pi M^2}{h^2}$, যেখানে M = সূর্যের ভর, h = বুধের ক্ষেত্রীয় গতি। এখান থেকে ε-এর মান বের হল 43 সেকেন্ড প্রতি বছরে। সুতরাং আইনস্টাইনের মহাকর্ষ ক্ষেত্রতত্ত্ব তথা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রমাণিত হল। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে বুধের কক্ষপথের অয়নচলনের মান পাওযা গেল 575 সেকেন্ড প্রতি 100 বছরে। এই মান বাস্তব মানের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। মহাকর্ষ সম্পর্কে আইনস্টাইনের দেওয়া সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ আবারো সত্য বলে প্রমাণিত হল এবং

তাঁর মহাকর্ষ ক্ষেত্রতত্ত্ব [Gravitational Field Theory] প্রতিষ্ঠিত হল। হকিং এই রকম কিছু পরিশোধন করেছিলেন।

হকিং কিছু ভুল করেছেন যেগুলি খুবই পরিচিত। ভ্রান্তি এবং তার সংশোধন এভাবেই বিজ্ঞান এগিয়ে চলে। নতুন তত্ত্ব বদলায় নতুনতর গবেষণায়, নবীনতম আবিষ্কারে। এর কারণ হল সমস্ত সত্য একসঙ্গে কেউ জেনে ফেলে না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন হকিংও এরকম ভুল করেছেন। তাঁর একটি ভুল হল, তিনি বিশ্বাস করতেন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ শেষ হলে আবার যখন সংকোচন শুরু হবে তখন মহাবিশ্ব ছোট হতে হতে এক সময় মূল বিন্দুতে ফিরে যাবে এবং তার সঙ্গে মানুষের জীবন বিপরীতমুখী হবে, সামনের দিকের গতি পিছনের গতি হবে, উল্টোমুখী হবে। হকিং, বিশ্বের সংকোচনের সময় সবকিছু উল্টো হবে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন। পরে অবশ্য তাঁর এক সহকর্মী এবং এক ছাত্র তাঁর এই ভুল ভেঙে দেন।

বিশ্বসৃষ্টির রহস্য নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহুকাল ধরে মাথা ঘামিয়ে চলেছেন। বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে মহাবিস্ফোরণের পরের কয়েক সেকেন্ড কী ঘটেছিল তার একটা হদিস আমরা পাই। এই হদিশগুলি এখনও সর্বজন গ্রাহ্য নয়। হকিং চান একটা নির্দিষ্ট তত্ত্বে এই সব হদিশগুলির একটা সংযুক্তি ঘটাতে। হকিংয়ের মতে, মূল সমস্যা হল, আমাদের বৃহৎ মাপের বিশ্বের জন্য একটা তত্ত্ব আছে, আবার ক্ষুদ্র মাপের বিশ্বের জন্য আরেকটা তত্ত্ব রয়েছে এবং এই দুটি তত্ত্ব পরস্পর সংগতিহীন। তাঁর মতে এই দুটি তত্ত্বই অসম্পূর্ণ। তাঁর গবেষণার বিষয় হল, এই দুটি তত্ত্বকে একীভূত করা, এই দুটি তত্ত্বের সংযুক্তিকরণ। বৃহৎ মাপের বিশ্বের তত্ত্ব হল আপেক্ষিকতাবাদ, আর ক্ষুদ্র বিশ্বের তত্ত্ব হল কোয়ান্টামবাদ। হকিংয়ের মূল লক্ষ্য হল আপেক্ষিকতাবাদ এবং কোয়ান্টামবাদকে একটি তত্ত্বে গ্রথিত করা। এই দুই তত্ত্বকে মিলিয়ে ফেলতে হলে চাই মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব [Quantum Theory of Gravitation]। তিনি তাঁর 'A Brief History of Time'-এ লিখেছেন ঃ

"Unfortunately, however, these two theories are known to be inconsistent with each other – they cannot both be correct. One of the major endeavors in physics today, and the major theme of this book, is the search for a new theory that will incorporate them both–a quantum theory of gravity. We do not yet have such a theory, and we may still be a long way from having one, but we do already know many of the properties that it must have. And we shall see, in later chapter, that we already know a fair amount about the predictions a quamtum theory of gravity must make."

1955 সালের আইনস্টাইনের মৃত্যুর পরে বিশ্বে মৌল বল ছিল চারটি—সবল মিথস্ক্রিয়া [Stong Inferaction] বা সবল বল [Strong Force], দুর্বল মিথস্ক্রিয়া [Weak Interaction] বা দুর্বল বল [Weak Force], তড়িচ্চুম্বকীয় বল [Electromagnetic Force] এবং মহাকর্ষ বল [Gravitatonal Force]। সবল বল পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন এবং নিউট্রনগুলিকে একত্রে ধরে রাখছে। দুর্বল বল রয়েছে তেজস্ক্রিয়তায় এবং পরমাণুর অবক্ষয়ে। তড়িচ্চুম্বকীয় বল হল ধনাত্মক তড়িতাহিত প্রোটন এবং ঋণাত্মক তড়িতাহিত ইলেকট্রনদের পরমাণুর

মধ্যে একত্রে ধরে রাখা বল। ইলেকট্রনরা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক তড়িৎসম্পন্ন প্রোটনের চারপাশে যথাস্থানে অবস্থান করছে এই বলের প্রভাবেই। এই বলের প্রভাবে অণুগুলিও পদার্থের মধ্যে একত্রে অবস্থান করছে। এই বলই রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানের ভিত্তি। উপরোক্ত তিনটি বলই ছোট স্কেলে [Scale] ক্রিয়া করে। মহাকর্ষ বল এমনিতে খুবই দুর্বল, কিন্তু এটি কাজ করে বিশাল বিশাল দূরত্বে। অন্য তিনটি বল কাজ করে অল্প দূরত্বে, যদিও তারা মহাকর্ষ বলের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। আর মহাকর্ষ বল এদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও কাজ করে বিশাল বিশাল দূরত্বে।

আবদুস সালামদের ইলেকট্রোউইক তত্ত্ব দুর্বল মিথস্ক্রিয়া বা দুর্বল বল এবং তড়িচ্চুম্বকীয় বলকে এক করে দিয়েছে। দুর্বল বল যে কণার দ্বারা বাহিত হয় সেই $W^{\pm}$ ও Z^{0} কণা পরীক্ষাগারে আবিষ্কৃত হয়েছে। সবল বলকে 'গ্র্যান্ড উনিফিকেশন' তত্ত্বসমূহ [Grand Unification Theories (GUTs) এবং Super Symmetry (SUSYs)] তত্ত্বের সাহায্যে একীভূত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মহাকর্ষকে অন্য মৌল বলের সঙ্গে একীভূত করার চেষ্টা আজও সফল হয় নি। আইনস্টাইন মহাকর্ষ বল ও তড়িচ্চুম্বকীয় বলকে একীকরণের চেষ্টা করেছিলে তার জীবনের শেষ 30 বছর ধরে। কিন্তু সফল হন নি। এই মহাকর্ষ বলই তৈরি করে কৃষ্ণগহ্বর। এই কৃষ্ণগহ্বরে বস্তুঘনত্ব এতো প্রবল যে এর থেকে কোনও কিছু বেরিয়ে আসতে পারে না এর প্রবল মহাকর্ষ ক্ষেত্রকে এড়িয়ে। কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষ বল এতো বেশি যে আলোক রশ্মিও তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। কৃষ্ণগহ্বর সে কারণেই কৃষ্ণ [Black]।

কৃষ্ণগহ্বরকে দেখা না গেলেও, একটা নক্ষত্র যখন কৃষ্ণগহ্বরের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে তার বস্তুর ক্ষয় ঘটে, তখন তা দেখা যায় এবং এর থেকে কৃষ্ণগহ্বরটির অবস্থান নির্ণয় করা যায়। পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে মুক্তি পেতে হলে কোনও বস্তুর গতিবেগ হতে হবে প্রতি সেকেন্ডে সাত মাইল [11 2 কিমি] বা ঘণ্টায় 25000 মাইল। কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষ থেকে পরিত্রাণ পায় না ফোটনকণাও তার সেকেণ্ডে 3,00,000 কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে।

আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের জানান দেয়। চন্দ্রশেখরের [S Chandrasekhar] আবিষ্কার থেকে আমরা জানি সূর্যের পারমাণবিক জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার পর সেটি একটি শ্বেত বামন [White Dwarf] তারায় পরিণত হবে। চন্দ্রশেখর সীমার মধ্যে থাকা অর্থাৎ সূর্যের ভরের 1·4 গুণের অধিক ভর না হওয়া নক্ষত্রেরা সব শ্বেত বামন তারা হবে। আর একটু বেশি ভরসম্পন্ন নক্ষত্রেরা নিউট্রন তারা হবে। আর সূর্যের ভরের পাঁচগুণ বা তারও বেশি ভরসম্পন্ন নক্ষত্রেরা তাদের নক্ষত্র-জীবন শেষে কৃষ্ণগহ্বর হয়ে যাবে। কোনও কোনও নক্ষত্র এতো ক্ষুদ্র হয়ে যাবে যে, তাদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রগুলি আলোককে বাঁকিয়ে এমন জায়গায় নিয়ে আসবে যে, সেই আলোক নক্ষত্রটিতেই আবার ফিরে আসবে। আর কোনও আলোক কিংবা কোন কিছুই তার থেকে বেরিয়ে আসতে

পারবে না বা পালাতে পারবে না। কৃষ্ণগহ্বরের এই ধর্মের কথা আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব থেকেই পাওয়া যায়।

হকিং কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে বেশ কিছু নতুন তত্ত্ব দেন। এগুলিই তাঁকে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে বিখ্যাত করে। তিনিই প্রথম বলেন, কৃষ্ণগহ্বর থেকে কণা কিংবা শক্তির বিকিরণ সম্ভব। তাঁর তত্ত্ব বলে যে কৃষ্ণগহ্বর থেকে তাপীয় বিকিরণ হয়। তাঁর তত্ত্ব থেকে পাই,

$$S = KA,$$

যেখানে, S = এনট্রপি [Entropy]

K = হকিং ধ্রুবক [Hawking's Constant]

A = কৃষ্ণগহ্বরের বহির্তলের ক্ষেত্রতল।

এই সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়, কোনও কৃষ্ণগহ্বরের বহির্তলের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে তার এনট্রপি তথা তাপ-ধারিতার [Thermal Capacity] সম্পর্ক আছে সরাসরিভাবে। কৃষ্ণগহ্বরের তাপ নিঃসরণ বা তার তাপীয় বিকিরণ মাপা সম্ভব। সুতরাং কৃষ্ণগহ্বর পুরোপুরি 'কৃষ্ণ' নয়। এই নিঃসরণ বা বিকিরণ প্রক্রিয়া কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি তাঁর 'A Brief History of Time'-এ লিখেছেন ঃ

"The existence of radiation from black holes seems to imply that gravitational collapse is not as final and irreversible as we once thought. If an astronaut falls into a black hole, its mass will increase, but eventually the energy equivalent of that extra mass will be returned to the universe in the form of radiation"

মহাশূন্যে এক জোড়া কণিকা আসছে এবং মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রতি জোড়া কণিকার একটি কণিকা এবং অন্যটি বিপরীত-কণিকা [Anti-particle]। তাদের জীবনকাল খুবই স্বল্প। তারা একে অপরকে ধ্বংস করে। এই ঘটনা যদি কোনও কৃষ্ণগহ্বরের কাছে ঘটে তখন বিপরীত কণিকাগুলি কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হয় এবং ধনাত্মক কণিকাগুলি কৃষ্ণগহ্বর থেকে দূরে চলে যেতে পারে। তখন মনে হয়, ওই ধনাত্মকগুলি কৃষ্ণগহ্বর থেকে বেরিয়ে এলো। ঋণাত্মক বা বিপরীত কণিকাগুলি কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হওয়ার ফলে কৃষ্ণগহ্বরের ভর এবং শক্তি দুই-ই কমে যায়। এই তাপ ক্ষয় বা শক্তিক্ষয় 'হকিং বিকিরণ' [Hawking's Radiation] নামে পরিচিত। এর ফলে এমন একটা সময় আসতে পারে যখন কৃষ্ণগহ্বরে বিস্ফোরণ হওয়া সম্ভব।

বিশ্বতত্ত্ব হল সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্বের গবেষণা এবং তাকে জানা। মহাবিশ্বের প্রারম্ভ এর মুখ্য অংশ এবং এ বিশ্বের ভবিষ্যত কী তা জানাও এর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বহু শতাব্দী ধরে বিশ্বকে ধরে নেওয়া হয়েছে অপরিবর্তনীয় হিসাবে। একালে অবশ্য বলা হয়েছে মহাবিশ্বের একটা শুরু বা আরম্ভ ছিল। পাশ্চাত্য ধর্মগুলিতে বিশ্ব এক সময় সৃষ্ট হয়েছিল বলা হয়। প্রাচ্য দর্শন তথা হিন্দু দর্শন বলে, বিশ্ব প্রসারিত হয়, সংকুচিত হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। বিশ্বের সৃষ্টিও নেই, ধ্বংসও নেই। আছে কেবল পরিবর্তন।

মহাবিশ্বের শুরু নিয়ে আজ প্রায় সবাই একমত যে, এক মহাবিস্ফোরণ দিয়ে মহাজাগতিক অণ্ড [Cosmic Egg] থেকে বিশ্বের বিকাশের শুরু। এই মহাজাগতিক অণ্ডটি হকিংয়ের অনন্যতা [Singularity]। প্রায় 1500 কোটি বছর আগে ঘটেছিল সেই মহাবিস্ফোরণ [Big Bang]। সেই মহাজাগতিক অণ্ডটি তখন ছিল অসীম ক্ষুদ্র, অসীম ঘনত্বসম্পন্ন এবং অসীম উত্তপ্ত। সেই অনন্যতা, সেই মহাজাগতিক অণ্ড একদিন বিস্ফোরিত হল, প্রসারিত হতে থাকল এবং ক্রমশঃ শীতল হতে লাগল। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব কতটা ঠিক তার পরীক্ষারও প্রয়োজন হল। 1992 সালে COBE স্যাটেলাইটের সাহায্যে প্রমাণিত হল মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব সঠিক।

কণা-ত্বরায়কের ত্বরণ বাড়িয়ে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন বস্তু কীভাবে তৈরি হল তা বের করতে। এ পর্যন্ত তাঁরা দেখাতে পেরেছেন, কণা-জগতে কণিকাদের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা দেয় 'স্ট্যান্ডার্ড মডেল' [Standard Model]। এই মডেলে বস্তুর তৈরি হওয়া এবং তার বিলোপ হওয়া সম্পর্কে যা বলে তা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ ব্যাপারে একটা বই আছে স্টিভেন ভিনবার্গের [Steven Weinberg], যিনি আবদুস সালামের সঙ্গে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন 1979 সালে তাঁদের ইলেকট্রোউইক তত্ত্বের জন্য। এঁর এই বইটির নাম 'The First Three Minutes'। এই বইয়ে বলা আছে মহাবিস্ফোরণের ঠিক পরেই কী ঘটেছিল। কিন্তু সময় যখন শুরু হল অর্থাৎ সময়ের মান যখন শূন্য তখন কী ঘটেছিল সে ব্যাপারে আমরা খুব নিশ্চিত নই। হকিংয়ের গবেষণার ক্ষেত্র এখানেই। তিনি বলছেন, প্রারম্ভে ছিল অনন্যতা এবং শেষে সম্ভাব্যতা। অনন্যতা হল সেই বিন্দু যেখানে সময় এবং মহাকাশ [Space] ছিল অসীম বক্রতাসম্পন্ন এবং তখন সেখানে পদার্থ ছিল অসীম ঘনত্বসম্পন্ন।

আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ বলতে পারে না বিশ্বসৃষ্টি কেমন করে হয়েছিল, কেন হয়েছিল মহাবিস্ফোরণ। আবার মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ কী হবে তাও সঠিকভাবে ব্যাখ্যাত হয় নি। হকিং লিখলেন ঃ

"The universe would expand to a very large size and eventually it would collapse again into what looks like a singularity in real time. Thus, in a sense, we are still all doomed, even if we keep away from black holes. Only if we could picture the universe in terms of imaginary time would there be no singularities.

If the universe really is in such a quantum state, there would be no singularities in the history of the universe in imaginary time. It might seem therefore that my more recent work had completely undone the results of my earlier work on singularities. But, as indicated above, the real importance of the singularity theorems was that they showed that the gravitational field must become so strong that quantum gravitational effects could not be ignored. This in turn led to the idea that the universe could be finite in imaginary time but without boundaries or singularities. When one goes back to the real time in which we live, however, there will still appear to be singularities. The poor

astronaut who falls into a black hole will still come to a sticky end ; only if he lived in imaginary time would he encounter no singularities.

This might suggest that the so-called imaginary time is really the real time, and that what we call real time is just a figment of our imaginations. In real time, the universe has a beginning and an end at singularities that form a boundary to space-time and at which the laws of science break down. But in imaginary time, there are no singularities or boundaries. So may be what we call imaginary time is really more basic, and what we call real is just an idea that we invent to help us describe what we think universe is like." [A Brief History of Time]।

এরই ব্যাখ্যায় তিনি 'Black Holes and Baby Universes' প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ "কৃষ্ণগহ্বর থেকে কণিকা এবং বিকিরণ নির্গত হলে তার ভর হ্রাস পাবে। এর ফলে কৃষ্ণগহ্বরটি ক্ষুদ্রতর হবে এবং কণিকাগুলি দ্রুততর গতিতে বাইরে প্রেরিত হবে। শেষ পর্যন্ত এর ভর শূন্যে পরিণত হবে এবং কৃষ্ণগহ্বরটি সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবে। সম্ভাব্য মহাকাশযান এবং অন্য যে বস্তুগুলি কৃষ্ণগহ্বরে ভিতর পড়েছিল সেগুলির কি হবে? আমার সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা অনুসারে এ প্রশ্নের উত্তর ঃ তারা তাদের নিজস্ব ক্ষুদ্র একটি শিশু মহাবিশ্বে চলে যাবে। একটি ক্ষুদ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাবিশ্ব, মহাবিশ্বের আমাদের অঞ্চল থেকে শাখাবিস্তার করবে। এই শিশু মহাবিশ্ব আবার স্থান-কালের আমাদের অঞ্চলে যোগ দিতে পারে। যদি যোগ দেয় তাহলে সেটাকে মনে হবে আর একটি কৃষ্ণগহ্বর। সেটা গঠিত হয়েছিল এবং উবে গিয়েছিল। যে কণিকাগুলি একটি কৃষ্ণগহ্বরে পড়েছিল সেগুলিকে মনে হবে অন্য কৃষ্ণগহ্বর থেকে উৎসর্জিত হয়েছে এবং এর বিপরীতও হবে [and vice verse] সত্য।

শুনে মনে হবে কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর দিয়ে মহাকাশে ভ্রমণের জন্য যা প্রয়োজন এগুলি শুধুমাত্র তাই। আপনি আপনার মহাকাশযানটিকে চালিয়ে নিয়ে একটা উপযুক্ত কৃষ্ণগহ্বরে পড়ুন। মহাকাশযানটি বেশ বড় হওয়া ভাল। তাছাড়া ভিতরে যাওয়ার আগেই মহাকর্ষীয় বলগুলি আপনাকে ছিঁড়ে সেমাই [Spaghetti] বানিয়ে দেবে। তাহলে আশা করতে পারেন অন্য কোনও কৃষ্ণগহ্বর দিয়ে আপনি বেরিয়ে আসবেন। তবে কোথায় সেটি আপনি বেছে নিতে পারবেন না।

কিন্তু এই আন্তঃনীহারিকা পরিবহন পরিকল্পনায় একটা বাধা আছে। কণিকাগুলি যে শিশু মহাবিশ্বে পড়েছিল সেই শিশু মহাবিশ্ব যাকে আমরা কাল্পনিক কাল বলি সেই কাল্পনিক কালেই হয়েছিল। বাস্তব কালে যে মহাকাশচারী কৃষ্ণগহ্বরে পড়বে তার একরকম চট্চটে মৃত্যু [Sticky End] হবে। মাথার দিকের আর পায়ের দিকের মহাকর্ষীয় বলের পার্থক্য তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। যে কণিকাগুলি তার দেহ গঠন করেছিল সেগুলিও বেঁচে থাকবে না। একটি অনন্যতায় এসে, বাস্তব কালের গণনায় তাদের ইতিহাস শেষ হবে যাবে। কিন্তু কাল্পনিক কালের হিসাবে তাদের ইতিহাস চলতে থাকবে। তারা শিশু মহাবিশ্বে প্রবেশ করবে এবং অন্য কৃষ্ণগহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা কণিকারূপে আবার নির্গত হবে। সুতরাং এক অর্থে মহাকাশচারীরা মহাবিশ্বের অন্য অঞ্চলে পরিবাহিত হবে। তবে যে কণিকাগুলি

নির্গত হবে সেগুলিকে দেখতে ঠিক মহাকাশচারীর মতো হবে না। সে বাস্তব কালের অনন্যতায় ঢুকে পড়েছিল, তার কণিকাগুলি যে কাল্পনিক কালে বেঁচে থাকবে এ তথ্য তাকে খুব একটা সান্ত্বনা দেবে না। কৃষ্ণগহ্বরে যে পড়বে আবশ্যিকভাবে তার নীতিবাক্য হওয়া উচিত 'কাল্পনিকের কথা চিন্তা করো।''

পেনরোজ এবং হকিংয়ের এই সম্পর্কে একটা তত্ত্ব রয়েছে, যেটির নাম 'অসমসত্ত্বীয় অতিতন্তু তত্ত্ব' [Heterotic Superstring Theory]। এই তত্ত্ব অনুসারে মহাকাশ-সময় [Space-Time] বা স্থান-কাল ক্ষুদ্র তন্তুর টুকরোর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁসে পূর্ণ। হকিং লিখেছেন ঃ

"যেগুলিকে আমরা মৌলকণা বলি সেগুলি আসলে বিভিন্নভাবে কম্পমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁস [Loops]। এই তত্ত্বে এমন কোনও সংখ্যা নেই যার মূল্যাঙ্কের সমন্বয় [Adjust] করা যেতে পারে। সুতরাং আশা করা উচিত একটি কণিকার বৈদ্যুৎ আধানের মতো যে সমস্ত সংখ্যার মূল্যাঙ্ক বর্তমান তত্ত্বগুলির দ্বারা অনির্ধারিত থাকে, ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের উচিত হবে সেই মূল্যাঙ্কগুলি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার সামর্থ্য থাকা। যদিও আমরা অতিতন্তু তত্ত্বের সাহয্যে এই পরিমাণগুলির কোনওটি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি নি, তবুও অনেকের বিশ্বাস আমরা শেষ পর্যন্ত এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব।"

আবার মহাবিস্ফোরণের কারণ এবং তারপর সেই মহাজাগতিক অণ্ডের অনন্যতা থেকে কী বেরিয়ে আসবে তার ব্যাখ্যা নেই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে। এখানেই হকিং এনেছিলেন কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানকে। তাঁর লেখায় তিনি বলেছেন এবং প্রমাণ করেছেন ঃ

"সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কিত সমীকরণগুলি স্থান-কালের বক্রতার সঙ্গে ভর এবং শক্তির একটা সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। তবে একে অনন্যতা বলে সংজ্ঞিত করা যায় না। তার অর্থ ঃ একটি অনন্যতা থেকে কি বেরিয়ে আসবে সে সম্পর্কে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। এই আপেক্ষিকতাবাদ বিশেষ করে পারে না মহাবিস্ফোরণে মহাবিশ্ব কি করে শুরু হবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে। সেইজন্য সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ একটা সম্পূর্ণ তত্ত্ব নয়। মহাবিশ্ব কি করে শুরু হবে এবং পদার্থ যখন নিজের মহাকর্ষের চাপে চুপসে যায় তখন কি ঘটতে পারে — এগুলি নির্ধারণের জন্য সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে আরও একটা উপাদান যোগ করা প্রয়োজন।

মনে হয় প্রয়োজনীয় বাড়তি উপাদানটি হল কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। 1905 সালে অর্থাৎ যে বছর আইনস্টাইন বিশিষ্ট আপেক্ষিকতাবাদ লেখেন, সেই বছর তিনি আলোকবৈদ্যুৎ অভিক্রিয়া [Photoelectric Effect] নামক পরিঘটনা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। দেখা গিয়েছিল কিছু কিছু ধাতুর উপর আলো পড়লে আধানযুক্ত কণিকা নির্গত হয়। হতবুদ্ধি হওয়ার মতো একটা ব্যাপার ছিল ঃ আলোকের তীব্রতা কমলে নির্গত কণিকার সংখ্যা কমে কিন্তু যে দ্রুতিতে কণিকাগুলি নির্গত হয় সেটা অভিন্ন থাকে। আইনস্টাইন দেখিয়েছিলেন, সবাই যা অনুমান করেছিল, আলোক যদি সেরকম অবিচ্ছিন্নভাবে নির্গত না হয়ে একটা বিশেষ আকারের ক্ষুদ্র মোড়কে নির্গত হয়—এ তথ্য যদি মেনে নেওয়া যায়—তাহলে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আলোক শুধুমাত্র কোয়াণ্টা নামে প্যাকেটে আসে—কয়েক

বছর আগে জার্মান পদার্থবিদ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক [Max Planck] এই চিন্তাধারা উপস্থিত করেন। এটা অনেকটা এই কথা বলার মতো ঃ বাজারে চিনি খুচরো কিনতে পাওয়া যায় না— পাওয়া যায় এক কিলোগ্রাম ব্যাগে। প্ল্যাঙ্ক কোয়াণ্টাম সম্পর্কিত চিন্তন ব্যবহার করেছিলেন— কেন একটি তপ্ত, লোহিতবর্ণ ধাতুখণ্ড অসীম পরিমাণ তাপ বিকিরণ করে না সেটা ব্যাখ্যা করার জন্য। তাঁর চিন্তনে কোয়াণ্টা ছিল একটি তাত্ত্বিক কৌশল মাত্র—সেগুলি কোনও ভৌত বাস্তবতার অনুরূপ নয়। আইনস্টাইনের গবেষণাপত্রে দেখা গেল একক কোয়াণ্টাগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। প্রতিটি নির্গত কণিকা এক কোয়াণ্টাম আলোকের ঐ ধাতুকে আঘাত করার অনুরূপ। এই গবেষণাপত্রটি কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে (কোয়াণ্টাম তত্ত্বে) একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে বহুল স্বীকৃতি লাভ করল। এই গবেষণার জন্য তিনি 1922 সালে নোবেল পুরস্কার পান। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের জন্য তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু স্থান এবং কাল বক্রতা প্রাপ্ত হয় এই চিন্তাধারা তখনও অত্যন্ত দূর কল্পনাভিত্তিক এবং বিতর্কমূলক বলে বিবেচনা করা হ'ত। সেইজন্য তার বদলে তাঁকে আলোকবৈদ্যুৎ অভিক্রিয়ার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয। তবে এই গবেষণা যে তাঁর নিজস্ব গুণে পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত ছিল না তা নয়।

এই আলোকবৈদ্যুৎ অভিক্রিয়ার পূর্ণ নিহিতার্থ 1925 সালের পূর্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ বোঝা যায় নি। সেই বছর ওয়ের্নার হাইজেনবার্গ [Werner Heisenberg] দেখালেন এর ফলে একটি কণিকার অবস্থান নির্ভুলভাবে মাপা অসম্ভব। কণিকাটি কোথায় আছে দেখবার জন্য তার উপর আলো ফেলতে হয়। কিন্তু আইনস্টাইন দেখিয়েছিলেন অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিমাণ আলোক ব্যবহার করা যায় না, অন্ততঃপক্ষে এক প্যাকেট, অর্থাৎ এক কোয়াণ্টাম আলোক ফেলতেই হবে। আলোকের এই প্যাকেট কণিকাটিকে বিচলিত করবে এবং একে কোনও দ্রুতিতে কোনও এক অভিমুখে চালনা করবে। যত নির্ভুলভাবে আপনি কণিকাটির অবস্থান জানতে চাইবেন, তত বেশি শক্তিসম্পন্ন আলোর প্যাকেট আপনাকে ব্যবহার করতে হবে। ফলে কণিকাটি তত বেশি বিচলিত হবে। কণিকাটিকে আপনি যতই মাপতে চেষ্টা করবেন— তার অবস্থানের অনিশ্চয়তা এবং দ্রুতির অনিশ্চয়তার গুণফল সর্বসময়ই একটা সর্বনিম্ন পরিমাণের বেশি হবে।

হাইজেনবার্গের এই অনিশ্চয়তার নীতি দেখিয়েছে একটি তন্ত্রের অবস্থা নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব নয়। সুতরাং ভবিষ্যতে সে কি করবে সে সম্পর্কে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। করা যেতে পারে শুধু বিভিন্ন পরিণতির সম্ভাব্যতার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। এই আপতনিক উপাদান [Element of Chance] অর্থাৎ নিয়মহীনতাই আইনস্টাইনকে অতখানি বিচলিত করেছিল। ভৌত বিধিগুলি ভবিষ্যতে কি হবে সে সম্পর্কে যে নির্দিষ্ট, নিশ্চিত সুনিয়মিত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারা যাবে না—একথা বিশ্বাস করতে আইনস্টাইন অস্বীকার করেন। কিন্তু যে ভাবেই এটা প্রকাশ করা হোক না কেন, সমস্ত সাক্ষ্যতেই দেখা যায় কোয়াণ্টাম পরিঘটনা এবং অনিশ্চয়তার নীতি পরিহার করা যায় না এবং পদার্থবিদ্যার সমস্ত শাখাতেই এদের অস্তিত্ব রয়েছে।"

সুতরাং মহাবিশ্বের ভবিষ্যত কী হবে তার সম্ভাব্যতার কথা বলা যায়, কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। হকিংয়ের সব সময়ের ধারণাই হল বিশ্বসৃষ্টির রহস্য পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এবং কোয়ান্টামবাদের মিশ্রণে উদ্ভূত 'মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব' জাতীয় একটি মাত্র তত্ত্বের সাহায্যে। তিনি 'A Brief History of Time' বইটিতে লিখেছেন ঃ

"Hubble's discovery that the universe was expanding, and the relization of the insignificance of our own planet in the vastness of the universe, were just the starting point. As experimental and theoritical evidence mounted, it became more and more clear that the universe must have had a beginning in time, until in 1970 this was finaly proved by Penrose and myself, on the basis of Einstein's general theory of relativity. That proof showed that general relativity is only an incomplete theory : it cannot tell us how the universe started off, because it predicts that all physical theories, including itself, break down at the beginning of the universe. However, general relativity claims to be only a partial theory, so what the singularity theorems really show is that there must have been a time in the very early universe when the universe was so small, that one could no longer ignore the small-scale effects of the other great partial theory of the twentieth century, quantum mechanics. At the start of the 1970s, then, we were forced to turn our search for an understanding of the universe from our theory of the extraordinarily vast to our theory of the extraordinarily tiny. That theory, quantum mechanics, will be described next, before we turn to the efforts to combine the two partial theories into a single quantum theory of gravity."

হকিং ও তাঁর সহকর্মীদের স্থান ও কাল বা মহাকাশ ও সময় [Space and Time] নিয়ে গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল যে, তিনি বা তাঁরা প্রমাণ করেছেন এ দুটির একটা বাস্তব প্রারম্ভ [Beginning] রয়েছে। মহাকাশ ও সময়ের যেমন আরম্ভ আছে তার শেষও হবে একদিন। হকিং প্রমাণ করেছেন, মহাবিস্ফোরণের আগে যে অনন্যতা ছিল সেই অনন্যতায় সময় বা কাল ছিল না, স্থান বা মহাকাশও ছিল না। তিনি বলেছেন, ঘনীভূত পদার্থ থেকে বিশ্বসৃষ্টি হয় নি হয়েছে অনন্যতা থেকে। অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তী মহাজাগতিক অণ্ডের ধারণা বাতিল করে তিনি মহাকাশ-সময়হীন বা দেশকালহীন অনন্যতার কথা এনেছেন। তাঁর প্রমাণে, সময়ের শুরু হয়েছে মহাবিস্ফোরণের পর। মহাকাশ বা স্থান বা দেশ এসেছে ওই মহাবিস্ফোরণের পরে। অনন্যতায় মহাবিস্ফোরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে মহাকাশ, চলতে শুরু করেছে সময়।

হকিংয়ের মতে সময়-তীর [Arrow of Time] একমুখী। আমরা সবাই জানি সময় অতীত থেকে ভবিষ্যতের পানে ধেয়ে চলেছে। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে এটা একটা রহস্য যে, সময় প্রতিসাম্যহীন [Non-Symmetric]। সময়ের একমুখিনতা বা বিপরীতমুখী সময়ের না থাকাটা কিন্তু অন্যান্য হাজারো প্রতিসাম্যের কোনও ব্যাঘাত ঘটায় না। কণা-জগতে অসংখ্য রকমের প্রতিসাম্য বিদ্যমান। পরমাণু তড়িৎ নিরপেক্ষ। তার নিউক্লিয়াসে আছে ধনাত্মক তড়িৎসম্পন্ন প্রোটন এবং চারদিকে ঘুরছে ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রনেরা।

ধনাত্মক তড়িতের প্রতিসাম্য হিসাবে রয়েছে ঋণাত্মক তড়িতাহিত কণাসমূহ। আর এই দুই প্রতিসাম্যের জন্য পরমাণু মোটামুটি তড়িৎ নিরপেক্ষ। ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক পরস্পর মিলে পরমাণুকে নিরপেক্ষ করে তোলে। এই প্রতিসাম্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যদিও এই গুরুত্বের কথা আমরা প্রায়শঃই চিন্তা করি না। তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিসাম্যের আধান সম্পর্কিত এই প্রতিসাম্য হল একটি। তিনটি প্রতিসাম্য হল ঃ P, C এবং T। যেখানে, P হল সমতা [Parity], C হল আধান [Charge] এবং T হল সময় বা কাল [Time]। এই প্রতিসাম্য তিনটির একটি হল পরমাণুর আধান সংক্রান্ত প্রতিসাম্য। সমতাও আধানের মত একটি প্রতিসাম্যের কথা বলে। জোড়া [Even] থাকলে বিজোড় [Odd] থাকবে। সমতা আসবে জোড় ও বিজোড় মিলে। সময়ের বেলায় কিন্তু এই প্রতিসাম্যের অভাব দেখা যায়। পার্থিব সব সমীকরণে [Equation] সময় বা বিপরীত সময় অর্থাৎ (+) T বা (–) T যাই-ই লাগানো হোক না কেন ফলাফল একই থাকে। এটাই সময়ের রহস্যময়তা। বাস্তব জীবনে বিপরীতমুখী সময়ের অস্তিত্ব নেই। যা আছে তা একমুখী বাস্তব সময়। প্রতিসাম্য দিয়ে কণাদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, এমন কি এর সাহায্যে নতুন কণার অস্তিত্বের কথাও বলা যায়, কিন্তু সময়ের ক্ষেত্রে সে নিয়ে সমস্যা আছে, কারণ বাস্তবে বিপরীতমুখী সময় বলে কিছু আজও অজানা।

হকিং সময়ের ব্যাখ্যায় তিনটি সময়-তীরের কথা বলেছেন। একটি হল 'তাপগতীয় সময়-তীর' [Thermodynamic Arrow of Time], দ্বিতীয়টি হল 'মনোবৈজ্ঞানিক সময় তীর' [Psychological Arrow of Time], আর তৃতীয়টি হল 'বিশ্বতত্ত্বীয় সময়তীর' [Cosmological Arrow of Time] হকিং বলছেন, সময় দু'ধরনের—কাল্পনিক সময় [Imaginary Time] এবং বাস্তব সময় [Real Time]। বাস্তব সময়ের দিক নির্দেশ করে তিনটি সময়তীর—তাপগতীয়, মনোবৈজ্ঞানিক এবং বিশ্বতত্ত্বীয়। তাপগতীয় সময়-তীর নির্দেশ করে বিশৃঙ্খলা। [Disorder], তার অভিমুখ সেই দিকে যে দিকে অব্যবহার যোগ্য শক্তি বা এনট্রপি [Entropy]-র বৃদ্ধি ঘটে। মনোবৈজ্ঞানিক সময়-তীর বলে আমরা অতীতকে স্মরণ করতে পারি ভবিষ্যৎ-কে নয় এবং আমরা অনুভব করি সময় অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে ধেয়ে চলেছে। বিশ্বতত্ত্বীয় সময় তীর নির্দেশ করছে বিশ্ব-সম্প্রসারিত হচ্ছে, সংকুচিত হচ্ছে না।

বিশ্বের এনট্রপি [Entropy] ক্রমশঃ বাড়ছে। একটা সাম্যাবস্থা আসবে যখন এনট্রপির পরিমাণ সর্বোচ্চ হবে। ততক্ষণ প্রসারিত হবে বিশ্ব। বিশ্বের প্রসারণের কালেই বুদ্ধিমান জীবেরা থাকবে, কিন্তু সংকোচনকালে বিশ্বে তথা পৃথিবীতে বুদ্ধিমান জীবেরা থাকবে না। এর কারণ হল বিশ্ব সীমানাবিহীন যদিও বিশ্ব সসীম [Finite]। সীমানাবিহীনতার শর্তে বিশ্ব সংকুচিত হতে থাকবে এবং পৃথিবী তখন বুদ্ধিমান জীবদের উপযোগী থাকবে না। বিশ্ব এখন প্রসারিত হচ্ছে, কিন্তু একদিন সংকুচিত হবে। সীমানাহীন বিশ্বের একদিন শুরু হয়েছিল কিছুটা অসাম্যের মধ্যেই। এই অসাম্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনিশ্চয়তা নীতি [Uncertainty Principle] বলে দেয়। এই নীতিই বলে অসাম্য থাকার সম্ভাব্যতা। আর এই অসাম্যই অনন্যতা থেকে বিশ্ব বিকশিত হওয়ার মূল কারণ।

তিনি ভেবেছিলেন, ক্রমঃসংকোচনে বিশ্বের বিশৃহখলা ক্রমশঃ কমতে থাকবে। তাতে কিন্তু বিশ্ব বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। তিনি দেখিয়েছেন, তাপগতীয় সময়-তীর এবং বিশ্বতত্ত্বীয় সময়-তীর বর্তমানে যে দিক নির্দেশ করছে তাতে বিশৃঙ্খলা বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধিমান জীবেরা বিশ্বে বর্তমান আছে। বিশৃঙ্খলা বাড়ছে বিশ্বের প্রসারণের জন্য নয়, বাড়ছে বিশ্বের কোন সীমানা নেই বলে [No Boundary Condition]। বিশ্বের এই সম্প্রসারণকালে বিশৃঙ্খলা বাড়ছে, তাই রয়েছে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব। বিশ্বের সংকোচনে বিশৃঙ্খলা কমবে ঠিকই কিন্তু বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব বজায় থাকবে না সে অবস্থায়। হকিং লিখেছেন ঃ

"I have shown that the psychological arrow is essentially the same as the thermodynamic arrow, so that the two would always point in the same direction. The no-boundary proposal for the universe predicts the existence of a well difined thermodynamic arrow of time because the universe must start off in a smooth and ordered state. And the reason we observe this hermodynamic arrow to agree with the cosmological arrow is that intelligent beings can exist only in the expanding phase. The contracting phase wil be unsuitable because it has no strong thermodynamic arrow of time." *[A Brief History of Time]*

হকিং মেনে নিয়েছেন বিশ্বের সংকোচনে ও প্রসারণে জ্ঞানের হ্রাস-বৃদ্ধি কথা। বিশ্বের সম্প্রসারণ-কালেই বুদ্ধিমান জীবদের দেখা পাওয়া যাবে, কিন্তু সংকোচনকালে বিশ্ব বুদ্ধিমান জীবদের উপযোগী থাকবে না। ভারতীয় দর্শন তিন হাজার বছর আগে এই কথাটাই ঘুরিয়ে বলেছেন যে, বুদ্ধির বা জ্ঞানের ক্রমবিকাশ ঘটে বিশ্বের প্রসারণের কালে, আর বিশ্বের সংকোচনকালে জ্ঞানেরও ক্রমসংকোচন ঘটে।

হকিং চান আপেক্ষিকতাবাদ এবং কোয়াণ্টাম বলবিজ্ঞানের মিলন ঘটাতে। একটি একীভূত তত্ত্ব চাই বিশ্বরহস্যের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করতে। এ প্রসঙ্গে হকিং বহুবার বলেছেন যে, সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ একটি অসম্পূর্ণ তত্ত্ব। সে তত্ত্বের পরিবর্ধন প্রয়োজন। আর সে পরিবর্ধনে কাজে লাগাতে হবে কোয়াণ্টাম বলবিজ্ঞানকে। হকিং ও পেনরোজের 'String Theory' আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়াণ্টাম বলবিজ্ঞানের সম্মিলিত রূপ হিসাবে কতটা সফল তা আজও যথাযথভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। হকিং লিখেছেন ঃ

"Apart from the question of the number of dimensions that space-time appears to have, string theory still has several other problems that must be solved before it can be acclaimed as the ultimate unified theory of physics. We do not yet know whether all the infinities do cancel each other out, or exactly how to relate the waves on the string to the particular types of particle that we observe. Nevertheless, it is likely that answers to these questons will be found over the next few years, and that by the end of the century we shall know whether string theory is indeed the long sought-after unified theory of physics.

But can there really be such a unified theory ? Or are we perhaps just chasing a mirage? There seems to be three possibilities :

1) *There is a really complete unified theory, which we will someday dicover if we are smart enough.*

2) *There is no ultimate theory of the universe, just an infinite sequence of theories that describe the universe more and more accurately.*

3) *There is no theory of the universe, events cannot be predicted beyond a certain extent but occur in a random and arbitary manner."*

ধর্ম সম্বন্ধে হকিংয়ের বক্তব্য তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু তাঁর তত্ত্বানুসারে ধর্ম কেমন রূপ নেয় তাও ভেবে দেখবার। হকিংয়ের মতে বিশ্বের বদ্ধ পৃষ্ঠ [Closed Surface] তৈরি হয়েছে মহাকাশ-সময় দিয়ে এবং তার কোনও সীমানা নেই। বিশ্বের কোনও আরম্ভ নেই এবং শেষও নেই। সুতরাং বিশ্বের স্রষ্টা বলে কেউ-ই নেই। হকিং বলেছেন যে, সেন্ট অগাস্টাইন [Saint Augastine] সবার আগে বলেছিলেন, বিশ্বের একটি গুণ বা ধর্ম হল সময় বা কাল এবং ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির আগে সময়ের অস্তিত্ব ছিল না। হকিং বললেন, সময় বিশ্বের একটা গুণ বা ধর্ম। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনি মানেন না। ক্রেইগ [Craig] এবং অন্যান্যরা বলছেন, কিছু না হোক বিশ্বসৃষ্টির শুরু থেকেই একটি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নিতে কোনও যৌক্তিক বাধা নেই। হকিং বলছেন, বিশ্বের যখন আরম্ভ নেই, তখন তার স্রষ্টারও অস্তিত্ব নেই। বিশ্ব শুরু হওয়ার পর নিত্যদিনের সৃষ্টিতে ঈশ্বর আছে কি নেই তা নিয়ে মাথা ঘামান নি হকিং। কারণ বিশ্বের শুরু নিয়েই ছিল তাঁর গবেষণা। বিশ্বের আরম্ভ হওয়ার পর নিত্যদিনের ঘটনায় ঈশ্বর আছেন কি নেই তা বিচার্য ছিল না হকিংয়ের। যেহেতু বিশ্বের আদি নেই এবং অন্ত নেই, তাই বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের প্রয়োজনও নেই।

বিজ্ঞানীরা বহুকাল ধরেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকার কথা বলছেন। হকিং প্রমাণ করেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয়, কারণ বিশ্বের কোনও আরম্ভ নেই। অতএব স্রষ্টা ঈশ্বর বলে কেউ নেই। ভারতীয় দর্শন কিন্তু বলে স্রষ্টা ঈশ্বর বলে কেউ নেই, বরং এক ঈশ্বরেরই বহু হওয়ার কথা আছে সে দর্শনে, আছে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—সব কিছুই ঈশ্বর। গ্যালিলিও চার্চের বিরাগভাজন হয়েছিলেন ধর্ম-বিরোধী কথা বলায়। হকিং কিন্তু হন নি। তিনি ভাটিকান [Vatican] শহরে বহু আলোচনা সভায়, ধর্মীয়সভায় যোগ দিয়েছেন, আলোচনা করেছেন ঈশ্বরের অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে। তাঁর বক্তৃতা ছেপেছেন পোপ [Pope]। এমনকি ভাটিকান থেকে তিনি পুরস্কারও লাভ করেছেন তাঁর এই সব বক্তৃতার জন্য। সুতরাং গ্যালিলিওর থেকে চার্চের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেক ভালোই। গ্যালিলিও যা পারেন নি, তিনশ' বছর পরে স্টিফেন হকিং তা পেরেছেন।

ক্রেইগ-এর বক্তব্যের কিছুটা দিয়ে হকিং প্রসঙ্গ শেষ করি। হকিং আজও বেঁচে আছেন বাকশক্তিহীন, চলচ্ছক্তিহীন হয়ে। জানি না তিনি ক্রেইগ-এর সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন কি না। ক্রেইগ বলতে চাইছেন, স্রষ্টা ঈশ্বর না থাকলে আমাদের কতটা মূল্য দিতে হবে? ভাববার বিষয়। বলা হয়েছে ঃ

"Craig also some signs of understanding the mathematics by correctly pointing out that Hawking needs to demonstrate that a mathematical statement

has a counterpart in physical reality. He then shows a lack of understanding when he complains that the use of imaginary time as a mathematical device is somehow intellectually dishonest. In the end, Craig paraphrases Hawking's question with : "What price, then, for no Creator?" If the best Craig can do is complain about the price of truth, then he has diminished the real subject under discussion."

স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই, কিন্তু যে ঈশ্বরের মধ্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করছে, তেমন ঈশ্বরের অবশ্যই প্রয়োজন আছে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য এবং সর্বজীবের মঙ্গলের জন্য।

হকিংয়ের বহু বক্তৃতা বিখ্যাত হয়ে আছে। সেগুলি নিয়ে বইও বেরিয়েছে। তাঁর বইয়ের কথা আগেই বলেছি। তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতাগুলির কয়েকটির কথা বলি। যেমন ঃ The Beginning of Time, The Nature of Space and Time, Space and Time Warps, Does God Play Dice, Life in the Universe. হকিং তাঁর 'The Beginning of Time'-এ বলেছেন ঃ

"In this lecture, I would like to discuss whether time itself has a beginning, and whether it will have an end. All the evidence seems to indicate, that the universe has not existed for ever, but that it had a beginning, about 15 billion years ago. This is probably the most remarkable discovery of modern cosmology. Yet it is now taken for granted. We are not yet certain whether the universe will have an end."

তিনি 'Space and Time Warps' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

"In science fiction, space and time warps are a commonplace. They are used for rapid journeys around the galaxy, or for travel through time. But today's science fiction, is often tomorrow's science fact. So what are the chances for space and time warps."

আবার 'Does God Play Dice'-এ তিনি লিখেছেন ঃ

"This lecture is about whether we can predict the future, or whether it is arbitrary and random. In ancient times, the world must have seemed pretty arbitrary. Disasters such as floods or diseases must have seemed to happen without warning or apparent reason. Primitive people attributed such natural phenomena, to a pantheon of gods and goddesses, who behaved in a capricious and whimsical way. There was no way to predict what they would do, and the only hope was to win favour by gifts or actions."

তেমনি তিনি 'Life in the Universe'-এ বলেছেন ঃ

"In this talk, I would like to speculate a little, on the development of life in the universe, and in particular, the development of intelligent life. I shall take this to include the human race, even though much of its behaviour through out history, has been pretty stupid, and not calculated to aid the survival of the species."

'The Nature of Space and Time' শীর্ষক বক্তৃতায় মোট ছয়টি নিবন্ধ পাঠ করা হয় কেম্ব্রিজের আইজ্যাক নিউটন ইনস্টিটিউটে। তিনটি বক্তৃতা দেন হকিং নিজে এবং অন্য তিনটি বক্তৃতা দেন তাঁর সহযোগী রজার পেনরোজ [Roger Penrose]।

আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'ঈশ্বর পাশা খেলেন না'। হকিং কিন্তু বলেছেন, 'ঈশ্বর কেবল পাশাই খেলেন না, তিনি পাশা এমন জায়গায় ছুঁড়ে দেন যে সেখান থেকে তাদের দেখা যায় না।' অর্থাৎ হকিংয়ের মতে, "God not only plays dice. He also sometimes throws the dice where they cannot be seen."

হকিংয়ের 60তম জন্মদিন ছিল 2002 সালের জানুয়ারী মাসে। সেই জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন 200 জনেরও বেশি পদার্থবিজ্ঞানী। সারা পৃথিবী থেকে জমায়েৎ হয়েছিলেন তাঁরা। ওই বছরের এগারোই জানুয়ারী তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন তাঁর বিশেষভাবে নির্মিত কম্পিউটারের মাধ্যমে। ওই দিন কথা বলেন, বিবিসি-র [BBC] ওয়েব-কাস্টে [Webcast]। 2003 সালের নভেম্বর মাসে ইনটেল [Intel] হকিংকে একটা নতুন কম্পিউটার বানিয়ে দিয়েছে যেটি খুব ভালোভাবে তাঁর হুইল চেয়ারে লাগানো হয়েছে। এটি একটি পরিবর্তিত ল্যাপটপ [Laptop] যার মধ্যে আছে '1.5 GHz, M Chip'। এটির সাহায্যে নিজেকে আরও ভালো করে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে স্টিফেন হকিংয়ের। ●●

যে সব বই এবং পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি

1]	আলবার্ট আইনস্টাইন	দ্বিজেশচন্দ্র রায়
2]	আইনস্টাইনের বিশ্ব	ডঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত
3]	তাপগতি তত্ত্ব	অশোক ঘোষ
4]	মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন	প্রশান্ত প্রামাণিক
5]	সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন	বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
6]	প্রসঙ্গ সত্যেন্দ্রনাথ বসু	ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক
7]	বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ	প্রশান্ত প্রামাণিক
8]	কৃষ্ণগহ্বর এবং শিশু মহাবিশ্ব ও অন্যান্য রচনা	স্টিফেন হকিং ভাষান্তর ঃ শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত
9]	বিশ্বের কৃতি বিজ্ঞানী	অমরনাথ রায়
10]	বিশ্বের বিজ্ঞানী	ওই
11]	বিজ্ঞানী চরিতকথা	সুধাংশু পাত্র
12]	বিজ্ঞানের অমর প্রতিভা	ওই
13]	নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা	শ্যামল চক্রবর্তী
14]	পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষা	দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
15]	100 Years with Nobel Laureates	Written for Encyclopaedia Britannica.
16]	A History of Quantum Mechanics	J. J. O'Connor & E. F. Robertson
17]	Light through the ages : Relativity and Quantum Era	–Do–
18]	A history of time : 20th Century Time	–Do–
19]	Atomic Physics	Prof. J. B. Rajam
20]	Ideas and Opinions	Albert Einstein
21]	The Evolution of Physics	Albert Einstein & Leopold Infeld
22]	Max Karl Ernst Ludwig Planck	J. J. O'connor & E. F. Robertson
23]	Albert Einstein	–Do–
24]	Niels Henrik David Bohr	–Do–

25]	The Quantum Theory of Atom	Niels Bohr
26]	The Structure of the Atom	G. Birtwistle
27]	Satyendra Nath Bose	Santimoy Chatterjee & Enakshi Chatterjee
28]	Atomic Structure and Spectral Lines	A. Sommerfeld
29]	Bose and His Statistics	G. Venkatraman
30]	The Revolution in Physics	Louis De Broglie
31]	Matter and Light	–Do–
32]	Louis Victor Pierre Raymond due de Broglie	J. J. O'Connor & E. F. Robertson
33]	Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger	–Do–
34]	Werner Karl Heisenberg	–Do–
35]	Max Born	–Do–
36]	Paul Adrien Maurice Dirac	–Do–
37]	Enrico Fermi–Biography	From Nobel Lectures, Physics, 1922–1941
38]	Enrico Fermi Biography	John Marburger
39]	Atoms in the Family : My life with Enrico Fermi	Laura Fermi
40]	Fermi National Accelerator Laboratory	John Marburger
41]	Professor Abdus Salam	Miriam Lewis
42]	Stephen William Hawking	J. J. O'Connor & E. F. Robertson
43]	A Brief History of Time : From the Big Bang to Black Holes	S. W. Hawking.
44]	Stephen Hawking's Universe	John Boslough
45]	The First Three Minutes	Steven Weinberg
46]	The Meaning of Quantum Theory	Jim Baggott
47]	Black Holes and Baby Universes and other Essays	S. W. Hawking
48]	Encyclopedia Americana	
49]	Encyclopaedia Britannica	

এছাড়াও সাহায্য নিয়েছি নানান বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকার যেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'জ্ঞান বিচিত্রা' -পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

লেখকের অন্যান্য স্বাদের বই

1	মহাসময়ের ইতিবৃত্ত (২য় সংস্করণ) (দে'জ পাবলিশিং)	100 টাকা
2	রোমন্থন (ইতিহাসের স্মৃতিচারণা) (২য় সংস্করণ) (দে বুক স্টোর)	100 টাকা
3	সপ্তর্ষি (বিংশ শতাব্দী)	40 টাকা
4	হঠাৎ ঘন্টা বাজে (বিংশ শতাব্দী)	25 টাকা
5.	শব্দের কথকতা (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	50 টাকা
6	বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র (২য সংস্কবণ) (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	70 টাকা
7.	বেদ বিজ্ঞান এবং (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	100 টাকা
8	ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান (২য় সংস্করণ) (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	150 টাকা
9	মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন (২য় সংস্কবণ) (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	120 টাকা
10.	মৃত্যু—দর্শনে ও বিজ্ঞানে (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	75 টাকা
11	পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	75 টাকা
12	বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	40 টাকা
13	বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	60 টাকা
14.	নোবেলবিজ্ঞানী রামন (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	90 টাকা
15	বামিয়ানের বর্বরতা (দে'জ পাবলিশিং)	100 টাকা
16.	হরপ্পার অনার্য গরিমা (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	220 টাকা
17.	নোবেলবিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	100 টাকা
18.	নাহিনের জামদানী (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী)	60 টাকা

●●●●